মাঠপর্যায় থেকে

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা সাম্প্রতিক চালচিত্র

হুমায়ূন কবীর

মাঠ পর্যায় থেকে
বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা
সাম্প্রতিক চালচিত্র

www.pathagar.com

মাঠপর্যায় থেকে

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা সাম্প্রতিক চালচিত্র

হুমায়ূন কবীর

সূচীপত্র
কা, বাংলাদেশ

www.pathagar.com

প্রকাশক » সাঈদ বারী
প্রধান নির্বাহী, সূচীপত্র
৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
ফোন ৭১১-৩৮৭১

মাঠপর্যায় থেকে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা : সাম্প্রতিক চালচিত্র
হুমায়ূন কবীর

স্বত্ব » গ্রন্থকার
প্রথম প্রকাশ » ফেব্রুয়ারি ২০০৬
প্রচ্ছদ » নিয়াজ চৌধুরী তুলি
মুদ্রণ » সালমানী প্রিন্টিং প্রেস নয়াবাজার ঢাকা

উত্তর আমেরিকায় পরিবেশক » মুক্তধারা
জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
যুক্তরাজ্যে পরিবেশক » সঙ্গীতা লিমিটেড
২২ ব্রিক লেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

Mathporjay Theke Bangladesher Sikhsababostha : Samprotik Chalchitro
by Humayun Kabir
Published by Saeed Bari, *Chief Executive*, Sucheepatra.
38/2-Ka Banglabazar, Dhaka 1100, Bangladesh.
Tel : 711-3871
Price : BDT. 150.00 only. US$ 10.00

মূল্য » ৳ ১৫০.০০ মাত্র

ISBN 984-8557-82-2

www.pathagar.com

উৎসর্গ

প্রকৌশলী মু. আবদুল্লাহ্ আল বাকী
প্রকৌশলী কাওসার হাসান
কামরুল হাসান শায়ক

এই বইয়ের প্রতিটা
অক্ষরের জন্য যাদের
কাছে আমি ঋণী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রাককথন

এক

স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের দেশের রাজনীতিতে যে মৌলিক পরিবর্তন এসেছে, শিক্ষার ক্ষেত্রে তার কণা পরিমাণও আসেনি। তা যদি আসত, তাহলে হাতের কাছে ড. কুদরত খুদা শিক্ষানীতিসহ পয়ত্রিশ বছরে প্রায় হাফ ডজন শিক্ষানীতি প্রণয়নের মাধ্যমে বারবার শিক্ষাব্যবস্থার সংস্করণের নামে নানা ঝামেলা, টালবাহানা, সময়ক্ষেপণ, রাজনীতিকরণ, দলীয়করণ করতে হতো না। স্বাধীন বাংলাদেশে শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে যত আলোচনা সভা সেমিনার হয়েছে, দুঃখের বিষয়, এর সিকি ভাগ পরিমাণও কাজ হয়নি।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অবশ্যই আলোচনার মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না সত্যি; কিন্তু যখন দেখা যায় আলোচনার তিল পরিমাণও বাস্তবে রূপ পায় না, তখন ওসব আলোচনাকে পোশাকি, লোক দেখানো ছাড়া আর কি বলা যায়। তা না হলে শিক্ষাব্যবস্থা সময়োপযোগী, আধুনিক, বাস্তবসম্মত, যুগপোযোগী করার নিছক আলোচনা, ব্যবস্থাকরণ, নীতি নির্ধারণ তো কম হলো না; আসলে কাজের কাজ কতটা হয়েছে; শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃত উন্নতি কতটা ঘটেছে কিংবা আধুনিক কাঠামোর উপর দাঁড় করানো গেছে কি না— এসব প্রশ্নের উত্তর মিলবে— অবশ্যই হয়নি।

সরকারে যারা আছেন, শিক্ষা নিয়ে যাদের ভাববার কথা, যাদের দায়িত্বে রয়েছে নীতি নির্ধারণের— তারা কি এসব আলোচনা শুনেন? খোরাই গুরুত্ব দেন এসব আলোচনার? কে শুনে কার কথা?

কেননা, অনেকেই ব্যস্ত পূর্বপুরুষের জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করতে, আরেক দল রয়েছে ধান্ধা তদ্বিরের মাধ্যমে সেসব লিপির ছাপা কিংবা প্রচারের টেন্ডার পেতে। এতে শিক্ষার বারোটা বাজুক আর তেরোটা বাজুক কারো কিছু যায় আসে না।

রাজনীতিতে যেমন মতামতের অভাব নেই এ দেশে, শিক্ষার ক্ষেত্রেও তেমনটি দেখা যায়। রাজনীতিকের মতো শিক্ষিত পণ্ডিতের মাঝে মতভেদ অনেক। এখানেও নানা মুনির নানা মত। পরিবেশের সঙ্গে নিখুঁতভাবে সঙ্গতি রক্ষার সাধনাকে যদি শিক্ষা বলি, তাহলে একদিকে যেমন সব কথা বলা হয় না, তেমনি অন্যদিকে কোনো কথাই বোধহয় বাদ যায় না। সুতরাং বৃহত্তম মানুষের মহত্তম কল্যাণ, যেভাবে রাষ্ট্রের আদর্শ হিসেবে গৃহীত হয়েছিল, সেইভাবে আমরা একে শিক্ষার ব্যাপকতম সংজ্ঞা হিসেবে বোধহয় গ্রহণ করতে পারি নি। পারি নি বৃহত্তম কল্যাণের স্বার্থে ব্যক্তিক এবং রাজনীতিক স্বার্থকে পেছনে ফেলতে। আমরা কেউ ভেবে দেখিনি যে, প্রতিদিন ভোরে বাসা থেকে বেরোলেই ছুটতে দেখি চার-পাঁচ বছরের যে ছেলেমেয়েগুলো বই খাতা শ্লেট বগলে স্কুল পানে ছুটছে বিদ্যার্জনের লক্ষ্যে; আমরা কি তাদের সঠিক শিক্ষা দিতে পারছি? তাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষার পথটা কি সরল-সুন্দর ভাবে তৈরি করে দিতে পারছি? আসলে কি তাই নয়, সর্বাঙ্গে খোস-পাঁচড়ার মতো শিক্ষার বদলে অশিক্ষা এবং কুশিক্ষা নিয়ে ওরা বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসছে না? এই দোষ কার? শিক্ষার্থীর? না অন্য কারো?

www.pathagar.com

শিক্ষায় রাজনীতি, ধান্দাবাজি, টেন্ডারবাজির মতো ব্যাপারগুলো না থাকাই কল্যাণকর। মূল্যবোধের শিক্ষা, শিক্ষায় মূল্যবোধ তৈরি করার ব্যবস্থা আন্তরিকতার সাথে, রাজনীতির উর্ধ্বে থেকে করতে হবে। সব মতের শিক্ষাবিদ, পণ্ডিতদের বুদ্ধি পরামর্শে, আমাদের সাধ্যের ভেতরে থেকে সর্বজন স্বীকৃত একটি শিক্ষাব্যবস্থা তৈরি করতে হবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষাবিদ পণ্ডিতদেরও থাকতে হবে রাজনীতির পোষ্যপণ্ডিত না হয়ে সত্যিকার অর্থে পণ্ডিতজন। তবেই হয়তো হবে শিক্ষার ব্যবস্থাপত্র সঠিক ও বাস্তব, আধুনিক এবং সময়োপযোগী।

দুই

'মাঠপর্যায় থেকে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা : সাম্প্রতিক চালচিত্র'-এ মূলত মাঠ পর্যায়ের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতামত, বুদ্ধিপরামর্শকে গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন— নারী শিক্ষা, সহশিক্ষা নিয়ে নিবন্ধ লিখতে গিয়ে শিক্ষিত-সচেতন নারী ও পুরুষের মতামত গ্রহণ করেছি। কে কি বলেছে; বেগম রোকেয়া নারী শিক্ষা নিয়ে কী বলে গেছেন, এ সময়ে এসে নারী কী ভাবছেন; সবার মতামতকে তুলে ধরা হয়েছে সমান গুরুত্ব দিয়ে। সহশিক্ষার ক্ষেত্রেও একজন ছাত্রের ভাবনার পাশাপাশি একজন ছাত্রী কী ভাবছে তাও বিধৃত হয়েছে। বিধৃত হয়েছে, সহশিক্ষা নিয়ে বোদ্ধামহল কী ভাবছেন, সে কথাও।

এরকমভাবে, শিক্ষানীতি প্রণয়ণের দু একটি নিয়ে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ, শিক্ষাবিদ পণ্ডিতজনদের অভিমত তুলে ধরেছি। শিক্ষার মাধ্যম, পরীক্ষা পদ্ধতি ও প্রস্তুতি সব ক্ষেত্রেই মাঠ পর্যায়ের অভিমতকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। অনেকের মতামতকে ফুটনোটের মাধ্যমে হুবহু তুলে ধরা হয়েছে। আমি মনে করি, এতে করে শিক্ষাক্ষেত্রে রুট লেবেলের ভাবনাগুলো জানা যাবে। ফলে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের আগে তাদের ভাবনাগুলো মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে।

তিন

বাংলাদেশের শিক্ষা, শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে প্রতিনিয়ত যারা ভাবেন; যারা শিক্ষাবিদ, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ এবং পণ্ডিতজন তাদের কারো দলের কিংবা কোনো অভিধাই আমার নামের আগে-পরে যোগ করার মতো কিছু নেই। তবুও বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে, শিক্ষার চালচিত্র নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করেছি, কাজ করেছি, একে ওকে প্রশ্ন করেছি, জানতে চেয়েছি নিতান্তই ভেতরের ইচ্ছা থেকে; জানার একাগ্র বাসনা থেকে এবং ভেতরের ইচ্ছা আর জানার বাসনা ক্রমান্বয়ে শাণিত হয়েছে শিক্ষা বিষয়ক একটি ম্যাগাজিন এর দায়িত্ব কাধে নিতে হয়েছে বলে।

ব্যাপারটা পরিস্কার করে যদি বলি বা লিখি— তা হলো, বাংলাদেশে হাতে গোনা দু-একটি শিক্ষা বিষয়ক যে ম্যাগাজিন উল্লেখযোগ্য তার অন্যতম একটি 'পাঞ্জেরী শিক্ষা সংবাদ'। এটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হিসেবে শিক্ষা নিয়ে কাজ করতে হয়েছে, শিক্ষার হাল-হকিকত, ভালোমন্দ জানতে মাঠপর্যায়ে যেতে হয়েছে, সংশ্লিষ্টদের সাথে কথা বলতে হয়েছে। যেতে হয়েছে শিক্ষার্থী-শিক্ষক-শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছে। এতে করে সংশ্লিষ্টদের অভিজ্ঞতা ভাবনার বিষয়গুলো কখনো এলোমেলো, কখনো ধারাবাহিকভাবে শিক্ষা সংবাদের বিভিন্ন সংখ্যায় ফিচারে-প্রতিবেদনে-নিবন্ধে ফুটে উঠেছে।

যা আমার কাছে মনে হয়েছে বই আকারে এক মলাটের ভেতর আটকানো দরকার। যে

www.pathagar.com

কারণে 'মাঠপর্যায় থেকে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা : সাম্প্রতিক চালচিত্র' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত প্রতিবেদন ও ফিচার-নিবন্ধগুলো মূলত 'পাঞ্জেরী শিক্ষা সংবাদ'-এর উল্লেখ সংখ্যক অংশ। ফিচার এবং প্রতিবেদন তৈরি করতে গিয়ে 'পাঞ্জেরী শিক্ষা সংবাদ'-এর প্রকাশক-উপদেষ্টা, প্রতিবেদকসহ অনেকের সহযোগিতা নিতে হয়েছে। তাই 'মাঠপর্যায় থেকে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা : সাম্প্রতিক চালচিত্র' গ্রন্থের সকল দায়দায়িত্ব আমার একার হলেও এর অবদান আমার একার নয় মোটেও।

আমি শুধু মনে করেছি, শিক্ষার স্বার্থে, ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য সময়োপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের স্বার্থে বিভিন্ন সময়ে প্রশাসনের ভেতরে-বাইরের সংশ্লিষ্টদের সাথে যে কথা বলেছি, তার প্রয়োজনীয় ও চুম্বক অংশগুলো স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা দরকার এবং সেজন্যই এই গ্রন্থ সংকলন।

কারো পক্ষেই সব ভালো কিংবা সব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। সবাই একটু একটু ভালোর চেষ্টা করলে, সমাধানের চেষ্টা করলে হয়তো এক সময় ভালোর পুরোটা অর্জন করা সম্ভব। সে অর্থে এই গ্রন্থ অবশ্যই শিক্ষার স্বার্থে ভালো কিছু করার প্রয়াস।

এই ভালো কিছু করার সুযোগ করে দিয়েছেন বাংলাদেশের প্রকাশনা জগতে অন্যতম প্রতিষ্ঠান পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লিমিটেডের মু. আবদুল্লাহ্ আল বাকী, কাওসার হাসান ও কামরুল হাসান শায়ক।

কেননা, 'পাঞ্জেরী শিক্ষা সংবাদ' প্রকাশ না হলে এই গ্রন্থ কখনোই প্রকাশ পেত না। শিক্ষা নিয়ে আমার যে ভাবনা কাজ করেছে এবং এখনো করছে— তার একশ ভাগ সহযোগিতা এই তিন জনের কাছ থেকেই পাওয়া।

এবং সূচীপত্রের সাঈদ বারী— যিনি শিক্ষা বিষয়ক প্রতিবেদন-নিবন্ধগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন। তাঁর আন্তরিকতা, সহযোগিতা আমাকে ঋণী করেছে।

এ কথা সত্য যে, বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যমান দীনতার কথা, শিক্ষাব্যবস্থার কথা, শুধুমাত্র উল্লেখিত গ্রন্থের পরিধিতে তুলে ধরা মোটেও সম্ভব নয়। তবুও একটু একটু করে যে যার দায়িত্ব পালন করে যাই-না কেন!

ধন্যবাদ সবাইকে।

৪১/ই-২ হরিচরণ রায় রোড
ফরিদাবাদ, ঢাকা ১২০৪

হুমায়ুন কবীর

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূ | চী

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশের শিক্ষা

নারী শিক্ষা / ১৫

সহশিক্ষা / ২১

প্রসঙ্গ: জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০ / ২৬

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৩ : একটি পর্যালোচনা / ৩৮

তবুও নকল / ৫১

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিক্ষার মাধ্যম

শিক্ষার মাধ্যম / ৫৭

শিক্ষা বাণিজ্যে কিন্ডারগার্টেন স্কুল ॥ এক / ৬৬

শিক্ষা বাণিজ্যে কিন্ডারগার্টেন স্কুল ॥ দুই / ৭৪

তৃতীয় অধ্যায়

শিক্ষার পদ্ধতি ও প্রস্তুতি

বৃত্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি-পাঁচালি / ৮৫

এস. এস. সি পরীক্ষার প্রস্তুতি / ৯০

এস.এস.সি পরীক্ষায় কমিউনিকেটিভ ইংলিশ / ৯৪

চতুর্থ অধ্যায়

শিক্ষা সংলাপ

আ.ন.ম এহ্ছানুল হক মিলন / ১০৫

প্রফেসর ড. এম আসাদুজ্জামান / ১১৫

প্রফেসর মোঃ মনিরুজ্জামান মিঞা / ১২৭

অধ্যাপক এ. কে. আজাদ চৌধুরী / ১৩৩

প্রফেসর ড. সাইফুল ইসলাম ফারুকী / ১৩৪

প্রফেসর ড. মোসলেহ্ উদ্দীন আহমদ / ১৩৫

প্রফেসর ড. আব্দুল কাদির ভূঁইয়া / ১৩৬

অধ্যাপক মো: আশরাফ আলী / ১৩৭

খালেকুজ্জামান / ১৩৭

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ / ১৩৯

কৃষিবিদ জাবেদ ইকবাল / ১৩৯

শিক্ষার প্রসারে এনজিও কার্যক্রম / ১৪২

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়
বাংলাদেশের শিক্ষা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নারী শিক্ষা

আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন অনুধাবন করেছিলেন শিক্ষার অভাব নারী জাতির অবনতি ও অধপতনের মূল কারণ। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, শিক্ষার বিমল জ্যোতির প্রভাবে নারীমনে সচেতনতা ও আত্মমর্যাদাবোধ জেগে ওঠবে। ফলে সমাজে নারী নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে এবং নারী তার কাজে কর্মে এগিয়ে যাবার সাহস সঞ্চার করবে।

একবিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে দাঁড়িয়েও কি জাতি নারী শিক্ষার অভাব অনুভব করছে না? বেগম রোকেয়া নারী শিক্ষার কথা বলতে গিয়ে ১৯৩১ সালে পঞ্চম বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সম্মেলনে সভানেত্রীর অভিভাষণে বলেছেন, "স্ত্রী শিক্ষার কথা বলিতে গেলেই আমাদের সামাজিক অবস্থার আলোচনা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। আর সামাজিক অবস্থার কথা বলিতে গেলে, নারীর প্রতি মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের অবহেলা, ঔদাস্য, এবং অনুদার ব্যবহারের প্রতি কটাক্ষপাত অনিবার্য্য হয়।"

বেগম রোকেয়ার বক্তব্যে যে সময়কার সামাজিক অবস্থানের কথা বলা হয়েছে, সেই থেকে বর্তমান প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। পরিবেশ পরিস্থিতি, সামাজিক-রাষ্ট্রিক, আর্থিক-বৈষিক সবকিছুই বদলেছে; অনেক কিছুরই পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটেছে। অথচ এখনও নারী শিক্ষার ব্যাপারে কিছু লিখতে গেলে সেরকম সামাজিক অবস্থার কথাই বলা অনিবার্য হয়ে পড়ে। কেননা নারীর অগ্রগতি সাধিত হয়েছে কতটা, তা ভাববার বিষয়। রাষ্ট্রিক পট-পরিবর্তনের কথা যদি বলা হয়, অর্থাৎ, বেগম রোকেয়া যে সময়ের কথা বলেছেন, তখন ভারতবর্ষ ছিল ব্রিটিশ শাসিত অঞ্চল। এরপর '৪৭-এ দেশভাগের পর বাংলাদেশ 'পূর্ব-পাকিস্তান' নামে পাকিস্তানের একটা অংশ, যা '৭১-এ এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর স্বাধীন বাংলাদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ। অর্থাৎ, পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত হলো এ দেশ। সামাজিক অবস্থা ও অবস্থানের পরিবর্তন, সাংস্কৃতিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হলো। কিন্তু নারী কি স্বাধীন হতে পেরেছে পুরুষ সমাজের শাসন ও শোষণ থেকে? অথচ নারী ও পুরুষ জীবন নাট্যের দুই প্রধান কুশীলব নারী শুধু পুরুষের নম্র সহচরী নয়। পুরুষের কাছে নারী জননী-জায়া-দুহিতা। কল্যাণীরূপে নারী ঐশ্বর্যময়ী। মাতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীরই প্রাধান্য। রাজনীতি, সমাজ-সংস্কারেও নারীর ভূমিকা অনন্য। তবুও সামগ্রিক দিক থেকে নারী পিছিয়ে কেন? এই বিশ্লেষণের আগে নারীর প্রাচীন ইতিহাস তথা নারী শিক্ষার অতীত খুলে দেখা যেতে পারে।

www.pathagar.com

প্রাচীন ও মধ্যযুগে নারী শিক্ষা

প্রাচীনকালে নারীরা পুরুষের পাশাপাশি বিভিন্ন কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণ, শিক্ষাগ্রহণ তথা জ্ঞান অর্জন করলেও মুসলমান নারীসমাজ—কী প্রাচীন কী মধ্যযুগ—কোনো কালেই খুব একটা অগ্রসর হতে পারেনি। ধর্মীয় কুসংস্কার, সামাজিক গোঁড়ামি তখনকার মুসলমান নারীকে অবরোধবাসি করে রেখেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে জ্ঞান-বিপর্যয় ঘটেছে নারীর। নারীর কাছ থেকে সমাজ অনেক অধিকার কেড়ে নিয়েছিল। সমাজের চাপে কুসংস্কারমুক্ত পরিবার থেকেও নারীর শিক্ষা এগোয়নি। কারণ একঘরে কটা, ধর্ম গেল, জাত গেল জাতীয় কুপ্রভাব। আর সমাজকে সায় দিয়েছিল ধর্মীয় গোঁড়ামি আর সামাজিক কুসংস্কার।

উঁচু মহলেও তখন নারী শিক্ষার প্রসার বাড়ির দোরগোড়া পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। এক কথায় নারীর প্রধান আশ্রয়স্থল অন্তপুরের বন্দিশালা। পর্দা প্রথা নারী শিক্ষাকে কোনঠাসা করে রাখল। এমন কি কৌলীন্য প্রথা, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ নারীকে অভিশপ্ত করে তুলল। ধর্মের খোলসে বন্দি নারীকে মানসিক-সামাজিকসহ সকল প্রকার নির্যাতনে হাবুডুবু খেতে হলো। অর্থাৎ, প্রাচীনযুগে নারীদের জীবন মূলত বন্দিদশায় কেটেছে।

নারী শিক্ষায় বেগম রোকেয়া

সত্যিকার অর্থে নারী শিক্ষার প্রকৃত দ্বার উন্মোচিত হয়েছিল বেগম রোকেয়ার আমলেই। বিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় বাঙালি মুসলমান নারী তখনও অন্ধকারে বন্দি। বলতে গেলে পুরো মুসলমান সমাজই কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ। নারী

"নারী শিক্ষার ব্যাপারটি রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থার সঙ্গে জড়িত। বিষয়টিকে বর্তমানে সেভাবে বিচার করা হচ্ছে না। ফলে সমস্যা জটিলতর হচ্ছে। দেশে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল থাকলে এবং গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল দ্বারা সরকার গঠিত হলে সন্তোষজনক ও আশাপ্রদ কর্মনীতি সূচিত হতে পারে। গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল যাতে দেশে গড়ে তোলা যায় সে উদ্দেশ্যে প্রত্যেক নাগরিকেরই কিছু না কিছু কাজ করা কর্তব্য।

প্রথমে দরকার বর্তমান বাস্তবতায় নারী-পুরুষ সম্পর্কের সমস্যাটাকে গভীরভাবে বোঝা। তারপর নারীর উন্নতির অনুকূলে সমাজের ব্যবস্থাদির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করা। নারীর সমস্যা পুরুষের সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন কিংবা স্বতন্ত্র নয়। এর সঙ্গে সম্পত্তির মালিকানা ও উত্তরাধিকার এবং সন্তানের প্রশ্ন জড়িত। সেভাবে সমস্যা সামগ্রিকতার মধ্যে বিষয়টিকে বিচার করতে হবে। সে ধারার আলোচনার সূত্রপাত হলে কর্মনীতি নির্ধারণ করা যাবে।"

আবুল কাসেম ফজলুল হক
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

মানেই যেন পর্দার আড়ালের কোনো প্রাণী। পর্দাহীন কোনো মুসলমান নারী বাড়ির দেওড়ি পেরিয়ে বেরিয়ে আসবে, তা ছিল কল্পনাতীত ব্যাপার। যার ফলে, 'মুসলমানদের যাবতীয় দৈন্য-দুর্দ্দশার একমাত্র কারণ স্ত্রীশিক্ষায় ঔদাস্য।' সে সময়ে নারীর শিক্ষা গ্রহণ তো দূরে থাক, নারীর অবস্থা এমন ছিল যে—

"একবার কোনো এক চলন্ত ট্রেনে মেয়ে মানুষদের কক্ষে একটা চোর উঠিল। চোর বহাল তবিয়তে একে-একে প্রত্যেকের অলংকার খুলিয়া লইল; কিন্তু লজ্জায় জড়সড় লজ্জাবতী অবলা সরলা কুলবালাগণ কোনো বাঁধা দিলেন না। তাঁহারা সকলে ক্রমাগত ঘোমটা টানিতে থাকিলেন। 'তওবা! তওবা! কাঁহা সে মর্দ্দুয়া আ গয়া!' বলিয়া কেহ কেহ বোরকার 'নেকাব' টানিলেন। পরে চোর মহাশয় ট্রেনের এলার্মের শিকল টানিয়া গাড়ি থামাইয়া নির্ব্বিঘে নামিয়া গেল।"

(অবরোধবাসিনী/ বেগম রোকেয়া)

স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে বেগম রোকেয়া নারীর সকল বাঁধা উপেক্ষা করে বলেছিলেন, "যে পর্য্যন্ত পুরুষগণ সাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে স্ত্রী লোকদিগকে তাহাদের প্রাপ্য অধিকার দিতে স্বীকৃত না হয়, সে পর্যন্ত তাহারা স্ত্রী লোকদিগকে শিক্ষাও দিবে না। যাহারা নিজের সমাজকে উদ্ধার করিতে পারিতেছে না, তাহারা আর দেশোদ্ধার কিরূপে করিবে? অর্ধাঙ্গীকে বন্দিনী রাখিয়া নিজে স্বাধীনতা চাহে, এরূপ আকাঙ্ক্ষা পাগলেরই শোভা পায়।"

বেগম রোকেয়া নারী শিক্ষার প্রয়োজন অনুধাবন করেছেন বলেই সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশে থেকেও ১৯০৯ সালে 'সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি চেয়েছেন পুরুষের সমান নারীর অধিকার। আর নারীর অধিকার রক্ষায় প্রয়োজন নারী শিক্ষার। যে শিক্ষা নারীকে মানসিক দাসত্ব থেকে মুক্ত করবে। তিনি সুশিক্ষার কথা বলেছেন। "আমি চাই সেই শিক্ষা যাহা তাহাদিগকে নাগরিক অধিকার লাভে সক্ষম করিবে,...। শিক্ষা-মানসিক এবং শারীরিক উভয়বিধ হওয়া চাই।"

সংগত কারণেই নারী শিক্ষার অগ্রগতির সুচনা পর্ব হিসেবে গত শতাব্দীর সূচনালগ্নকেই অভিহিত করতে হবে এবং তা অবশ্যই বেগম রোকেয়ার চেষ্টায় সম্ভব হয়েছে।

নারী শিক্ষার অন্তরায়

বর্তমান সময়ে নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে সত্য। কোথাও কোথাও নারীর সামাজিক অবস্থান সম্মানজনক। রাজনীতি, সমাজ-সংস্কারে নারীর ভূমিকাও লক্ষণীয়। কিন্তু বেগম রোকেয়া নারী শিক্ষার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন যে কারণে, অর্থাৎ, নারীর মানসিক দাসত্ব থেকে মুক্তি; বাস্তবে কি তা ঘটেছে?

www.pathagar.com

পরিবারে-সমাজে-রাষ্ট্রে নারী কি নির্দ্বিধায় অধিকার নিয়ে চলতে পারছে?

পুঁথিগত বিদ্যায় নারী অনেকটা এগিয়েছে, কিন্তু নারীর মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি বদলায়নি। পাশাপাশি পুরুষের নিগ্রহ, সমাজের বাঁকা চাহনি থেকে নারী পুরোপুরি মুক্ত নয়। বরং দিনদিন নারী বোরকার আড়ালে লুকোচ্ছে। 'সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিও পরিবর্তন এমনভাবে হওয়া উচিত যাতে নারী তার শিক্ষাকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার সুযোগ লাভ করতে পারে। অনেক শিক্ষিত পরিবারই শিক্ষিত স্ত্রী বা পুত্রবধূ পেতে আগ্রহী, কিন্তু তার চাকরি বা ব্যবসা পরিচালনায় নিতান্তই বিরূপ মনোভাবাপন্ন'। এক সাক্ষাৎকারে একথা বলেছেন সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজের অধ্যাপিকা কামরুল লায়লা। এখনো গ্রামীণ নারীকে কুসংস্কারের বেড়াজালে আটকে রাখা হয়। শুধু গ্রামীণ পরিবেশেই নয়, শিক্ষিত শহুরে জীবনেও নারী নিগ্রহ, লাঞ্ছিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এখনো স্বামীর নিয়মিত খবরদারি নারীকে সহ্য করতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষিত নারীরও নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। সালেহা করিম একজন শিক্ষিত গৃহিণী। সে অনেকটা ক্ষোভ নিয়ে জানায় 'নারীর কাজ তো স্বামী সেবা, ঘর গোছানো, বাচ্চা সামাল দেওয়া, আর স্বামীর জন্য পথ চেয়ে বসে থাকা।' আচার-অনুষ্ঠান কিংবা পারিবারিক-সামাজিক রীতি-নীতি এখনো পুরুষের ইচ্ছে মাফিক চলে। সালেহা করিম-এর মতে, 'অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংসারের বৈষয়িক অনেক কিছুই আমাকে জানানো হয় না।'

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নারী অনেকটা পিছিয়ে। যদিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক মনে করেন, 'উচ্চশিক্ষায় নারীর উপস্থিতি দ্রুত বাড়ছে'। তবে বাস্তবতা বলে আর্থিক অস্বচ্ছলতা, বাল্যবিবাহ, পারিবারিক অসহযোগিতা, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি ব্যাপারগুলো নারীর উচ্চশিক্ষার প্রধান অন্তরায়। এখনো অনেক পরিবারে বাবা-মা মেয়ের বিয়ে দিতে পারলেই লেখাপড়ার প্রয়োজন শেষ মনে করেন। অনেক নারীও বিয়ের পর নিজ থেকেই লেখাপড়া করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। লেখাপড়ার প্রধান উদ্দেশ্য শিক্ষিত স্বামী পাওয়া, অন্যকিছু নয়। সেক্ষেত্রে নারীর উচ্চশিক্ষার পথ রুদ্ধ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

"বাংলাদেশের শিক্ষিত নারীসমাজ প্রকৃতপক্ষে পুঁথিগত বিদ্যায় যতটা পারদর্শী, বাহ্যিক এবং বাস্তবক্ষেত্রে তারা ততটা পারদর্শী নয়। এ বাস্তব সত্যের কারণেই অধিকাংশ নারী পুরুষের উপর নির্ভরশীল। অবচেতনভাবেই বাংলাদেশের নারীসমাজ পুরুষাবলম্বী হয়ে পড়ে। উচ্চশিক্ষিত এবং সাধারণ শিক্ষিত সকল নারীরই তার নিজস্ব সত্তা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া উচিত। মাতৃত্ব বা শারীরিক দুর্বলতা বা যে-কোনো ধরনের অজুহাতেই তার পুরুষ-নির্ভর হওয়ার মন মানসিকতার পরিবর্তন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তার নিজস্ব জগৎ, কর্মক্ষেত্রেও স্বাধীনতা সৃষ্টির লক্ষ্যেই তার স্বাবলম্বী হওয়া আবশ্যক।"

কামরুল লায়লা
অধ্যাপিকা, ইংরেজি বিভাগ
সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ

www.pathagar.com

নারীর উচ্চশিক্ষার আরেকটি অন্তরায় স্বামীর ব্যক্তিত্বের সংঘাত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বামীরা মনে করে স্ত্রীরা অধিক শিক্ষিত হলে তাদের পদানত থাকবে না। স্বামীর এই মানসিকতা অনেক সময় স্ত্রীর উচ্চশিক্ষার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

নারী শিক্ষার ইতিবাচক দিক

শিক্ষার কারণেই নারী বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যোগ্যতার প্রমাণ রাখছে। অনেক ক্ষেত্রে মানসিক, পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের ফলে নারীরা সামাজিক রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে। নারীরা আজ দেশরক্ষার অতন্দ্রপ্রহরী। সেনাবাহিনীতে নারীর উজ্জ্বল উপস্থিতি। শুধু তাই নয়—কুটিরশিল্প, বৃক্ষরোপণ, মৎস্য ও হাঁস-মুরগির খামারে নারীরা সফল ভূমিকা পালন করছে। নারীর মেধা-মনন পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়ে সফলতা অর্জন করছে। রাষ্ট্রপরিচালনায়ও নারীরা যোগ্যতার প্রমাণ রেখেছে। ইন্দিরাগান্ধী, চন্দ্রিমা কুমারাতুঙ্গা, বেনজির ভুট্টো, কোরাজন একুনো, এসব নারীর রাজনীতিতে উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষণীয়। বাংলাদেশেও বর্তমান সরকার প্রধান ও বিরোধীদলীয় নেত্রী নারী। এটা সম্ভব হয়েছে-নারীর শিক্ষা তথা জ্ঞান-গরিমা অর্জনের ফলেই।

নারী শিক্ষার মাঝেই নারীর সামগ্রিক অগ্রগতি, পারিবারিক-সামাজিক মুক্তি সম্ভব। যে সম্ভাবনা বেগম রোকেয়া তৎকালীন মুসলমান সমাজে জাগিয়েছিলেন; মুসলমান সমাজ নারী শিক্ষার প্রয়োজন অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।

"এখন মুসলমান সমাজ বুঝিয়াছেন, স্ত্রী শিক্ষা ব্যতীত এ অধঃপতিত সমাজের উন্নতির আশা নাই। তাই তাঁহারা আর শুধু ভ্রাতৃসমাজ লইয়াই ব্যস্ত নহেন চতুর্দ্দিকে স্ত্রী শিক্ষার আলোচনা হইতেছে ও জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে।"

এই উপলব্ধি থেকেই নারী-অগ্রগতির বর্তমান প্রেক্ষাপট রচিত বলে অনেকে মনে করেন। চাকুরিজীবী লায়লা বলেন, 'আসলে বেগম রোকেয়া আমাদের পায়ের শৃঙ্খল খুলে দিয়ে গেছেন ঠিক কিন্তু সামাজিক ব্যারিকেড আমাদের আটকে রাখছে— ইচ্ছা মাফিক কোথাও যেতে পারছি না, কিছু বলতে পারছি না।' স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশে নারী শিক্ষার যেভাবে প্রসার লাভ করার কথা সেভাবে প্রসার লাভ করেনি। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতাও কখনোই সুবিধাজনক ছিল না। সেই সাথে রাষ্ট্রে আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক অবস্থাও অনুকূলে ছিল না। যদিও সরকার নারী শিক্ষার অগ্রগতির লক্ষ্যে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত উপবৃত্তি চালু করেছে। গ্রামীণ গরিব বাবা-মা এই উপবৃত্তিতে সামান্য সহায়তা পাচ্ছে বটে; এতে নারী শিক্ষার সমূহ অন্তরায় দূর হয়নি। 'উপবৃত্তির পাশাপাশি গরিব ছাত্রীদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।' এটা মনে করেন জামালপুর জেলার সিংহজানী বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাছেত আলী। তা ছাড়া উপবৃত্তি নিয়ে প্রায়ই দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। গ্রামীণ দরিদ্র বাবা-মা'র স্বদিচ্ছা

www.pathagar.com

আর সরকারের শত ভাগ পৃষ্ঠপোষকতা থাকলে নারী শিক্ষার উজ্জ্বল সম্ভাবনা অবশ্যম্ভাবী। পাশাপাশি ধর্মীয় গোঁড়ামি, যেমন—ফতোয়াবাজি, সামাজিক কুসংস্কার, পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গি, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি রোধ করতে সরকারের খবরদারি জরুরি।

শেষ কথা

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বলেছেন, 'আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদের একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দেব।' নেপোলিয়ন বোনাপার্টের এই যথার্থ উপলব্ধি মর্মে মর্মে অনুধাবন করার মাধ্যমেই নারী শিক্ষার চূড়ান্ত অগ্রগতি সম্ভব। তা করতে হবে পরিবার-সমাজ রাষ্ট্রসহ সকল পর্যায়ের একাগ্রতা আর সদিচ্ছায়। এটাও সত্য যে, 'দেশে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল থাকলে এবং গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল দ্বারা সরকার গঠিত হলে সন্তোষজনক আশাপ্রদ কর্মনীতি সূচিত হতে পারে।' নারী শিক্ষায় সমাজে যে সকল অন্তরায়গুলো চিহ্নিত— যেমন মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি, কুসংস্কার, নারীকে শুধুমাত্র নারী হিসেবেই দেখা, পারিবারিক সামাজিক কর্মকাণ্ডে নারীকে জড়িত না করার প্রবণতা ইত্যাদি বিষয়গুলো থেকে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনতে হবে। কেননা, শিক্ষার সঙ্গে আসে মানসিক স্বাধীনতা। তা ছাড়া শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা ও চরিত্র গঠনে মায়ের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মার কাছ থেকেই শিশু প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ ভাবী জীবনের পাঠ নেয়। তাই নারী শিক্ষার প্রয়োজন জরুরি। নারী শিক্ষার আলো দিয়েই শিশুকে ভবিষ্যতের পথ চেনায়।

সর্বোপরি যে ব্যাপারটি লক্ষণীয়, পাঠ্যসূচিতে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাসহ নারী শিক্ষার ইতিবাচক দিক তুলে ধরে লেখনী অন্তর্ভুক্তিপূর্বক শিক্ষার্থীদের সচেতন করে তোলা। আর এভাবেই নারী শিক্ষার অগ্রগতি, নারীজাগরণ তথা পুরুষের পাশাপাশি নারীও সমাজের বিরাট একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ অনুধাবন করা যাবে।

"যেহেতু আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই অল্প শিক্ষিত এবং তারা ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে অভ্যস্ত, যার ফলশ্রুতিতে নারীরা মানসিক দাসত্ব থেকে মুক্ত নয়। কাজেই নারী শিক্ষার স্বার্থকতা তখনই সম্ভব যখন তাদের এই মানসিক অবস্থার পরিবর্তন করা যাবে। বেগম রোকেয়া বলেছেন, 'মানসিক দাসত্ব থেকে নারীকে মুক্ত করাই নারী শিক্ষার সার্থকতা।' তাই বলা যায়, 'আগে মাকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মনের প্রসারতা বৃদ্ধি করতে হবে'। তাহলেই নারী শিক্ষার স্বার্থকতা উপলব্ধি করা যাবে।"

জনাব বাহেজ আলী
ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক
সিংহজানী বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, জামালপুর।

www.pathagar.com

সহশিক্ষা

অধিকতর স্বাস্থ্যসম্মত, সুষম-সমম্বয়কারি তৈরি করে সহশিক্ষা—এই মতামতটি পৃথিবীব্যাপী সমাদৃত। এর ব্যতিক্রমও পরিলক্ষিত হয় ইসলামি দেশগুলোয়। যেখানে সহশিক্ষার চেয়ে আলাদা শিক্ষার গুরুত্ব বেশি। বাংলাদেশে সহশিক্ষার সামগ্রিক অবস্থা নিয়ে এই নিবন্ধ।

'আমি সব সময় সহশিক্ষার পক্ষে। সহশিক্ষা বালকদের সাথে আদান-প্রদানে সাহসী ও স্মার্ট হতে সহায়তা করে। ছেলেমেয়ের মাঝে সৃষ্ট বৈষম্যও দূর করে।' এ কথাগুলো বলেছে বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী ফারহানা। আবার এর দ্বিমত পোষণ করে ভিকারুন নিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী মীম বলেছে, 'আমি সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বালিকাদের জন্য আলাদা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেহেতু একাডেমিক বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে মনোনিবেশ করতে হয়, সেখানে চারপাশে ছেলেদের না থাকাই শ্রেয়। ছেলেদের সাথে কথা বলা তথা নোট আদান-প্রদানে বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।'

তবে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলে বোঝা গেছে অধিকাংশ শিক্ষার্থীই সহশিক্ষার পক্ষে। ছাত্রদের প্রায় সকলেই। 'আমি মনে করি ক্লাসে কে ছেলে কে মেয়ে এটা বিবেচ্য বিষয় নয়, ক্লাসের সকলেই আমার বন্ধু, সহপাঠী— এটাই বিবেচ্য। তাই ছেলেমেয়ের একসাথে পাঠ পক্রিয়া চলতেই পারে।' মতিঝিল মডেল স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র তৌহিদের বক্তব্য এরকম। তার মতো অনেকেই মনে করে, 'আমাদের মূল সমস্যা হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গির অধগতি।'

বোদ্ধা মহলের অনেকে মনে করেন ছেলেমেয়ের মধ্যে বৈষয়িক পার্থক্য সৃষ্টি করেছে সমাজ। ভারতের প্রখ্যাত লেখক কমলা ভাসিন এক নিবন্ধে লিখেছেন, "This biological of physical constructions is called sex. Because of their physical constrution, boys belong to the male sex, and girls to

---

"Instead of encouraging similarities between girls and boys, societies and cultures have been emphasizing the differences. That is why girls and boys grow up so differently and their paths are so separate. It is these inequalities that have caused so many tensions and confliets between men and women."

—Kamla Bhasin

www.pathagar.com

the female sex. প্রকৃতি ছেলেমেয়ের দৈহিক কিছু পরিবর্তন করে দিলেও পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রয়োজন শুধু পুরুষকেই নয় বা পুরুষের জন্যেই নয় রাষ্ট্র বা সমাজ। নারীকে যেমন প্রয়োজন, নারীরও অধিকার বজায় রয়েছে পরিবারে-সমাজে-রাষ্ট্রে। যদিও বাস্তবে সারা পৃথিবীতেই সামাজিক লৈঙ্গিক পার্থক্য হচ্ছে মূলত পিতৃতান্ত্রিক, যার গোড়ায় রয়েছে পুরুষ আধিপত্য। এগুলো পুরুষকে সহায়তা করে। কারণ বিরাজমান সামাজিক লৈঙ্গিক পার্থক্য আসলে নারী বিদ্বেষী। ফলে মেয়েরা অনেক প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে থাকে এবং তারা বৈষম্য ও নির্যাতনের মুখোমুখি হয় প্রতিনিয়ত। দেখা গেছে, সহশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের তুলনায় শিক্ষার্থীদের পিতামাতা বেশি সচেতন। কারণ, সকল পিতামাতাই চান তার সন্তান লেখাপড়া করতে গিয়ে শুধু লেখাপড়া নিয়েই ভাবুক। চারপাশের কোনো ঝক্কিঝামেলা যেন সন্তানকে গ্রাস না করে। বিশেষ করে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া সন্তানের ব্যাপারে পিতামাতা সাবধান থাকেন যেন তার সন্তান বিপরীত লিঙ্গের প্রতি উৎসাহিত না হয়। এমন কি মেয়েদের ব্যাপারে মায়েরা অতিসচেতন এবং সাবধান। ছেলেদের সাথে মিথোস্ক্রিয়ার ব্যাপারে তাদের অনুভূতিকে অবদমিত করতে চায় মায়েরা।

পিতা-মাতার এরকম সাবধানতা আমাদের সামাজিক পারিপার্শ্বিকতার কারণেই। সমাজের বিপথগামী কিছু মানুষ, সামাজিক কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামির জন্য পিতামাতাকে শুধু সাবধানই নয় অনেকক্ষেত্রে ভীতু করে তুলেছে।

যদিও ভারতের প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ডা. সুধীর কাক্কার সার্ক অঞ্চলের সামাজিক প্রেক্ষাপটে পিতৃতান্ত্রিকতা এবং প্রবীণ গোষ্ঠীর শাসনই সহশিক্ষা এবং লিঙ্গের মধ্যকার মিথোস্ক্রিয়া সম্পর্কে পিতামাতার এই ভীতির প্রধান কারণ মনে করেন। তিনি বলেন, "সহশিক্ষার পক্ষে প্রধান যুক্তি হলো; এটা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি যে কল্পনাপ্রবণ দৃষ্টিভঙ্গি থাকে তার রহস্যকে উন্মোচিত করে, যা পরিণত বয়সে গতানুগতিক পরিকল্পিত বিয়ে, যা বাবা-মা'রা ঠিকঠাক করেন— তার সঙ্গে খাপ খায় না। যে যাই বলুক, আমাদের সমাজে বিয়ে একটা অর্থনৈতিক এবং উঁচু-নিচুর মাপ কাঠির বিষয়— যেখানে পিতা-মাতারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সহশিক্ষা দুই লিঙ্গের মধ্যেকার মিথোস্ক্রিয়াকে সাহসী করে তুলে, যা বিয়ের

"সহশিক্ষায় আপত্তির কারণ দেখি না। যেসব সমস্যা দেখা দেয় সেগুলো সমাজের অর্থনৈতিক অধিকার ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের ফল। গোটা শিক্ষাব্যবস্থাটা ভেতরে বাইরে ঢেলে সাজাতে হবে। তাতে নারী ও পুরুষ উভয়ের শিক্ষায় সমস্যাবলি সমাধানের প্রয়োজন হবে।"

আবুল কাশেম ফজলুল হক
অধ্যাপক, বাংলাবিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

ব্যাপারে বাবা-মাসহ গুরুজনদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে গ্রাস করে—আর এটাই সহশিক্ষার বিরোধিতার সর্বজনবিদিত প্রতিবাদ।" তিনি মনে করেন, "এক লৈঙ্গিক শিক্ষা মেয়ে এবং ছেলের মধ্যকার মিলগুলোকে উৎসাহিত করার পরিবর্তে প্রচলিত সমাজ এবং সংস্কৃতি অমিল বা পার্থক্যগুলোকেই গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ফলে বৈষম্য বাড়তেই থাকে। আর সে জন্য মেয়ে এবং ছেলে ভিন্নভাবে বড় হয়ে ওঠে। তাদের মন্তব্যও হয় আলাদা। পরবর্তীতে অর্থাৎ কর্ম এবং বৈবাহিক জীবনে গিয়ে কখনো-কখনো এর বৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করে। নারী-পুরুষের মাঝে নানা অসঙ্গতি জন্ম নেয়। যার ফলে পরিণত জীবনেও বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটে।"

অবশ্য এ-কথা মানতে রাজি নয় উচ্চশিক্ষিতা উম্মে সালমা। যে একজন সরকারি কর্মকর্তা। "আমি টোটালি এক লৈঙ্গিক শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষে। ক্লাসে ছেলেদের বাঁকা চাহনির ঘোরে থেকে লেখাপড়া হয় না। লেখাপড়া করতে নিজের মতো একটা পরিবেশ দরকার। এ ছাড়া একটা মেয়ে কিছু-কিছু সময় ছেলেদের থেকে দূরে থাকাটাই পছন্দ করে। প্রকৃতি যখন মেয়েকে আলাদা করে সৃষ্টি করেছে, পুরুষ কেন ঠুনকো কিছু অজুহাতে মেয়েদেরকে সাথে রাখতে চাইছে? আমি মনে করি সহশিক্ষা পুরুষের গৃহীত একটা ব্যবস্থা।"

অপরদিকে ময়মনসিংহ ত্রিশাল উপজেলার সহকারি শিক্ষা অফিসার ফয়জুননেছা বেগম সহশিক্ষা সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করে বলেছেন—"সহশিক্ষা নারীর শিক্ষা বিস্তারে একটি উল্লেখযোগ্য দিক। তবে আমাদের দেশ থেকে যতদিন পর্যন্ত কুসংস্কার দূর না হবে, নারীর সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত না হবে, ততদিন পর্যন্ত সহশিক্ষার সুফল খুঁজে পাওয়া যাবে না।"

সম্প্রতি ব্রিটেন ও আমেরিকায় শিক্ষাবিদদের পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, সহশিক্ষা নারীদের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম নয় এবং এই পরিবেশ তারা একাডেমিক ক্যারিয়ার গঠনের কম সুযোগ পায়, সেক্ষেত্রে এক লৈঙ্গিক বিদ্যালয় তাদের মেধাকে সর্বোত্তম উপায়ে প্রস্ফুটিত করার ক্ষেত্রে উত্তম।

কিন্তু ড. ডেভিড উইল কিনসিন, ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র এবং যিনি কেনিয়া, সিঙ্গাপুর, লেসেথো, হংকং ইতালী ও

"সহশিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীরা নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারে সহজেই—তারা সৃষ্টিশীল হয়ে ওঠে। কোনো একটা সিদ্ধান্ত নিতে তাদের কালক্ষেপণ হয় না। এটাকেই আমি সহশিক্ষার ইতিবাচক দিক হিসেবে চিহ্নিত করব। আর নেতিবাচক দিক শুধু একটাই—যখন শিক্ষার্থীরা বয়ঃসন্ধিক্ষণে অবস্থান করে, সে সময়টা তাদের জন্য বিপদজনক। এই সময় পার হয়ে গেলে তারা তাদের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে।"

মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন
সহকারী প্রধান শিক্ষক
গবঃ ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ঢাকা

www.pathagar.com

থাইল্যান্ডে বিদ্যালয় পরিচালনা করেছেন, বর্তমানেও ভারতের পুনা'য় Mahindra United word college -এ কর্মরত। তিনি বিশ্বাস করেন যে, ব্রিটেন ও আমেরিকায় এ ধরনের গবেষণায় মিশ্র রায় পাওয়া যায় এবং সহশিক্ষা সামাজিক লাভ- লোকসানকে ছাপিয়ে যায়। "আমি এ ব্যাপারে জ্ঞাত যে, ব্রিটেনে পরিচালিত কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, একলিঙ্গ বিদ্যালয়ের মেয়ের পারফরমেন্স অপেক্ষাকৃত ভালো। কিন্তু একই গবেষণায় দেখা যায় ছেলে শিক্ষার্থীরা সহশিক্ষা বিদ্যালয়ে ভালো করছে। একাডেমিক অর্জনের বাইরে সহশিক্ষার পক্ষে যুক্তি হলো এই যে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হবে সমাজের আয়না। আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সহশিক্ষা বিদ্যালয়ে মেয়েরা বেশি সুযোগ পায় এবং বালক-বালিকারা একে অন্যকে শ্রদ্ধা করতে শেখে। টিনএজ শিক্ষার্থীর মাঝে যে যৌন ভয় বাবা-মা'র থাকে, তার জন্য তারাই দায়ি। কারণ, সন্তানের জন্য তারা ভালো ভূমিকা রাখে না।" যদিও যুক্তির খাতিরে সহশিক্ষা একলৈঙ্গিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চেয়ে এগিয়ে—তবে বিষয়টি তর্কের ঊর্ধ্বে নয়। সমাজ ও পরিবেশ পরিস্থিতির উপর সহশিক্ষার ভালো-মন্দ নির্ভর করে। ইসলামিক দেশগুলোয় ধর্মীয় অনুভূতির কারণেই সহশিক্ষার দাবি জোরালো না হলেও, আধুনিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় এবং জ্ঞান-গরিমায় সর্বোচ্চ আসনে আধিষ্ঠ হতে চাইলে একে অপরের মধ্যে সমন্বয় থাকা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সহশিক্ষা জরুরি। ছেলেমেয়ের পার্থক্য প্রকৃতিগত। শিক্ষাদীক্ষা এবং নানা কর্মকাণ্ডে এই পার্থক্য গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা সমীচীন নয়। টিনএজ শিক্ষার্থীদের নিয়ে যে ভয় পিতা-মাতা'র মনে বদ্ধমূল তা ধর্মীয় কারণে না যতটা, সামাজিক কুসংস্কার আর অবক্ষয় তার থেকে বেশি ভিত করে তুলে। এজন্য একলৈঙ্গিক শিক্ষা হলেই যে ছেলেমেয়ের জৈবিক তাড়না ঘোচানো যাবে, তা নয়। সর্বোপরি যে বিষয়টি সবচে' বেশি জরুরি, তা হলো সামাজিক অবক্ষয় রোধ, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করা। তবে, অধিকাংশরা একলৈঙ্গিক প্রতিষ্ঠানের সীমানা নির্ধারণের পক্ষে। "শিক্ষার্থীদের সবচে ভয়ঙ্কর অধ্যায় বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমিক স্তরটি। এ স্তরের শিক্ষার্থীদের নিয়েই ভয়টা বেশি। যেহেতু তারুণ্যের যাত্রা শুরু এ সময় থেকে। ফলে ছেলেমেয়েরা রহস্য উন্মোচনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এ সময় জৈবিক তাড়নাও শক্তিশালী রূপে আবির্ভূত হয়। এ তাড়নাকে অবদমিত করে রাখতে একলৈঙ্কিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলতে পারে। যদিও এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া যে নেই, তা বলব না। যেহেতু অবদমিত করার ব্যাপারটাই নেতিবাচক।" এ-রকম মনোভাব ব্যক্ত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের কয়েকজন শিক্ষক। লন্ডনের Dulwich college এর গ্রাহাম বিল, যিনি তিন ধরনের স্কুল অর্থাৎ, বালক, বালিকা ও সহশিক্ষার স্কুল নিয়ে দুই বছর ধরে সমীক্ষা চালিয়েছেন; তাতে দেখা যায়, একলৈঙ্গিক শিক্ষায় ছাত্রদের প্রাতিষ্ঠানিক সফলতা অনেক বেশি। অর্থাৎ, একলৈঙ্গিক শিক্ষায় মেয়েরা পিছিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশেও

www.pathagar.com

দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ বালিকা বিদ্যালয়ের গড় ফল বালক বিদ্যালয় থেকে অনেকটা পিছিয়ে। যে সকল বালিকা বিদ্যালয় ভালো ফলাফল করছে, যেমন ভিকারুন নিসা নূন স্কুল, ময়মনসিংহ গালর্স ক্যাডেট কলেজ, ভারতেশ্বরী হোমস্—এ জাতীয় বালিকা বিদ্যালয় হাতে গোনা কয়েকটি। অথচ সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মেয়েদের গড় ফলাফল অনেক ভালো। এতে এটাই প্রতিয়মান হয় যে, আমাদের পারিপার্শ্বিকতায় সহশিক্ষা ইতিবাচক একটি দিক।

জীবন হচ্ছে একটি সমন্বিত পক্রিয়া—বাড়িতে, কর্মক্ষেত্রে, রাস্তায় প্রায় সর্বত্র। যেহেতু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জীবনকে সঠিকভাবে প্রস্তুত করতে শেখায় এবং জীবনের বাস্তব সৌরভ এখানেই প্রতিফলিত; তাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছেলেমেয়ে সকলের জন্য একই পথ তৈরি করে—এটা ভাবতে হবে। এখানে লৈঙ্গিক পার্থক্য বা ব্যবধান তৈরি করা ঠিক নয়।

বাবা-মা'র মনে যে ভীতি বিরাজমান ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে, তা দূর করতে সমাজ পরিবর্তন এবং দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা আনতে হবে।

এ ব্যাপারে সর্বস্তরের জাগরণ ও সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। শিক্ষিত সচেতন গোষ্ঠী এবং সরকারের এক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করতে হবে। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও দিক নির্দেশনা থাকতে হবে।

"সহশিক্ষা শিক্ষার্থীর মনস্তাত্ত্বিক সামর্থ বাড়াতে যথেষ্ট সহায়তা করে। সহশিক্ষা শিক্ষার্থীর মাঝে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টিতে যথেষ্ট অবদান রাখে, যা শিক্ষাব্যবস্থায় সুফল বয়ে আনে বলে আমার বিশ্বাস।"

এসএম সাজ্জাদ হোসেন
সহকারি শিক্ষক, ময়মনসিংহ জেলা স্কুল

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ: জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০

গণপ্রজাতান্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের সতের নম্বর অনুচ্ছেদে প্রজাতন্ত্রের শিক্ষানীতির মর্মকথা বিধৃত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় সংবিধানে সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করে একটি গণমুখী ও সার্বজনীন যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে তাতে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, ধর্মীয় বিশ্বাস, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিফলিত হবে এটাই প্রত্যাশিত। এই উপলব্ধির আলোকে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য একটি উপযুক্ত শিক্ষানীতি সুপারিশ করার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে দেশের সর্বপ্রথম শিক্ষা কমিশন কুদরত-ই-খুদা কমিশন গঠিত হয়েছিল। যা ১৯৭৪ সালে প্রস্তুত করা হয়। সেই আলোকে 'সরকার একটি বাস্তব, গণমুখী ও যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, শিক্ষা প্রশাসক, চিন্তাবিদ, পেশাজীবী ও শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধি এবং বেসরকারি সংস্থায় প্রতিনিধি সমন্বয়ে ৫৬ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে। কমিটি গঠন হওয়ার পর সদস্যগণ চব্বিশটি সভায় মিলিত হয়ে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে অনুপুঙ্খ আলোচনা করেন, মতবিনিময় করেন এবং উনিশটি উপকমিটির প্রতিবেদন বিস্তৃতভাবে পর্যালোচনার পর চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করেন। এ ছাড়াও কমিটি জাতীয় দৈনিকসমূহে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত জনগণের মতামত ও মনোভাব পর্যালোচনা করে কমিটির চেয়ারম্যান দেশের পাঁচটি বিভাগীয় শহরে বিভিন্ন স্তরের পেশাজীবী ও সংগঠনের প্রতিনিধি ও নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ ও জাতীয় দৈনিকসমূহের সম্পাদকবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে সভায় মিলিত হয়ে মতবিনিময় করেন ও মূল্যবান মতামত প্রদান করেন, (*এম শামসুল হক প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ১৯৯৭-এর প্রতিবেদন, শিক্ষামন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত প্রসঙ্গ কথা দ্রষ্টব্য।*)

তার আগে সরকার এক অফিস আদেশে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কার্যপরিধি সম্পর্কে জ্ঞাত করেন;

(ক) কুদরত-ই-খুদা কমিশনের প্রতিবেদনকে গভীর এবং নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করে সেই প্রতিবেদনের বিভিন্ন প্রস্তাবসমূহকে যুগোপযোগী করার উদ্দেশ্যে দেশের সর্বপ্রকার ও সর্বস্তরের শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্যাদি পরীক্ষা করে একটি বাস্তবভিত্তিক সুষ্ঠু জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ণ করা এবং সরকারের অনুমোদনের জন্য তা পেশ করা।

(খ) জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার জন্য যাবতীয় কার্যাদি যথা— বিভিন্ন মহলের মতামত গ্রহণ করা, সেমিনার ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করা।

www.pathagar.com

সে মোতাবেক প্রফেসর এম শামসুল হক কমিটি ১৯৯৭ : সালে একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেন।

শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ১৯৯৭ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।

২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীকে সচেতন করা।

৩. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা এবং তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়বোধ ও চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলির বিকাশ ঘটানো।

৪. দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় পরিবর্তন আনার জন্য শিক্ষাকে প্রয়োগমুখী, উৎপাদনক্ষম, সৃজনশীল করে তোলা এবং শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন, দায়িত্ববান ও কর্তব্যপরায়ণ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা।

৫. কায়িক শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী করে তোলা এবং শিক্ষার স্তর নির্বিশেষ আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা।

৬. বিশ্বভ্রাতৃত্ব, অসাম্প্রদায়িকতা, সৌহার্দ্য ও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।

৭. গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের বিকাশের জন্য পারস্পরিক মতাদর্শের প্রতি সহনশীল হওয়া এবং জীবনমুখী, বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশে সহায়তা করা।

৮. শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে পূর্ববর্তী স্তরে অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিত দৃঢ় করা ও এগুলো সম্প্রসারণে সহায়তা করা এবং নবতর জ্ঞান ও দক্ষতা

"এমন অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে যেখানে সরকারি কোনো সাহায্য সহযোগিতা কিংবা অনুদান পায় না। স্কুলের মৌলিক কিছু চাহিদা থাকে; যেমন—শ্রেণী কক্ষে ফ্যানের অভাব, লাইটের অভাব, বেঞ্চের অভাব ইত্যাদি পূরণ সম্ভব হয় না। ল্যাবরেটরির জন্য সামান্য যা কিছু বরাদ্দ থাকে তা দিয়ে ল্যাবরেটরির ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর সংকুলান হয় না। কোনো কোনো স্কুলে দেখা গেল সমাবেশ কক্ষ নেই, খেলার মাঠ নেই, তাতে করে ছাত্র-ছাত্রীদের বিনোদনের সুযোগ থাকে না। শিক্ষানীতি প্রণয়ণের আগে অন্তত এই ব্যাপারগুলো খেয়াল রাখা উচিত।"

নার্গিস আনার বেগম
প্রধান শিক্ষিকা (অব:)
মতিঝিল গভ: গার্লস হাই স্কুল

www.pathagar.com

অর্জনে শিক্ষার্থীদের সমর্থ করা।

৯. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা ও নৈতিক মূল্যবোধ বিকশিত করে বংশপরম্পরায় হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা।

১০. দেশের জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।

১১. বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টির লক্ষ্যে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষালাভের সময় সুযোগ-সুবিধা অবারিত করা।

১২. শিক্ষায় জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে নারী পুরুষ বৈষম্য (Gender blasé) দূর করা।

১৩. শিক্ষার সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো।

১৪. পরিবেশ-সচেতনতা সৃষ্টি করা।

শামসুল হক কমিটি প্রণীত শিক্ষানীতি ১৯৯৭ 'প্রতিবেদনের মূল্যায়ন'-এর উপর বিভিন্ন মহল থেকে প্রাপ্ত মতামত বিবেচনা এবং বিভিন্ন মহলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করে একটি উপযুক্ত শিক্ষানীতির খসড়া তৈরি এবং অর্থায়নসহ শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নির্ধারণ করার জন্য সরকার ১৯৯৮ সালে একটি নতুন কমিটি গঠন করে। এই কমিটি যে খসড়া তৈরি করে তার উপর ভিত্তি করে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০ প্রণয়ন করা হয়। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০-এর 'অধ্যায়-১ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য' তে উল্লিখিত ১৫টি বিষয়ের মধ্যে ক্রমিক ১-১৪ পর্যন্ত এম শামসুল হক কমিটি থেকে গৃহীত। ক্রমিক ১৫ এই কমিটির নিজস্ব। এতে বলা হয়েছে, 'প্রসারমান বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় সকল অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে ও ক্ষেত্রে উচ্চমানের দক্ষতা সৃষ্টি করা।' যদিও বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় সকল অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্য প্রতিফলিত হয়নি শিক্ষানীতি ২০০০-এ, এমন অভিযোগ অনেকের। 'এ দৃষ্টিভঙ্গি কি গৃহীত নীতিতে প্রতিফলিত হয়েছে?' (*জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০, শিক্ষার আর্থিক ব্যবস্থাপনা; ম. আখতারুজ্জামান*)

খুদা কমিশনের বক্তব্য

খুদা কমিশনের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন সরকারের ইচ্ছা থাকলেও সম্ভব নয়। কারণ, পট পরিবর্তন। ড. খুদা কমিশনের লক্ষ্য ছিল এমন এক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন, যা সংবিধানের চার মূলনীতি, বিশেষত সমাজতন্ত্র বাস্তবায়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রণীত। 'কিন্তু ১৯৭৫-১৯৯৬ সালের মধ্যে বাংলাদেশে বিরাট মাপের রাজনৈতিক পশ্চাদগতি ঘটে।' এবং সামজতন্ত্রও চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতির অংশ নয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার, বিশেষত তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লব পুরোনো অনেক ধ্যান-ধারণাকেও বাতিল করে দিয়েছে। এসব বিষয়গুলো মাথায় রেখে শামসুল হক কমিটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেন। তবে খুদা কমিশনের বক্তব্যে কী বলা হয়েছে তার মূল অধ্যায়গুলো হলো :

www.pathagar.com

১. 'শিক্ষাদান একটি সৃজনশীল কর্ম এবং এই শিক্ষাদানের মানের উপরই নির্ভর করে আগামী দিনের শিক্ষিত জনসম্পদের গুণাগুণ। এজন্য সমাজের সর্বপেক্ষা প্রতিভাশালী এবং সৃজনশীল ব্যক্তিগণকে শিক্ষকতায় আকৃষ্ট করা প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যক্রমে দীর্ঘদিনের অবহেলার ফল শিক্ষকতা পেশা, বিশেষ করে বিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষকতা, এই আকর্ষণ ক্ষমতা নিদারুনভাবে হারিয়ে ফেলেছে। শিক্ষার সকল স্তরে উচ্চতম যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রয়োজন। জাতীয় জীবনে শিক্ষকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণের দাবিদার। আমাদের সমাজে তাদের সেই মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। শিক্ষকতাকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে উপযুক্ত মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে উন্নয়ন প্রচেষ্টা সফল হবে না।' *(কুদরত-ই খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাকবিশিস কর্তৃক ১৯৯৬ সালে পুনঃপ্রকাশিত, ২২.১৮.পৃ.১৮৫)*

২. 'প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে পাঠ্যসূচিতে যথার্থ পরিবর্তনের মাধ্যমে নারীর ইতিবাচক ও প্রগতিশীল ভাবমূর্তি ও সমান অধিকারের কথা তুলে ধরতে হবে এবং ইতিবাচক দিকগুলো পাঠ্যসূচীতে আনতে হবে। যাতে নারীর প্রতি সামাজিক আচরণের পরিবর্তন হয়।' *(কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাকবিশিস কর্তৃক ১৯৯৭ সালে পুনঃপ্রকাশিত, ২৪.২)*

৩. 'শিক্ষাক্ষেত্রে কি অভাব-অনটন ও অসুবিধার মধ্য দিয়ে আমাদের অধিকাংশ শিক্ষকের কাজ করতে হয় তা আমরা জানি।' *(প্রাগুক্ত, ২২.১৯)*

৪. 'অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিপুল পরিমাণ অর্থ বিভিন্ন ব্যাংকে রিজার্ভ হিসেবে গচ্ছিত হয়েছে। এই গচ্ছিত অর্থ একত্র করে প্রারম্ভিক মূলধন হিসেবে ব্যবহার করে শিক্ষা ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। প্রয়োজনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ ব্যাংক থেকে বিশেষ করে ভৌত কাঠামো তৈরির জন্য ঋণ গ্রহণ করতে পারে।' *(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৫)*

৫. '...স্বীয় যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষকের বেতন ও সামাজিক মর্যাদা লাভ করা উচিত, কিন্তু বর্তমান অবস্থা তদনুরূপ নয়। আমাদের শিক্ষকদের, বিশেষ

"জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটি ২০০০-এর সুপারিশে উল্লেখিত শিক্ষাখাতে সরকারি ব্যয় বরাদ্দ বাড়ানোর ব্যাপারটি তো সাধারণ একটি বক্তব্য। যেহেতু ইউনেস্কো কর্তৃক সুপারিশ করা আছে যে, দেশের জাতীয় আয়ের ৭% শিক্ষাখাতে বিনিয়োগ করতে হবে। কিন্তু এ পর্যন্ত তা কার্যকর হয়নি। আর এখানে ২.৩ ভাগ বরাদ্দের সুপারিশ করাতো খুবই সাধারণ একটি ব্যাপার। এদিক থেকে বিশ্বের অন্যান্য দেশের চেয়ে আমরা অনেক পিছিয়ে। গণশিক্ষার ব্যাপারটি তো অবশ্যই প্রয়োজন। দেশে যেখানে নিরক্ষরতার হার বেশি সেখানে গণশিক্ষার গুরুত্বটি অপরিহার্য।"

সৈয়দা শামসে আরা হোসেন
অধ্যক্ষ,
সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ, ঢাকা

www.pathagar.com

করে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষদের অবস্থার দিকে তাকালে এ-কথা অনুধাবন করা যায়। শিক্ষকরা এমন হারে বেতন পান না যাতে তাঁরা সন্তুষ্ট থাকতে পারেন। এবং তাঁদের কৃতিত্বের মর্যাদাও দেওয়া হয় না। সামান্য ও অনিয়মিত বেতনের ফলে অনেক ক্ষেত্রেই যোগ্য ব্যক্তি শিক্ষকতার দিকে আকৃষ্ট হন না। হলেও তাঁদের অনেকে কিছুদিনের দুঃখময় অভিজ্ঞতার পরে অন্য পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য হন। ...প্রায়শঃ শিক্ষকদের এমন পরিবেশে চাকুরি করতে হয় যা দুঃসাহসী ব্যক্তিদেরও ভগ্নোৎসাহ করে ফেলতে পারে এবং এই পেশা শিক্ষককে ফলপ্রসূ পারিতোষিকের আশ্বাস দেয় না। শিক্ষকদের বেতনের হার নগণ্য বলে জীবন ধারণের প্রয়োজন মেটাবার জন্য বাধ্য হয়ে তাঁদের অনেককে প্রাইভেট টিউশনী করতে হয়। এর ফলে একটা দুষ্টচক্র গড়ে ওঠে, এবং নিম্ন বেতন মানুষকে স্বল্প কাজ, এমনকি অসদুপায় এবং পরিণামে জনগণের অশ্রদ্ধা প্রভৃতির দিকে পরিচালিত করে।
এমতাবস্থায় প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা এই পেশার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বোধ করেন না।' *(কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাকবিশিস কর্তৃক ১৯৯৬ সালে পুনঃপ্রকাশিত, ২২.২১)*

৬. 'শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সরকারের অনেক কিছু করনীয় আছে।' *(প্রাগুক্ত, ২২.২৩)*

৭. 'বর্তমানে অধিকাংশ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন অত্যন্ত কম। শিক্ষার জাতীয় মান বজায় রাখতে হলে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন বাড়াতে হবে। তাঁদের চাকরির শর্ত মোটামুটিভাবে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ন্যায় একই রূপ হওয়া উচিত।'

৮. 'প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ঘটনার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও বিমূর্ত ধারণা প্রদান যথাসম্ভব সীমিত রাখতে হবে। প্রকৃতি, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলি সম্পর্কে শিশুরা যাতে জ্ঞান অর্জন করতে পারে, সেজন্য নানা চিত্র প্রদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও নানা সহজ পরীক্ষণের আয়োজন থাকবে।' *(কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত, পৃষ্ঠা-১০৬)*

৯. 'দেশে স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের বেতন যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের মধ্যে বেতন সংক্রান্ত যে বৈষম্য রয়েছে তা যথাসম্ভব দূর করে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা বিচারের মাধ্যমে বেসরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের বেতন সরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের বেতনের সমান পর্যায়ে আনা উচিত। এর দরুণ যে বাড়তি খরচ হবে তা সরকার অনুদান দিয়ে পূরণ করতে পারে।' *(প্রাগুক্ত, বাকবিশিস কর্তৃক প্রকাশিত, ২২.৩৩.১)*

www.pathagar.com

১০. 'নির্বিঘ্নে শিক্ষাদান কার্য সমাধা করতে হলে, অন্যান্য সুবিধাদির মধ্যে শিক্ষকদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছাকাছি বাসস্থানের ব্যবস্থা থাকাও একান্ত প্রয়োজন। শহরাঞ্চলে সরকারি বাসস্থান প্রধানের ব্যাপারে শিক্ষক ও শিক্ষায়তনের অন্যান্য কর্মচারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। যদি বাসস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব না হয়, তবে মূল বেতনের একটি ন্যায্য অংশ বাড়িভাড়া ভাতারূপে দেওয়া উচিত।' *(প্রাগুক্ত, ২২.৩২.৫)*

১১. 'অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষকদের জন্য বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা থাকা উচিত। এ ছাড়া শিক্ষক যে-কোনো স্তরেই শিক্ষাদান কার্যে নিয়োজিত থাকুন না কেন তাঁকে তাঁর যোগ্যতা অনুযায়ী বেতন দেওয়া প্রয়োজন।' *(প্রাগুক্ত, ২২.৩৩.৬)*

১২. 'শিক্ষকদের অগ্রবর্তী অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য ছুটি মঞ্জুর করতে হবে'। *(প্রাগুক্ত, ২২.১৬)*

১৩. '... শিক্ষাক্ষেত্রে সকলের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থাপনা যেমন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম সহায়ক ও পরিপূরক তেমনি রাষ্ট্র শিক্ষাকে হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করে সামাজিক বৈষম্য দূর করতে সক্ষম'। *(প্রাগুক্ত, ৩১.৪)*

১৪. 'যথাসম্ভব একই ধরনের শিক্ষাঙ্গনে কিংবা সমান সুবিধাপূর্ণ সকল শিক্ষার্থীর মান উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। সুতরাং সম স্তরের এবং একই ধরনের সকল শিক্ষায়তনের সর্বত্র ন্যায় ও সমতার ভিত্তিতে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সহায়তা, পৃষ্ঠপোষকতা, উৎসাহ লাভ করবে। ....সর্বোপরি শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টিকারক পরিবেশগত ও মনস্তাত্ত্বিক কারণসমূহ নিরসনের জন্য দৃঢ় ও সচেতন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।' *(প্রাগুক্ত, ৩১.৫)*

১৫. 'নানাবিধ কারণে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে বৈষম্য বিদ্যমান। ...পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, বৈষম্যের কারণগুলোর অধিকাংশই রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পদক্ষেপের ফলে দূরীভূত করা যেতে পারে।' *(প্রাগুক্ত, ৩১.৬)*

১৬. 'শিক্ষাক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধার সমতাবিধানের লক্ষ্য অর্জন করার জন্য আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় বিভিন্ন কার্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে।' *(প্রাগুক্ত, ৩১.৭)*

১৭. 'আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা আজ যে বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে শিক্ষাকে সমাজমুখী করার সমস্যা। দেশময় সাধারণ মানুষের যে সমাজ আর সে সমাজের অঙ্গীভূত যে শিক্ষার্থী তার প্রয়োজনকে অবশ্যই শিক্ষাক্ষেত্রে সবার ওপরে স্থান দিতে হবে। নতুন শিক্ষাব্যবস্থাকে হতে হবে সামাজিক রূপান্তরের হাতিয়ার। এ প্রসঙ্গে একটি প্রধান কর্তব্য হচ্ছে শিক্ষাক্ষেত্রে

www.pathagar.com

শ্রেণী বৈষম্যের অবসান। সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয়করণ হলেই সেটা সম্ভব। জাতীয়করণের অর্থ দাঁড়াবে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার দায়িত্ব সরকারি কর্তৃত্বের আওতায় রাখা; শহর, গ্রাম সব বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের মান যথাসম্ভব সমপর্যায়ে আনা; যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও কাজের পরিমাপের ভিত্তিতে সব বিদ্যালয়ের শিক্ষদের বেতনের হারে সমতা বিধান করা। এ কাজ ব্যয়বহুল তাতে সন্দেহ নেই। তথাপি পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শ্রেণীকক্ষ, আসবাবপত্র, শিক্ষা উপকরণ, যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক ইত্যাদির যোগান দেবার জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা মাফিক ক্রমান্বয়ে এগোতে হবে। *(প্রাগুক্ত, ৩১.১৬)*

১৮. 'বাংলাদেশে বেসরকারি নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে এবং বেসরকারি কলেজগুলোতে ছাত্র বেতন থেকে যা আয় হয় তার সঙ্গে সরকারি অর্থ সাহায্য যোগ করে মোটামুটি সব টাকা শিক্ষকদের বেতন দিতে ব্যয় হয়। জাতীয়করণ করলে সব শিক্ষকের বেতন সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমপর্যায়ে আনতে হবে। কাজেই সমস্ত স্কুল-কলেজ জাতীয়করণ করার ফলে শিক্ষকদের বেতন বাবদ সরকারের প্রতিবছরে পৌনঃপুনিক ব্যয় বহু পরিমাণে বেড়ে যাবে। এতদউদ্দেশ্যে দশ বছর মেয়াদি একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।' *(প্রাগুক্ত, ৩১.১৭)*

১৯. 'শিক্ষকদের বাড়তি বেতনই জাতীয়করণের একমাত্র খরচ নয়। জনসাধারণের মধ্যে অন্তত নিম্নমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করার চাহিদা রয়েছে। দাবি রয়েছে অন্তত: অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে সকলের জন্য অবারিত করার। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র বেতন মওকুফ করলে সরকারের প্রতিবছরে আরো বাড়তি ব্যয় হবে।' *(প্রাগুক্ত, ৩১.১৮)*

২০. 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বর্তমানে শিক্ষক, উপকরণ ও শিক্ষাদানের মানের যে বিশাল বৈষম্য বিদ্যমান তা দূর করতে হবে। বিশেষ করে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে শিক্ষক, শিক্ষাগৃহ, উপকরণ ও শিক্ষাদানের মানের বিশাল বৈষম্য বিদ্যামান। ...

তদুপরি যোগ্য ও উপযুক্ততার ভিত্তিতে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন বাড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে। তাই যতদিন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করা সম্ভব হচ্ছে না ততদিন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য ব্যাপক রাষ্ট্রীয় সাহায্যের ব্যবস্থা

"ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য একই ধরনের শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা উচিত।"

ডঃ ইনামুল হক

অধ্যাপক, ডীন, প্রকৌশল অনুষদ

বাংলাদেশ প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

www.pathagar.com

করতে হবে।' *(প্রাগুক্ত, ৩১.১৯)* এই প্যারারই সারাংশে বলা হয়েছে ঃ 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ ও রাষ্ট্রায়ত্তকরণের মাধ্যমে সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন ও সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষা উপকরণ এবং শিক্ষাদানের মানের যে বিশাল বৈষম্য বিদ্যমান তা দূর করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। যতদিন সম্পূর্ণ জাতীয়করণ ও রাষ্ট্রায়ত্তকরণ সম্ভব না হয় ততদিন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষামানের উন্নয়নের জন্য ব্যাপক রাষ্ট্রীয় সাহায্যের ব্যবস্থা রাখতে হবে। *(প্রাগুক্ত, ৩১.১৬.৩২.১৯)*।'

২১. 'দেশে সর্বস্তরে সমমানের শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য যথাযথ অগ্রাধিকার নির্ণয় করে পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হতে হবে যাতে ১৯৮৫ সালের মধ্যে সমগ্র দেশে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত সমমানের শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।' *(প্রাগুক্ত, ৩১.৩২)*

২২. 'শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অপেক্ষা একান্তভাবে প্রশাসনিক সুবিধা ও সুযোগের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব প্রদান এবং শিক্ষা সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়নের তুলনামূলকভাবে শিক্ষাবিদদের মতের অপ্রাধান্য বর্তমান শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থার অন্যতম দোষ। ...সচরাচর দেখা যায় যে, আমাদের শিক্ষানীতি নির্ধারণের বেলায় এবং শিক্ষাসংক্রান্ত চূড়ান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নে দেশের শিক্ষাবিদদের এবং বিশেষ করে বিভাগীয় শিক্ষা কর্মকর্তাদের মতের ওপর অতি অল্পই গুরুত্ব প্রদান করা হয়।' *(প্রাগুক্ত, ৩২.২খ. পৃ.২৭৪)*

২৩. '.....আমাদের শিক্ষাখাতে ব্যয় অবিলম্বে মোট জাতীয় আয়ের ৫% এ উন্নীত করা দরকার এবং এ ব্যয়ের পরিমাণ যত অল্প সময়ে সম্ভব ৭% করা জাতীয় লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা উচিত।' *(প্রাগুক্ত, ৩৫.১১.পৃ.২৯৪)*

২৪. 'মোট শিক্ষা ব্যয়ের প্রায় ৭৫% সরকারি তহবিল থেকে আসে। শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয়করণ করতে হলে বা দেশের প্রতিটি স্তরে সম্মান প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকার অথবা স্থানীয় সংস্থাসমূহের নিয়ন্ত্রণাধীন করতে হবে এবং শিক্ষা-ব্যয় সরকারি তহবিল থেকে দিতে হবে।....তবে আমাদের মতে শিক্ষাব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য কর রাজস্বকে জাতীয় আয়ের বর্তমানের ১০% থেকে বৃদ্ধি করে ১৮% করতে হবে এবং শিক্ষাখাতে সরকারি ব্যয় বরাদ্দের অনুপাত ৭% থেকে অন্তত ২৫% এ উন্নীত করতে হবে।' *(প্রাগুক্ত, ৩৫.২০.পৃ. ২৯৭)*

২৫. '...আমরা সুপারিশ করি যে, শিক্ষা ব্যয়ের একাংশ, বিশেষত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যয়ের বড় অংশ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে বহন করতে হবে। উপরে আমরা প্রস্তাব করেছি যে, কারিগরি শিক্ষায় অর্থ সাহায্যের জন্য শিল্প, কারখানার ওপর প্রত্যক্ষ কর ধার্য করা হোক।' *(প্রাগুক্ত, ৩৫.২২)*

"শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণ এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করতে হলে প্রচুর অর্থ দরকার। সরকারের পক্ষে এই বিপুল অর্থ ব্যয় করা সম্ভব না। তাই বেসরকারি

www.pathagar.com

শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ১৯৯৭-এর সুপারিশমালা

প্রফেসর শামসুল হক কমিটির সুপারিশমালার উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হচ্ছে :

১. 'প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ২০১০ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে আটবছর করা হবে। এজন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভৌত সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে হবে।' (*কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত, পৃষ্ঠা-১০.১*)

২. 'ডিপ্লোমা স্তরের সকল কারিগরি শিক্ষার মেয়াদ বর্তমানে প্রচলিত তিন বৎসর প্রাতিষ্ঠানিক এবং দুই মাস শিল্পকারখানায়/মাঠ পর্যায়ে সংযুক্তির স্থলে তিন বৎসর ছয় মাস প্রাতিষ্ঠানিক এবং ছয়মাস শিল্পকারখানায়/ মাঠ পর্যায়ে সংযুক্তি করতে হবে। কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং এ ধরনের অন্যান্য ইনস্টিটিউটের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।' (*প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১০*)

৩. 'চার বছরের স্নাতক ডিগ্রি প্রান্তিক ডিগ্রিরূপে গণ্য করা হবে, ফলে উচ্চতর স্তরে শিক্ষাদান বা গবেষণার কাজে নিযুক্ত হওয়া ভিন্ন অন্য সকল ক্ষেত্রে এই স্নাতক ডিগ্রি পর্যাপ্ত বলে গণ্য করা হবে।' (*প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৯*)

৪. 'বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চার বছরের সমন্বিত ডিগ্রিকোর্স ও এক বছরের মাস্টার্স কোর্স পড়ানো হবে। অন্যদিকে সাধারণ কলেজগুলোতে তিন বছরের সমন্বিত ডিগ্রিকোর্স পড়ানোর প্রস্তাব করা হচ্ছে। যে সকল কলেজে চার বছরের ডিগ্রি কোর্স এবং এক ও দুই বছরের মাস্টার্স পড়ানো হয়, সেই সকল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ বলা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলো জেলা সদরে অবস্থিত হবে। সাধারণ কলেজ পর্যায়ে তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স চালু থাকবে। মেধার ভিত্তিতে বাছাইয়ের পর তাদের জন্য দুই বছরের মাস্টার্স কোর্স পড়ার সুযোগ থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের পাঠ্যসূচি হবে এক ও অভিন্ন' (*প্রাগুক্ত*)।

উদ্যোগেই কেবল উন্নত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব। তবে বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে তোলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর সরকারের নজরদারি থাকা দরকার; যাতে সেখানে দেশের মূল আদর্শ এবং দেশীয় সংস্কৃতির পরিপন্থি কিছু শিখানো না হয়। তা ছাড়া শিক্ষার নামে যেন সেখানে শুধু ব্যবসায়ী দৃষ্টিভঙ্গি কাজ না করে, তাতে সরকার, উদ্যোক্তা এবং সংশ্লিষ্ট সকলেরই লক্ষ্য রাখা উচিত। লক্ষ্য করলে দেখা যায় পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বেসরকারি উদ্যোগেই পরিচালিত হচ্ছে। কেবলমাত্র দেশাত্মবোধ এবং নিষ্ঠা থাকলেই এই ধরনের ভাল প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব বলে মনি করি।"

বিশ্বজিৎ রায়
নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ শিক্ষক
২০০১ সাল, নেত্রকোনা জেলা

www.pathagar.com

৫. 'সরকারি/বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের মধ্যে বিরাজমান 'বৈষম্য দূরীকরণ এবং তাদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেতনের ১০০% সরকার থেকে প্রদান করা যেতে পারে এবং কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করে চিকিৎসা ব্যয়, অকালমৃত্যুতে পরিবারকে এককালীন সাহায্য করা, পেনশন/অবসরকালীন, এককলীন আর্থিক সুবিধা প্রদান ইত্যাদি ব্যবস্থা করা যেতে পারে।' (*কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন বাকবিশিস কর্তৃক প্রকাশিত, পৃ. ৩৪*)

৬. (ক) 'সমযোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিভিন্ন স্তরের ও ধারার শিক্ষকদের মধ্যে বিরাজিত বেতন-ভাতার বৈষম্য দূর করতে হবে এবং সরকারি প্রশাসনসহ অন্যান্য পেশায় একই বা সমমানের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রদত্ত বেতনের সঙ্গে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে' (*পৃ.১৫৫*)।

(খ) 'বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি যে বৈষম্য রয়েছে পর্যায়ক্রমে আগামী দশ বছরের মধ্যে তা সম্পূর্ণ বিলোপ করার পরিকল্পনা নিতে হবে এবং সমযোগ্যতা ও দক্ষতাসম্পন্ন বেসরকারি শিক্ষকদের সরকারি শিক্ষকদের অনুরূপ বেতন, ভাতা, পেনশনসহ সব ধরনের আর্থিক সুবিধা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে' (*ঐ*)।

জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটি ২০০০- এর সুপারিশমালা

প্রফেসর শামসুল হক কমিটির প্রতিবেদন মূল্যায়ন এবং বিভিন্ন মহল থেকে প্রাপ্ত মতামত বিবেচনা ও আলোচনা করে 'উপযুক্ত শিক্ষানীতি' খসড়া তৈরির জন্য ১৯৯৮ সালে একটি নতুন কমিটি গঠন করে ড. নজরুল ইসলামকে এই কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়। যা জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০ হিসেবে স্বীকৃত এবং এটি সংসদের অনুমোদন লাভ করে। ড. নজরুল ইসলাম কমিটি প্রণীত শিক্ষানীতির উল্লেখ্যযোগ্য সুপারিশগুলো হলো ঃ

১. 'প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করে ২০০৩ সালের মধ্যে ছয় বছর, ২০০৬ সালের মধ্যে সাত বছর ২০১০ সালের মধ্যে আট বছর করা হবে।' (*জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত পৃষ্ঠা-৩*)

২. 'তৃণমূল পর্যায়ে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।' (*পৃষ্ঠা-২২*)

৩. 'সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার স্থাপন বর্তমানে সাধ্যাতীত। তাই দেশের প্রত্যেকটি থানা সদরে গণগ্রন্থাগার স্থাপন করতে হবে। যার প্রধান দায়িত্ব হবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বই পরিবেশন করা। প্রত্যেক ইউনিয়নে এক বা একাধিক নির্বাচিত প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ভ্রাম্যমাণ বইয়ের কেন্দ্ররূপে ব্যবহার করতে হবে।' (*পৃষ্ঠা-৩২*)

www.pathagar.com

৪. 'মাধ্যমিক পর্যায়ের পাবলিক পরীক্ষায় কোনো ছাত্রছাত্রী এক বা দুই বিষয়ে অকৃতকার্য হলে তাকে সে বিষয়ে/ বিষয় দু'টিতে দু'বার পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি পরিবর্তিত হলে পুরাতন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী উক্ত প্রার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে; তবে কোনো অন্তবর্তীকালীন পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা যাবে না। *(পৃষ্ঠা-৩৪)*

৫. 'সরকারি/বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্রমান্বয়ে সরকারের আর্থিক পরিস্থিতির এবং শিক্ষকদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণগত যোগ্যতার আলোকে বেতনের ১০০% সরকার থেকে প্রদান করা যেতে পারে এবং প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করে চিকিৎসা ব্যয়, অকাল মৃত্যুতে পরিবারকে এককালীন সাহায্য করা, পেনশন, অবসরকালীন এককালীন আর্থিক সুবিধা প্রদান ইত্যাদি ব্যবস্থা করা যেতে পারে।' *(পৃষ্ঠা-৪১)*

৬. 'শিক্ষাখাতে সরকারি ব্যয় বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে বাড়ানো হবে এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষার জন্য ১৯৯০-৯৫ সময়ে সমগ্র সরকারি শিক্ষা ব্যয়ের গড়ে ৫৮.৪ শতাংশ থেকে ১৯৯৭-২০০২ সময়ে গড়ে ৬৫.৩ শতাংশে অর্থাৎ, দুই-তৃতীয়াংশে উন্নীত করার প্রস্তাব সরকারের রয়েছে। ২০০২ সালের পর প্রাথমিক ও গণশিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যয়ের অনুপাত আরো বাড়ানোর প্রচেষ্টা চালানো হবে তবে ন্যূনপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশে *(৬৬.৭ শতাংশে)* তা স্থিত থাকবে ২০১০ সাল পর্যন্ত। অর্থাৎ, শিক্ষাখাতে সমগ্র সরকারি ব্যয় জাতীয় উৎপাদনের ৪ শতাংশ হলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষার জন্য যে ব্যয় করা হবে তার জাতীয় উৎপাদনের ২.৬৭ শতাংশ।

সরকারি বরাদ্দ ছাড়াও শিক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারি/পারিবারিক উৎস থেকে খরচ করা হয়। শিক্ষাখাতে বেসরকারি উদ্যোগ উৎসাহিত করা হবে। ছাত্রছাত্রীদেরকে (অর্থাৎ, তাদের পরিবারসমূহকে), বিশেষ করে কলেজ ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে, তাদের পড়াশোনার খরচ সংকুলান নিজেদের দায়িত্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করতে হবে।' *(পৃষ্ঠা ৪২)*

তাহলে এটা স্পষ্ট যে, বহুল আলোচিত কুদরত-ই-খুদা কমিশন এবং বলা যায় তারই সংস্করণ ও সংশোধিত রূপ প্রফেসর শামসুল হক কমিটির প্রণীত শিক্ষানীতির সুপারিশসমূহের অধিকাংশই ড. নজরুল ইসলামের শিক্ষানীতি ২০০০-এ প্রতিফলিত হয়নি। অথচ সংসদের অনুমোদন পেয়েছে এটিই।

যে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে, পূর্বে যা বলা হয়েছে—জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা, মূল্যবোধ ইত্যাদি প্রয়োজনগুলো পূরণ; তা কি নতুন শিক্ষানীতিতে প্রতীয়মান হয়েছে? অবশ্য নতুন শিক্ষানীতির 'ভূমিকা'য় বলা

www.pathagar.com

আছে—'দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে কোনো নীতিই চিরকালীন, স্থির, অবিচল ব্যাপার হয় না, হওয়া উচিত নয়। সময় ও অবস্থা বিবেচনায় অন্যান্য নীতির মতো শিক্ষানীতিতেও প্রয়োজনীয় রদবদলের সুযোগ থাকবে।'

সে সুযোগ গ্রহণ করে নজরুল ইসলাম কমিটি শিক্ষানীতি ২০০০ প্রণয়ন করেছেন শামসুল হক কমিটির শিক্ষানীতিকে অনেকটা উপেক্ষা করে। শিক্ষানীতি ২০০০-এ শিক্ষাকে বেসরকারিকরণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতার নিরীখে বলা যায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বৈষম্য বিরাজমান। এই বৈষম্য দূরীকরণের কোনো কথা উল্লেখ নেই। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় অনাকাঙ্ক্ষিত সব পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটছে। অর্থাৎ, যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে শিক্ষার বেসরকারিকরণকে উৎসাহিত করা হয়েছে তা তিরোহিত।

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যাবতীয় অসঙ্গতি, বৈষম্য, দূরীকরণার্থে 'বেসরকারিকরণ' উদ্যোগ মন্দ নয়। পরিবর্তনশীল বিশ্বের কারণেই তো ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনকে সামনে রেখে একটি সময়োপযোগী শিক্ষানীতি তৈরির জন্য শামসুল হক কমিটিকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল এবং সরকারই তা দিয়েছে। তাহলে কি শামসুল হক কমিটির শিক্ষানীতি সময়কে গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন? কেননা, যে তোড়জোড়, কষ্ট করে বিশেষজ্ঞদের ডেকে একটা কমিটি করেছিল, যেখানে অপ্রয়োজনীয় কেউ ছিল না। যাদের থেকে জাতি একটা পূর্ণাঙ্গ শিক্ষানীতি আশা করেছিল, এবং শামসুল হক কমিটি তা দিতে সক্ষম হয়েছে—যেহেতু সেখানে সব শ্রেণী-পেশার মতামত প্রতিফলিত হয়েছে। যতটা ড. নজরুল ইসলাম কমিটির শিক্ষানীতি ২০০০-এ প্রতিয়মান হয়নি।

যাহোক, একটা উন্নত আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন গুরুত্ববহ। যে গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরে, দেরিতে হলেও, জাতিকে একটা শিক্ষানীতি দিয়েছেন সরকার। তাই বলতে হয়, সরকার একটা শিক্ষানীতি প্রণয়ন করছেন এটাইবা জাতির কাছে কম কিসে।

তবে একটা অনুমোদিত শিক্ষানীতি সম্পর্কে অধিকাংশ শিক্ষিত সচেতন (?) গোষ্ঠী জ্ঞাত নন, এমনকি শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্টরাও না। এটা অবশ্যই দুঃখজনক এবং সংশ্লিষ্টদের জন্য দোষনীয়। কেননা, এই অজ্ঞতা একদিকে যেমন সংশ্লিষ্টদের, অন্যদিকে সরকারের উচিত হবে শিক্ষানীতির মর্মার্থ সকলকে জ্ঞাত করা। নতুন শিক্ষানীতি সম্পর্কে মতামত জানতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হতে হয়েছে নিবন্ধকারকে। অনেকেই শিক্ষানীতি সম্পর্কে আদৌ জানেন না।

এই যদি অবস্থা হয়, শিক্ষক মহলই যদি অসচেতন হন, তাহলে জাতীয় নীতির প্রতিফলন ঘটবে কিভাবে? এ ব্যাপারে সরকারের উদ্যোগের পাশাপাশি শিক্ষা সচেতন গোষ্ঠী, বিশেষত শিক্ষক মহলের সজাগ হওয়া জরুরি।

www.pathagar.com

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৩ : একটি পর্যালোচনা

'শিক্ষা জাতীর মেরুদণ্ড'—কথাটা শুনতে ভালো লাগলেও, মনের ভেতর থেকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে কে যেন বলে, স্বাধীনতার পর আমাদের এই মেরুদণ্ডটাকে কতটা শক্ত ভিত্তির উপর স্থাপন করা গেছে? উত্তর একদম সহজ, মোটেই শক্ত নয়; হতাশাজনক। তবে শিক্ষার মানোন্নয়ন ও শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ইতোপূর্বে ১৯৭৪, ১৯৭৯, ১৯৮৩, ১৯৮৮, ২০০০ ও ২০০২ সালে শিক্ষা কমিশন গঠন পূর্বক রিপোর্ট পেশ করা হয়। কিন্তু কোনো কমিশনের রিপোর্টই সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। সর্বশেষ ২০০৩ সালে অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞার নেতৃত্বে নতুন কমিশন গঠন করা হয়। শিক্ষার নানা খুঁটিনাটি দিক বিচার-বিবেচনা করে এই কমিশন ৩১ মার্চ ২০০৪ সালে প্রধানমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট পেশ করে। এই রিপোর্টি শিক্ষার মনোন্নয়নে কতটা সঠিক পথে এগোবে আলোচ্য নিবন্ধে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মতামত পূর্বক বিশ্লেষণ ও আলোচনা করে তাই তুলে ধরা হয়েছে। এই বিষয়ে সাংবাদিক শরিফুল ইসলামকে দিয়ে একটি বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন তৈরি করা হয়ছিল পাঞ্জেরী শিক্ষার সংবাদ-এর জন্য। শরীফুলের লেখাটি সামনে রেখে আলোচ্য নিবন্ধ তৈরি করা হয়েছে ব্যাপক সংযোজন ও বিয়োজনের মধ্যে দিয়ে।

ইতিহাসের আলোকে শিক্ষা কমিশন :

অতি প্রাচীনকাল থেকে এই উপমহাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল। তবে এই ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত সীমিত পরিসরে এবং ভঙ্গুর নড়বড়ে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইংরেজরাই সর্বপ্রথম শিক্ষার একটা কাঠামোগত রূপ দান করে। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে তারা প্রথম কাজ শুরু করে ১৭৯২ সালে। সেই সময় চার্লস গ্রান্ট কমিশনের মাধ্যমে এ অঞ্চলে শিক্ষাসংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন করে ব্রিটিশ সরকার। এরপর ১৮১৩ সালে কোম্পানি সনদ, ১৮৩৫ সালে লর্ড ম্যাকলে কমিটি, ১৮৩৮ সালে উইলিয়াম অ্যাডামস কমিটি, ১৮৮২ সালে ইন্টার কমিশন, ১৯৩৪ সালে সা-প্রু কমিটি এবং ১৯৪৪ সালে সার্জেন্ট কমিটি এ অঞ্চলের শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কাজ করে বিভিন্ন সময় রিপোর্ট পেশ করে শিক্ষানীতি দাঁড় করিয়েছিল।

ব্রিটিশদের পর আসে পাকিস্তানিরা। ২৩ বছরের ইতিহাসে তারাও শিক্ষব্যবস্থা নিয়ে কিছু একটা রূপরেখা দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছে। পাকিস্তানিদের এই প্রচেষ্টা শুরু হয় ১৯৪৯ সালে পূর্ববঙ্গ শিক্ষা পুনর্গঠন কমিটি, ১৯৫২ সালে মাওলানা আকরাম খাঁ কমিটি, ১৯৫৭ সালে আতাউর রহমান কমিটি,

www.pathagar.com

১৯৫৯ সালে শরীফ কমিশন, ১৯৬৫ সালে হামিদুর রহমান কমিশন এবং ১৯৬৯ সালে নূর খাঁ কমিশন গঠনের মাধ্যমে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে রিপোর্ট করায় ছাত্রদের আন্দোলনে কোনোটাই বাস্তব রূপ লাভ করেনি।

১৯৭১ সালের দেশ স্বাধীন হবার পর শিক্ষাব্যবস্থার একটা সুনির্দিষ্ট রূপরেখা তৈরির জন্য ১৯৭২ সাল থেকে কাজ চলতে থাকে। ১৯৭২ সালে কুদরত-এ-খুদা কমিশনের মাধ্যমে এই কার্যক্রম শুরু হয়। এর ১৯৭৭, ১৯৮৩, ১৯৮৮, ১৯৯৭ ২০০১ এবং সর্বশেষ ২০০৩ সাল পর্যন্ত শিক্ষার উপর ৭টি কমিশন গঠন করে শিক্ষানীতি তৈরি করা হয়।

রিপোর্ট বিশ্লেষণ :

একটি দেশ ভবিষ্যতে কিভাবে পরিচালিত হবে তা নির্ধারণে বড় ভূমিকা পালন করে শিক্ষানীতি। দেশ স্বাধীন হবার পর প্রতিটি সরকার তার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। কিন্তু সময়ের বিচারে তা শেষ পর্যন্ত পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছুই হয়নি। সর্বশেষ প্রচেষ্টা হিসাবে অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞার নেতৃত্বে একটা কমিশন গঠন করা হয়েছে নতুন শিক্ষানীতি উপহার দেওয়ার জন্য। সার্বিক বিবেচনায় এই রিপোর্ট কতটা কার্যকরী হবে তা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরা হয়েছে এই নিবন্ধে।

প্রাথমিক শিক্ষা :

শিক্ষাব্যবস্থার মূলভিত্তি হলো প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষাকে যদি সঠিকভাবে রূপায়ণ করা যায় তবে সার্বিকভাবে শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব। এজন্য প্রতিটি কমিশনের রিপোর্টে সর্বাধিক গুরুত্ব পায় প্রাথমিক শিক্ষা। মিঞা কমিশনও এর ব্যতিক্রম নয়। মিঞা কমিশনে যেসব উল্লেখযোগ্য সুপারিশ করা হয়েছে তা হল—

প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ : পূর্বের প্রতিটি কমিশনে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ৮ বছরব্যাপী চাওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত কিন্তু মিঞা কমিশন বর্তমান কাঠামো অপরিবর্তিত রাখার কথা বলা হয়েছে, কারণ এতে সীমিত সামর্থ ও সুযোগের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা : দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের শিক্ষাজীবন সম্পন্ন করতে হয়। এতে শিশুবেলা থেকেই শিক্ষার্থীরা যাতে পড়াশোনায় আগ্রহী হয়ে উঠে সে জন্য এবারই প্রথমবারের মতো ৩-৫ বছর পর্যন্ত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সুপারিশ করেছে কমিশন। এ পর্যায়ে শিশুকে খেলাধুলা, হাসি-আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করানো হবে।

www.pathagar.com

শিক্ষার বয়স : প্রাথমিক শিক্ষা যারা গ্রহণ করবে এতদিন তাদের ভর্তির ব্যাপারে বয়সের কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। কিন্তু কমিশন এখন থেকে ৫ বছর বয়সী প্রতিটি শিশুকে বাধ্যতামূলকভাবে স্কুলে পাঠানোর সুপারিশ করেছে।

স্কুলের সংখ্যা : বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে, প্রাথমিক স্কুল আছে ৭৮১২৬টি। যেখানে শিক্ষার্থী সংখ্যা রয়েছে ৩,৪৯,৮০,৮৭৭ জন। উল্লেখ্য সংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য স্কুলের সংখ্যা নিতান্ত কম। এজন্য ম্যাপিংয়ের ভিত্তিতে সরকারকে আগামী ১০ বছরের ভিতর আরো ১০০টি স্কুল প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়েছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনা : দেশে প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে ১১ ধরনের। এর ভিতর ৬ ধরনের প্রতিষ্ঠানের উপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। এসব প্রতিষ্ঠানের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ আনার কথা বলা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন : প্রতিটি প্রতিষ্ঠান তার নিজস্ব উপায়ে শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করলেও প্রাথমিক শিক্ষার একটা সমন্বয় সাধন করার জন্য কমিশন সুপারিশ করেছে। এতে করে কিছু পার্থক্য থাকলেও ইংরেজি মাধ্যম, সাধারণ মাধ্যম, মাদ্রাসা মাধ্যম ও অন্যান্য মাধ্যমের শিক্ষার্থীরা একই ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা পাবে।

পাঠদান : কমিশন ছাত্র-শিক্ষক সংযোগকাল ২২০ দিন ধরে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য ন্যূনতম ৭২০ ঘন্টা ও তৃতীয় থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ১২৭৫ ঘন্টা পাঠদান করার কথা বলেছে। এ-সময় তাদের বাংলা, ইংরেজি, গণিত, নিজের চারপাশের পরিবেশ, বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান দিতে হবে।

প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সুযোগ-সুবিধা : প্রতিটি বিদ্যালয়ে ন্যূনতম ৬ জন শিক্ষক ও ৬টি শ্রেণীকক্ষ থাকতে হবে। তাদের জন্য পাঠ্যপুস্তক ও শিখন সামগ্রীর যথাযথ যোগান নিশ্চিত করতে হবে।

ফলাফল ও মূল্যায়ন পদ্ধতি : প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ফলাফল ও মূল্যায়ন পদ্ধতিতে নতুন ধারা প্রবর্তন করতে হবে যাতে শিক্ষা সম্পর্কে সবাই আগ্রহী হয় এবং ঝরে পড়ার হার কমে। ৬০% নম্বর পেলে তার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ : বর্তমানে আমাদের দেশে ৩,৪৯,৮০,৮৭৭ জন শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক মাত্র ৬,৩০,৮৭৩ জন। শিক্ষক কম থাকায় একজন শিক্ষককে মোটামুটি ৬০ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করতে হয়, যা অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় দ্বিগুণ। পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করে এই হার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ১ ঃ ৩০ ও মাধ্যমিক পর্যায়ের জন্য ১ ঃ ৪০ নামিয়ে আনতে হবে। এ ছাড়া এদের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

www.pathagar.com

কয়েকটি দেশের শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত

দেশ	অনুপাত	সাল
সিঙ্গাপুর	১ঃ২৫	১৯৯৫
মালয়েশিয়া	১ঃ১৯	১৯৯৬
কোরিয়া	১ঃ৩১	১৯৯৭
যুক্তরাজ্য	১ঃ২৪	১৯৯৭
বাংলাদেশ	১ঃ৬০	২০০৩

পর্যালোচনা : প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে মিঞা কমিশনের সুপারিশ খুব বেশি সুদূর প্রসারী না হলেও মান উন্নয়নে গ্রহণযোগ্য হিসাবে বিবেচিত হয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা : আমাদের দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার তিনটি ভাগ রয়েছে। যথা- (১) নিম্নমাধ্যমিক (২) মাধ্যমিক (৩) উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়। নিচে এ পর্যায়ের জন্য গৃহীত সুপারিশগুলো তুলে ধরা হলো—

সরকারি স্কুল স্থাপন : সরকারকে স্কুল ম্যাপিং এর মাধ্যমে ২০১৫ সাল পর্যন্ত মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রতিবছরে কমপক্ষে ২৫টি স্কুল প্রতিষ্ঠা করার সুপারিশ করেছে কমিশন।

মডেল স্কুল : কম খরচে ভালো লেখাপড়া ও উন্নত সুযোগ-সুবিধার জন্য প্রতিটি উপজেলায় আগামী ১০ বছরের ভিতর একটা করে মডেল স্কুল স্থাপনের সুপারিশ করেছে এই কমিশন।

বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ : শহর অঞ্চলে পাশের হার কোনো রকমে ঠিক থাকলেও মফস্বল অঞ্চলে পাবলিক পরীক্ষায় দেখা দেয় রেজাল্ট বিপর্যয়। এর মূল কারণ ইংরেজি, অংক, বিজ্ঞানের জন্য ভালো ও পর্যাপ্ত শিক্ষক না পাওয়া। এই কমিশনে পর্যাপ্ত ভালো বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে।

কোচিং, নোট, প্রাইভেট নিষিদ্ধ : শ্রেণীকক্ষে লেখাপড়ার সুষ্ঠু মান বজায় রাখার জন্য কোচিং সেন্টার, নোট, গাইড প্রকাশনা ও শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনি বন্ধ করার সুপারিশ করা হয়েছে। তবে কোনো শিক্ষার্থী শ্রেণীকক্ষে বেশি দুর্বল হলে তার মান উন্নয়নে উক্ত বিষয়ের শিক্ষক ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের অনুমতি নিয়ে সর্বোচ্চ ৬ ঘণ্টা ছাত্রদের পড়াতে পারবেন।

শিক্ষার মাধ্যম : আমাদের বাঙালি চেতনাকে ধরে রাখার জন্য শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষা ব্যবহার করার সুপারিশ করা হয়েছে তবে উচ্চশিক্ষার পর্যায়ে প্রয়োজনে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করা যাবে।

স্কুলভিত্তিক নম্বর প্রদান : স্কুলের শিক্ষকই একজন শিক্ষার্থীকে ছোটবেলা থেকে লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করে। তাই একজন ছাত্র কেমন তা একজন শিক্ষকই ভালো মূল্যায়ন করতে পারবেন। এজন্য বর্তমান কমিশনে ২৫% নম্বর স্কুলভিত্তিক করার সুপারিশ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

মূল্যায়ন পদ্ধতি : এখন থেকে স্কুল পর্যায়ে কোনো শিক্ষার্থীকে অকৃতকার্য না করার সুপারিশ করা হয়েছে। তবে কোনো শিক্ষার্থী যদি নির্দিষ্ট মানের চেয়ে কম জ্ঞান অর্জন করে তবে নির্দিষ্ট শিক্ষকের আওতায় এনে তার মান উন্নয়নের ব্যবস্থা নিতে হবে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজনীতি : দলাদলির সুযোগ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলোর লেজুড়বৃত্তির মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করা হয়। এটা বন্ধের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

একমুখী শিক্ষা : এতোদিন অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করে নবম শ্রেণী থেকে বিভাজনের মাধ্যমে মানবিক, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান শাখার সৃষ্টি হতো। এতে অনেক শিক্ষার্থীর কোনো বিষয় সম্পর্কে পুরোপুরি শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হতো না। এটা বন্ধের জন্য কমিশন একমুখী অর্থাৎ, বিজ্ঞান, মানবিক, বাণিজ্য সব এক করে এসএসসি পর্যন্ত একই রকম শিক্ষা গ্রহণের সুপারিশ করেছে।

পাঠ্য বিষয় : একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হলে পাঠ্যক্রমে আনতে হবে ব্যাপক রদবদল। কমিশন এজন্য ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত এক রকম পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করেছে। আর নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য আরেকরকম পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করেছে। এতে বর্তমান সময়কে গুরুত্ব দিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক পাঠ্যক্রম তৈরি করে তা বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ করেছে কমিশন। তবে কলেজের পড়াশোনা ব্যাপক ও বিস্তৃত বলে পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করা হয়নি।

পর্যালোচনা : মিঞা কমিশন মাধ্যমিক পর্যায়ের জন্য যেসব সুপারিশ করেছে তার অধিকাংশই সমালোচনার মুখে পড়েছে। এমনকি অনেক শিক্ষাবিদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। মিঞা কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে গত কমিশনের সদস্য ড. অজয় রায় বলেন, 'এই কমিশন প্রাইভেট টিউশনি বন্ধের কথা বলেছে, অথচ এমন সুপারিশ করেছে যাতে পুরো স্কুলটাই টিউশনি সেন্টারে পরিণত হবে। আর তাতে কেনাবেচা হবে শিক্ষকের হাতে থাকা ২৫% নম্বর। এতে হিতে বিপরীত হতে বাধ্য।'

একমুখী শিক্ষা পদ্ধতিও সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। এ সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক এ, কে, আজাদ চৌধুরী বলেন, 'এখন একমুখী শিক্ষার নামে যা করা হয়েছে তাতে উচ্চ মাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিষয়ে যারা পড়াশোনা করতে চায় তাদের হঠাৎ চাপের মুখে পড়তে হবে। কারণ, বিজ্ঞানের সিলেবাস এত ব্যাপক যে ধীরে ধীরে প্রস্তুত না হয়ে এলে হঠাৎ করে সবকিছু শেখা সম্ভব হবে না। এতে বিজ্ঞান চর্চার দরজা ক্রমান্বয়ে রুদ্ধ হবে ।'

বিস্তৃত পাঠ্যক্রম সম্পর্কে অধ্যক্ষ এম. এ আউয়াল সিদ্দিকী বলেন, 'প্রস্তাবনা অনুযায়ী মোট ১১০০ নম্বরের আবশ্যিক বিষয় এবং ১০০ নম্বরের একটা ঐচ্ছিক বিষয় থাকবে। এতে শিক্ষাক্রমটা এক ভারবাহী শিক্ষাক্রমে পরিণত হবে যার

www.pathagar.com

পরিণতিতে দেখা দেবে এসএসসি পর্যায়ে আরো ব্যাপক ফলাফল বিপর্যয়। এ ছাড়া উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরি না করে কম্পিউটারের মতো একটা প্রযুক্তি নির্ভর বিষয় চালু করলে ফলাফল বিপর্যয়কে তা আরো ত্বরান্বিত করবে।'

উচ্চশিক্ষা : জ্ঞানের ভাণ্ডারে উচু শিখরে আরোহণ করার সোপান হলো উচ্চশিক্ষা পর্যায়। এই পর্যায়ের শিক্ষাকে আরো কার্যকরী করার জন্য কমিশনে কিছু সুপারিশ করা হয়। সুপারিশগুলো নিম্নরূপ;

কোর্সের মেয়াদ : উচ্চশিক্ষার প্রতিটি পর্যায়ের জন্য নির্দিষ্ট মেয়াদের ব্যবস্থা করা। এই মেয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০ কার্য সপ্তাহের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে।

ভাষা শিক্ষা দান : বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ৬ মাস শিক্ষার্থীদের জন্য বিস্তৃত জ্ঞান ভান্ডারের ভেতরে ভালোভাবে প্রবেশ করার জন্য বাংলা ও ইংরেজি উভয় বিষয়ে শিক্ষা দান করতে হবে।

কোর্স পর্যালোচনা : সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে নিত্যনতুন বিষয়ের সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এজন্য প্রচলিত কোর্সগুলোর মান উন্নয়নের জন্য প্রতি তিন বছর সভা করে কোর্সগুলোর মান উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

শিক্ষার্থী কর্তৃক মূল্যায়ন : বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় তারা শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের ভালোভাবে পাঠদান করে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস বাদ দিয়ে অনেকে বাইরের কাজে ব্যস্ত থাকে। এটা বন্ধ করার জন্য শিক্ষার্থীদের হাতেই শিক্ষকের মূল্যায়নের ভার ছেড়ে দেওয়া উচিৎ। এক্ষেত্রে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক সফল হলে তার উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীরা মূল্যায়ন করবে আর শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের উপর নির্ভর করবে তার প্রমোশন।

যত্রতত্র অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স না খোলা : কমিশন মনে করছে সুনির্দিষ্ট মান অর্জন না করে যত্রতত্র অনার্স বা মাস্টার্স ডিগ্রি খোলায় দিনের পর দিন শিক্ষার মান নেমে যাচ্ছে। এজন্য এটা বন্ধের সুপারিশ করে কমিশন।

বিজ্ঞান শিক্ষকদের জন্য জাতীয় সার্ভিস ক্যাডার সৃষ্টি : দেশে বিজ্ঞান, গণিতের জন্য পর্যাপ্ত ভালো মানের শিক্ষকের ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে বলে কমিশন মনে করে। এজন্য উপযুক্ত বেতনভাতাসহ নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধার ভিত্তিতে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন বিজ্ঞান শিক্ষকদের জন্য একটা জাতীয় সার্ভিস ক্যাডার সৃষ্টি করা।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে উৎসাহিত করা : উচ্চশিক্ষার খরচ অনেক। তাই সরকারের একার পক্ষে অধিকসংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার খরচ বহন করা সম্ভব নয়। এজন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে উৎসাহিত করা।

একক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে নিরুৎসাহিত করা : কৃষি, চিকিৎসা, প্রকৌশলের মতো একক বিষয়ভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় অধিক খরচ সাপেক্ষ। এজন্য

www.pathagar.com

একক বিষয়ভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় না খুলে বহু বিষয়ভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত বলে মনে করে কমিশন।

উপাচার্য নির্বাচন : এই কমিশনের অত্যন্ত বহুল আলোচিত সুপারিশ হচ্ছে উপাচার্য নিয়োগ সুপারিশ। আগে সিনেট সদস্যরা তিনজনের একটা উপাচার্য প্যানেল নির্বাচিত করত। চ্যান্সেলর তার ভিতর থেকে উপযুক্ত জনকে উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ দিতেন। কিন্তু পরপর কয়েক বার রাজনৈতিক প্রভাবে ভিন্নভাবে উপাচার্য নিয়োগ পাওয়ায় কমিশন ৭ জনের একটা সার্চ কমিটির কথা সুপারিশ করেছে, যারা উপাচার্য নিয়োগ করার জন্য সুপারিশ প্রদান করবে।

পর্যালোচনা : মিঞা কমিশন তাদের রিপোর্ট নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে উচ্চশিক্ষা পর্যায়ের কিছু সুপারিশ নিয়ে। এই পর্যায়ে শিক্ষা সম্পর্কিত যেসব সুপারিশ করা হয়েছে তার অধিকাংশই সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে বলে কমিশন মনে করছে। যেমন— ছাত্র কর্তৃক শিক্ষক মূল্যায়ন; যত্রতত্র অনার্স, মাস্টার্স কোর্স না খোলা; কোর্সের মান উন্নয়ন সম্পর্কিত সুপারিশ; একক বিশ্ববিদ্যালয় না খোলা সম্পর্কিত সুপারিশ; বিজ্ঞান শিক্ষকদের জন্য জাতীয় সার্ভিস ক্যাডার সৃষ্টি; অনার্স-মাস্টার্সের নতুন মেয়াদ; গবেষণা রিপোর্ট সম্পর্কিত সুপারিশ। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল যে বিষয়, উপাচার্য, সে সম্পর্কে কমিশন যে সুপারিশ করেছে তা কারো কাছেই গ্রহণযোগ্য নয় বলে বিবেচিত। এর ফলে উপাচার্য নিয়োগে কোনো নিরপেক্ষতা থাকবে না বরং সার্চ কমিটির সুপারিশে রাজনৈতিক দলগুলোর পছন্দমতো ব্যক্তি নির্বাচিত হবে। এ সম্পর্কে প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, 'সার্চ কমিটির মাধ্যমে উপাচার্য নিয়োগের বিষয়টি খুব বেশি সুচিন্তিত বলে মনে হচ্ছে না। নতুন কিছু করা প্রয়োজন তাই করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।'

বিষয়টির আরো কঠোর সমালোচনা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি আ.স.ম আরেফিন সিদ্দিকী বলেন, 'বর্তমানে যে পদ্ধতিতে উপাচার্য নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে সেটাই বেশি গণতান্ত্রিক ও যৌক্তিক। নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়ার পর ব্যক্তি বিশেষে কোনো কোনো উপাচার্যের কার্যকলাপ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু পদ্ধতি নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঠেনি। কিন্তু সার্চ কমিটির মাধ্যমে যারা আছে তার ৮০ ভাগ দলীয় লোক অর্থাৎ, তাদের দ্বারা নির্বাচিত কোনো ব্যক্তি এলে প্রশ্ন উঠবে। এ ছাড়া সার্চ কমিটির মাধ্যমে কাউকে উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হলেতো হবে সিনেট সদস্যদের জন্য অসম্মানজনক।'

কৃষি শিক্ষা : বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। তাই দেশের সত্যিকার উন্নতির জন্য প্রথমে প্রয়োজন কৃষির উন্নতি। সার্বিকভাবে কৃষির উন্নয়ন ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। এজন্য কমিশনে কৃষির উন্নয়নে বেশ কিছু সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

www.pathagar.com

বিষয় বিন্যাস : কৃষি শিক্ষাকে আরো অধিক কার্যকরী করে তোলার জন্য ৫০% নম্বর তত্ত্বীয় ও ৫০% নম্বর ব্যবহারিক করার সুপারিশ করা হয়েছে। এটা মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক উভয় পর্যায়ের জন্য প্রযোজ্য হবে।

হাতে-কলমে শিক্ষা : ছাত্র-ছাত্রীদের হাতেকলমে শিক্ষাদান, গবেষণা, প্রশিক্ষণ দান করার জন্য প্রতিষ্ঠানসংলগ্ন খামার/মাঠ থাকতে হবে।

কারিকুলাম মূল্যায়ন : সময়ের সাথে সঙ্গতি রেখে কোর্স কারিকুলামগুলো নিয়মিত সংস্কার করে উন্নত করতে হবে।

শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত : যাতে ভালোভাবে সকলকে হাতেকলমে শেখানো যায় এজন্য শিক্ষক অনুপাতে বর্তমানের চেয়ে ছাত্রসংখ্যা কম হওয়া বাঞ্ছনীয়। এজন্য স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষক ছাত্র অনুপাত ১ ঃ ১০ ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ১ঃ ৫ হওয়া উচিত।

নিত্যনতুন বিষয় সংযোজন : কৃষি শিক্ষাকে উন্নত করার জন্য Biotechnology and Genetics Engineering, Molecular Techniques, Tissue culture, Plant protection, Agro-Processing, Agri-business, Agro Foresty এর চাহিদাসম্পন্ন বিষয় সংযোজন ঘটাতে হবে।

কর্মসংস্থান : শিক্ষা শেষে স্বকর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে কেউ পাশ করে বের হওয়ার পর প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজের কর্মসংস্থান করতে পারে।

নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন : বাংলাদেশে ভূমির পরিমাণ খুব কম। এজন্য কৃষি বিষয়ক নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরি না করে স্থাপিত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যপরিধির সম্প্রসারণ ঘটানো।

মূল্যায়ন : বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সকল শিক্ষার্থীর জন্য একই ধরনের মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত।

প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও কারিগরি শিক্ষা :

বর্তমান সময়টা বিজ্ঞানের। বিজ্ঞানকে ছাড়া এক পা সামনে আগানো সম্ভব নয়। এজন্য কমিশন প্রযুক্তি ও প্রকৌশল সম্পর্কে যেসব সুপারিশ করেছে তা হল—

সম্পর্ক স্থাপন : শিল্পকারখানার সাথে প্রকৌশল, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত : বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত ১ঃ১৫ করা প্রয়োজন।

মনিটরিং এর ব্যবস্থা : শিক্ষাকে সার্বিকভাবে শিক্ষার্থীর কাছে ভালোভাবে উপস্থাপন করার মাধ্যমে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

মহিলাদের কর্মসংস্থান : মহিলাদের কর্মসংস্থান করার জন্য প্রশিক্ষণের সুযোগ দ্রুত ও কার্যকরী ভিত্তিতে সম্প্রসারণ করতে হবে।

মূল্যায়ন : দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মান নির্ণয় করার জন্য সমস্ত প্রতিষ্ঠানে একই রকম মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করার সুপারিশ করা হয়েছে।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা : মেধাবী ও গরিব শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি, অনুদান ও সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়েছে।

শ্রমবাজারে দক্ষতা নিশ্চিতকরণ : বৃত্তিমূলক পেশায় অধিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মীকে 'মাস্টার ক্রাফটসম্যান' ও টেকনিসিয়ানকে 'মাস্টার টেকনিসিয়ান' জাতীয় স্বীকৃতি দিয়ে শ্রমবাজারে কর্মীদের গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

একনজরে শিক্ষা কমিশন -২০০৩

কমিশন গঠন : ১৬ জানুয়ারি ২০০৩
রিপোর্ট প্রকাশ : ৩১ মার্চ ২০০৪
সভাপতি : অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা
সদস্য সংখ্যা : ২৪ জন
নীতিমালা : ৩০টি
সুপারিশমালা : ৬৯৬টি

(ক) প্রাথমিক শিক্ষা : ২০০টি
(খ) মাধ্যমিক শিক্ষা : ১৩৫টি
(গ) উচ্চশিক্ষা : ১৪০টি
(ঘ) প্রকৌশল শিক্ষা : ২০টি
(ঙ) চিকিৎসা শিক্ষা : ২২টি
(চ) কৃষি শিক্ষা : ৫৬টি
(ছ) মাদ্রাসা শিক্ষা : ৩৪টি
(জ) অন্যান্য শিক্ষা : ৮৯টি

চিকিৎসা শিক্ষা : কৃষি ও প্রকৌশলের মতো চিকিৎসা একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পেশাগত শিক্ষা। দিনের পর দিন অব্যাহতভাবে এর মান কমে যাচ্ছে। এজন্য মিঞা কমিশন কিছু সুপারিশ করেছে। যেমন—

অবকাঠামোগত উন্নয়ন : প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে ক্লাসরুম, গবেষণাগার, সম্মেলন কক্ষ, ব্যবহারিক প্রদর্শন কক্ষ, দক্ষতা বাড়ানোর কক্ষ, অস্ত্রোপাচার কক্ষ ইত্যাদির সার্বিক উন্নয়ন ছাড়া চিকিৎসা শিক্ষার উন্নয়ন সম্ভব নয়। এজন্য মিঞা কমিশন

www.pathagar.com

এগুলোর উন্নয়নের জন্য সুপারিশ করেছে।

পাঠ্যক্রম উন্নয়ন : আমাদের দেশে এখনও পড়াশোনার জন্য সেকেলে পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা হয় যার দ্বারা শিক্ষার সত্যিকারের উন্নয়ন হচ্ছে না। এজন্য মিঞা কমিশন এ বিষয়ে সুপারিশ করেছে।

হাতেকলমে শিক্ষা : পুঁথিগত তত্ত্বীয় শিক্ষা আর হাতেকলমে শিক্ষা এক নয়। পুঁথিগত শিক্ষায় বিষয়টা জানা গেলেও পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় না। এজন্য হাতেকলমে শিক্ষার কথা বলা হয়েছে, যার মাধ্যমে চিকিৎসা শিক্ষার উন্নয়ন সম্ভব হবে।

মেডিক্যাল এডুকেশন বিভাগ স্থাপন : প্রতিটি পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মেডিক্যাল এডুকেয়ার বিভাগ স্থাপন করতে হবে।

মূল্যায়ন পদ্ধতি : চিকিৎসা শিক্ষার মূল্যায়ন পদ্ধতি একটা পুরনো ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। সময়ের পরিবর্তনে এই ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন হয়। তাই শিক্ষা প্রক্রিয়ার সার্বিক উন্নয়নের জন্য মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে সংস্কার সাধন করতে হবে।

মাদ্রাসা শিক্ষা : বর্তমান কমিশনের রিপোর্টের যে অংশ নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয়েছে তা হলো মাদ্রাসা শিক্ষা। এই মাধ্যমের জন্য কমিশন যেমন কিছু কার্যকরী সিদ্ধান্ত নিয়েছে তেমনি কিছু হঠকারী সিদ্ধান্তও নিয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য গৃহীত সুপারিশগুলো হলো—

সমান সুযোগ-সুবিধা : সাধারণ শিক্ষাধারার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষার্থী, শিক্ষকবৃন্দ যেসব সরকারি সুযোগ-সুবিধা পান, মাদ্রাসা শিক্ষাধারার ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষার্থী-শিক্ষকবৃন্দের জন্য সেসব সুযোগ-সুবিধা সমানভাবে প্রদান করার সুপারিশ করা হয়েছে।

মাদ্রাসা জাতীয়করণ : পর্যায়ক্রমে সাধারণ শিক্ষাধারায় আনুপাতিক সংখ্যক ইবতেদায়ী মাদ্রাসাকে জাতীয়করণ করতে হবে।

মাদ্রাসা : মাদ্রাসার স্বকীয়তা রক্ষার জন্য দেশের মাদ্রাসাগুলোর পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের আওতা বহির্ভূত করে একটি স্বতন্ত্র মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

জাতীয় মাদ্রাসা শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড গঠন : মাদ্রাসা শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের বিদ্যমান কারিকুলাম ও টেক্সটবুক উইং শক্তিশালী ও সম্প্রসারণ করা আবশ্যক। এজন্য পরবর্তীকালে স্বতন্ত্রভাবে জাতীয় মাদ্রাসা শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড নামে একটি স্বতন্ত্র স্বায়ত্তশাসিত বোর্ড স্থাপন করতে হবে।

সহশিক্ষা : দাখিল ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে কামিল পর্যন্ত সকল স্তরে সহশিক্ষা প্রথা

www.pathagar.com

বন্ধ করা এবং নারী শিক্ষার জন্য সকল স্তরে পৃথক মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ও বৃদ্ধি করা।

এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন : ফাযিলকে ব্যাচেলর ও কামিলকে মাস্টার্স ডিগ্রির সমমর্যাদা প্রদান করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো মাদ্রাসা শিক্ষার এই পর্যায়ের জন্য একটি এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে বলে সুপারিশ করে কমিশন।

পর্যালোচনা : মাদ্রাসা শিক্ষা বর্তমান ধারার শিক্ষা হতে অনেক দূরে আছে। এজন্য এই মাধ্যমের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কমিশন যেসব সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার মধ্যে যথেষ্ট সুদূর প্রসারী ও উন্নত কিছু সিদ্ধান্তও রয়েছে। যেমন- সাধারণ শিক্ষার মতো সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা, মাদ্রাসা শিক্ষাকে জাতীয়করণ করা, ফাযিল ও কামিলকে ব্যাচেলর ও মাস্টার্স ডিগ্রির সমমর্যাদা প্রদান করা ইত্যাদি। কিন্তু কিছু-কিছু ক্ষেত্রে বাড়তি কিছু সুপারিশ করে কমিশন বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। যেমন- ফাযিল ও কামিলকে ব্যাচেলর ও মাস্টার্স ডিগ্রির সমমর্যাদা দিয়ে স্বতন্ত্র একটা এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন প্রয়োজন নেই। এ ছাড়া সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার দিয়ে যেহেতু কাজ হচ্ছে তারপরও যথেষ্ট উন্নত মানসম্পন্ন না হয়েও তাদের জন্য বিসিএস-এ স্বতন্ত্র একটা ক্যাডার সৃষ্টি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। এ সম্পর্কে বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের আহ্বায়ক খালেকুজ্জামান বলেন— 'এটা জনগণের ধর্মীয় আবেগকে সুড়সুড়ি দিয়ে ভোট আদায়ের জন্য শাসক শ্রেণীর একটা অপচেষ্টা মাত্র।'

অন্যান্য শিক্ষা : উপরোক্ত সাধারণ শিক্ষাগুলোর পাশাপাশি বর্তমানে আরো কয়েক ধরনের শিক্ষা আছে। যেমন—নারীদের জন্য শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা, শিক্ষায় দূরবীক্ষণ পদ্ধতি, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান শিক্ষাব্যবস্থা; সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি এই শিক্ষাগুলোও বর্তমানে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার সাথে ভালভাবে জড়িয়ে গেছে। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির গুরুত্ব অনেক বেশি। তাই দেশের তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষার সম্প্রসারণ করার জন্য কমিশন ৯টি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ প্রদান করেছে। এ ছাড়া বর্তমান সমাজের অর্ধেক হয়েও নারীরা উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারছে না নানা বৈষম্যের কারণে। এজন্য কমিশন এখানেও ৩২টি সময় উপযোগী সুপারিশ প্রদান করেছে, যাতে নারী শিক্ষার মান উন্নত হয়।

শিক্ষক নিয়োগ : বর্তমান কমিশনে শিক্ষক নিয়োগকে কোনো আলাদা বিষয় হিসাবে রাখা হয়নি বরং প্রতিটি পর্যায়ের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু আমরা আলোচনার সুবিধার জন্য সমস্ত ধরনের শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে আলাদাভাবে আলোচনা করেছি, যাতে খুব সহজেই সবাই বিষয়টা বুঝতে পারেন।

মাধ্যমিক স্কুল পর্যায় : মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষক নিয়োগ করার জন্য সরকারি

www.pathagar.com

কর্ম কমিশনের মতো একটি নিরপেক্ষ কমিশন গঠনের সুপারিশ করেছে বর্তমান শিক্ষা কমিশন। এই নিরপেক্ষ কমিশন বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের দীর্ঘ প্যানেল তৈরি করবে যার ভিতর থেকে জেলা শিক্ষা অফিসার জেলা ওয়ারি সরকারি স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ দিতে পারবেন। আর বেসরকারি বিদ্যালয়ের জন্য জেলা শিক্ষা অফিসারের পরামর্শক্রমে বেসরকারি বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদ শিক্ষক নিয়োগ দেবে।

কমিশনের এই সুপারিশ সম্পর্কে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন মহাসচিব অধ্যাপক কাজী ফারুক আহমদ বলেন— 'বিষয়টা পরস্পরবিরোধী। কারণ, এখানে শিক্ষক নির্বাচন কমিশন যেমন গঠন করা হচ্ছে তেমনি জেলা শিক্ষা অফিসারকে শিক্ষক নিয়োগের একচ্ছত্র ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া সর্বময় ক্ষমতা জেলা শিক্ষা অফিসার পেলে তিনি তার পছন্দ-অপছন্দ বিবেচনায় নিয়োগ দেবেন যা মেনে নেওয়া যায় না।'

শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টা এখানেই শেষ নয় বরং যতদিন এই কমিশন গঠন না হচ্ছে ততদিন ৮ সদস্যের একটি অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি দায়িত্ব পালন করবে। এই ৮ জনের কমিটির সভাপতি হবেন একটি কলেজের অধ্যক্ষ যিনি আঞ্চলিক পরিচালক কর্তৃক মনোনীত হবেন। সদস্য সচিব হবেন জেলা শিক্ষা অফিসার। বাকি ৬ জনের ৪ জন নির্বাচন করবেন জেলা প্রশাসক যার ভিতর ২ জন হবেন শিক্ষাবিদ ও ২ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আর বাকি ২ জন নির্বাচন করবেন জেলা শিক্ষা অফিসার, যারা জেলার দুটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এই কমিটি সম্পর্কে অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমদ বলেন— এই অন্তর্বর্তীকালীন কমিটিও রাজনৈতিক লোকদের পুনর্বাসনের জন্য গঠিত। এখানে ৮ জনের ৭ জন রাজনৈতিকভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন। তাই তাদের মাধ্যমে যারা নির্বাচিত হবেন তারাও রাজনৈতিক লোক হিসেবে নির্বাচিত হবেন।'

এ বিষয়ে কমিশন সভাপতি অধ্যাপক মনিরুজ্জামান এর বক্তব্য হচ্ছে 'যাদেরকে কমিটিতে রাখার কথা বলা হয়েছে তারা প্রশাসনিকভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। তাই নির্বাচনটা সঠিক হবে। এ ছাড়া সবকিছুতে রাজনীতির গন্ধ খুঁজলে কোনো কাজ করা সম্ভব নয়।'

প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায় : প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের জন্য স্বাধীন ও নিরপেক্ষ শিক্ষক নিয়োগ কমিশন গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। কমিশন প্রার্থী নির্বাচন করে উপজেলাভিত্তিক তালিকা প্রণয়ন করবে এবং চাহিদা মোতাবেক শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করবে। তবে যতদিন এই কমিটি গঠিত না হচ্ছে ততদিন পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটা অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি গঠন করতে হবে যারা শিক্ষক নির্বাচন করে নিয়োগ দান করবে। এই পাঁচ সদস্যের সভাপতি হবেন সরকারি কলেজের একজন অধ্যক্ষ যিনি নির্বাচিত হবেন প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের মহাপরিচালক

www.pathagar.com

কর্তৃক। আর সদস্য সচিব হবেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার। বাকি তিনটি আসনের ২টিতে জেলা প্রশাসকের একজন প্রতিনিধিও নির্বাচিত ব্যক্তি সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হবেন। বাকি সদস্য হিসেবে পিটিআই-এর সুপার প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত হয়ে কাজ করবেন।

নানা পরীক্ষা-নীরিক্ষা আর গবেষণার মধ্য দিয়েই এগিয়ে চলছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা। স্বাধীনতার ৩৩ বছর পেরিয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট, মানসম্পন্ন, আধুনিক ও সার্বজনীন কোন শিক্ষানীতি প্রণীত ও বাস্তবায়িত হয়নি। শিক্ষার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন একটি পক্ষপাতমুক্ত ও সার্বজনীন শিক্ষানীতি।

www.pathagar.com

তবুও নকল

২০০১ সালের পাবলিক পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধে বোর্ড কর্তৃপক্ষ প্রথমবারের মতো এবং নজিরবিহীন প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে নকলের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি এবং গণচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা করেছেন। নকলের কুফল সম্পর্কে বারবার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। টেলিভিশনে নকলের কুফল জানিয়ে বিভিন্ন প্রচারণা চালিয়েছেন। শুধু তাই নয় বর্তমান সরকারের আমলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'পাবলিক পরীক্ষায় দুর্নীতি: প্রতিকার ও প্রতিরোধ' শীর্ষক প্রথম কর্মশালা হয় ১৪ নভেম্বর ১৯৯৮ কুমিল্লার বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন একাডেমিতে। এ কর্মশালায় শিক্ষামন্ত্রী, আইনমন্ত্রীসহ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণ বক্তব্য রাখেন। পাবলিক পরীক্ষায় দুর্নীতিরোধে বক্তারা কর্মপরিকল্পনা করেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন সময় শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা সভা, সেমিনার, কর্মশালা, সিম্পোজিয়াম করেছেন। লক্ষ্য একটাই পাবলিক পরীক্ষায় দুর্নীতি তথা নকল রোধ করা। সকলেই অবাধ গণনকলের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে বলেছেন, ঐভাবে গণটোকাটুকির পরীক্ষা গ্রহণের সত্যিকারভাবেই কোন অর্থ হয় না। এটা ছাত্রছাত্রীদের পরবর্তী জীবনের জন্য মারাত্মক শিক্ষা ঘাতটির কারণ হয়, যার কুফল তাদের সারাজীবন বহন করতে হবে।

এ বছর পরীক্ষার চিত্র এসব সভা-সেমিনার, নানা কর্মপরিকল্পনাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে সদম্ভে নকলবাজরা ঠিকই তাদের কাজ করেছেন; যদিও দু'এক জায়গায় দু'একজন দুর্নীতি করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে বহিষ্কার হয়েছে, জেলে ঢুকেছে, জরিমানা দিয়েছে। তবে সামগ্রিক দুর্নীতির চিত্র অপেক্ষা শাস্তির পরিমাণ যৎসামান্যই, যথার্থ নয় একেবারেই। দু'একটি ব্যতিক্রম সিদ্ধান্ত ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে নকলবাজরা, নকলে সহায়তাকারী শিক্ষক-অভিভাবক ও বহিরাগতরা অনায়াসে পার পেয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি, জোর-জুলুমই বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে। কোথাও কোথাও রাজনৈতিক প্রভাব, জোর-জুলুমের কাছে শিক্ষক, প্রশাসনকে অসহায় অবস্থায় দেখা গেছে। প্রশাসনের এই অসহায়ত্ব ভাবিয়ে তুলেছে সচেতন জনগোষ্ঠীকে। 'তাহলে কি আমরা জ্ঞান বিবর্জিত সনদ-সর্বস্ব একটি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তৈরি করছি?' যে অসহায়ত্ব সমাজকে কলুষিত করছে অবিরত, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পা ভেঙে দিচ্ছে; সে অসহায়ত্ব কোনো আবেদন সৃষ্টি করতে পারে না, কোনো গ্রহণযোগ্যতাও নেই। কেননা, বোর্ড কর্তৃপক্ষের নকল বিরোধী অভিযানসূচি, প্রচার-প্রচারণায় দেশবাসী আশার আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছিল, ভেবেছিল হয়তো এবার পাবলিক পরীক্ষায় দুর্নীতি হবে না, নকলবাজরা পার পাবে না, একটা সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হচ্ছে বাংলাদেশ; সত্যিকারের সোনার বাংলা গড়ার শপথ নেওয়া

www.pathagar.com

বোধহয় শুরু হলো। কিন্তু সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে; যার ফলে, বোর্ড কর্তৃপক্ষও অবশেষে 'বাহ্বা' কুড়াতে ব্যর্থ হলেন।

নকলের প্রতিকার

যে যাই বলুক এই ব্যর্থতার দায়ভার প্রশাসনকেই নিতে হবে। প্রশাসন ইচ্ছে করলেই নকল রোধ করতে পারেন। পাশাপাশি প্রশাসনের প্রতি যে সাপোর্ট শিক্ষক-অভিভাবক এবং সকল স্তরের জনগণের পক্ষ থেকে দরকার তা প্রশাসনকে দিতে হবে। অর্থাৎ, সরকার- এবং জনগণের সমন্বয় থাকলে, বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উদ্যোগ থাকলে, একশভাগ নকল প্রতিরোধ করা অবশ্যই সম্ভব। আইডিয়াল কলেজ-এর অধ্যাপক এম এ বারীর মতে "নকল প্রতিরোধে হল পরিদর্শকরাই বাস্তবসম্মত মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারেন। শিক্ষকরাই সাধারণত হল পরিদর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

শিক্ষকদের বিশ্বাসের সঙ্গে দায়িত্ব দিয়ে এটা সম্ভব, শাস্তির ভয় দেখিয়ে নয়। যে শিক্ষকরা নকলে সাহায্য করেন তাদের শিক্ষক বলা যাবে না, তারা শিক্ষকতা পেশার কলঙ্ক। তাদের জন্য চরম শাস্তির বিধান হওয়া উচিত।" এ ছাড়া নকল প্রতিরোধে আরো যে বিষয়গুলো বিভিন্ন ব্যক্তি ও মহল থেকে উঠে এসেছে তা ভেবে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। যেমন-

১. সকল পরীক্ষা কেন্দ্রে ১৪৪ ধারা নিশ্ছিদ্রভাবে পালন করা দরকার ২.পরিচিতিপত্র সংবলিত পরিদর্শক ছাড়া অন্য কোনো লোকের, সে যত বড় প্রভাবশালী ব্যক্তিই হোক না কেন, পরীক্ষার হলে প্রবেশ নিষেধ সম্পূর্ণভাবে কার্যকর করা ৩. কেন্দ্রকে রাজনৈতিক চাপমুক্ত রাখার ব্যবস্থা ৪. ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে নকলবাজদের তাৎক্ষণিক বিচারের ব্যবস্থা ও শাস্তি প্রদান ৫. শিক্ষকদের নিরাপত্তা বিধান ৬. নকলে সহায়তাকারী অভিযুক্ত শিক্ষকদের বহিষ্কারের পাশাপাশি জেল-জরিমানা ব্যবস্থা করা। ৭. পরীক্ষা কেন্দ্রের প্রবেশপথে সার্চ করা ৮. নকলবাজ এবং নকলে সহায়তাকারীকে সামাজিকভাবে বয়কট করা ৯. যে সব কেন্দ্রে এ বছর অবাধে নকল হয়েছে, সে সব কেন্দ্র আগামী বছর বাতিল ঘোষণা ১০. নকলবাজদের সামাজিকভাবে ঘৃণা করা ১১. নকলবাজরা দেশ ও জাতির শত্রু, এ জাতীয় প্রচারণা জোরদার করা।

"শ্রেণীকক্ষে যদি ঠিকমত পড়াশোনা হয় এবং শিক্ষকরাও যদি শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় প্রস্তুতি গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন তাহলে শিক্ষার্থীকে পরীক্ষায় নকল করার প্রশ্নই আসে না। অন্য পক্ষে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে যদি নকল প্রতিরোধে গণসচেতনতা সৃষ্টি হয় এবং সামগ্রিক পরিস্থিতিও যদি নকল প্রতিরোধে সহায়ক হয় তাহলে শিক্ষকরাও যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। এখানে আরেকটা প্রস্তাব রাখা প্রয়োজন বলে মনে করি, আর সেটি হলো একই সাথে বর্তমান ধারার পরীক্ষা পদ্ধতিরও পরিবর্তন হওয়া দরকার।"

মোঃ বদিউজ্জামান
অধ্যক্ষ, খিলগাঁও মডেল কলেজ

www.pathagar.com

তৎসঙ্গে শিক্ষাবিদদের থেকে সুপারিশ চাওয়া এবং পাবলিক পরীক্ষায় দুর্নীতি রোধে একটি বৃহৎ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা জরুরি। দলীয় প্রভাবমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা গ্রহণের যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। কেননা, রাজনীতির উর্ধ্বে রাখতে হবে শিক্ষাব্যবস্থা। যেহেতু দল থেকে দেশ বড়,.তাই দেশের স্বার্থে, অভিযুক্ত রাজনৈতিক প্রভাবশালী নকলবাজদের বিরুদ্ধে দল এবং প্রশাসন থেকে এখনই ব্যবস্থা নেওয়া; এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে কঠোর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে হবে।

এস এস সি পরীক্ষা ২০০১ ঃ দুর্নীতির কতিপয় খণ্ডচিত্র

পত্রিকান্তরে প্রকাশ, রাঙ্গুনিয়ার পাইলট হাইস্কুলে পরীক্ষার প্রথম দিন একদল সাংবাদিক পরিদর্শনে গেলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তসলিম সাংবাদিকদের কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেননি। তাকে এ কাজে সহায়তা করে রাজনৈতিক দলের ছাত্র নামধারী ক্যাডাররা। কারণ, ঐ সময় বাইরে থেকে জানালা দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের নকলের উৎসব চলছিল। পরে অবশ্য বিভিন্ন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাবোর্ডের ভিজিলেন্স টিম রাঙ্গুনিয়ার কেন্দ্র থেকে নকলের দায়ে ৬৯ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার এবং নকলে সহযোগিতার দায়ে ৭ শিক্ষককে সাসপেণ্ড করে।

মনোহরদীর বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীরা অবাধে নকল চলেছে। এসব কেন্দ্রে শিক্ষকরাও নকলে সহায়তা দিয়েছে। ডিপি, জি এস, ছাত্রনেতা, রাজনৈতিক দলের কর্মী পরিচয়ে অনেকেরই কেন্দ্রে অবাধ আনাগোনা ছিল। মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলার রসুলপুর বাতেনিয়া মাদ্রাসা কেন্দ্রে ২০ মার্চ অনুষ্ঠিত দাখিল পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট নকলে সহায়তা করার দায়ে একজন শিক্ষককে বহিষ্কার করেছেন।

ময়মনসিংহের নান্দাইল কেন্দ্রে পরীক্ষার প্রথম দিনে বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীর ছুরিকাঘাতে কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট (এসিল্যান্ড) মোশাররফ হোসেন আহত হয়েছেন। কুড়িগ্রামের বিভিন্ন কেন্দ্রে এ বছর ব্যাপক হারে নকল হয়েছে। খোদ কক্ষ পরিদর্শক, পুলিশ এবং রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের প্রত্যক্ষ মদদে দেদার নকল চলেছে। জেলার উলিপুর এস এস উচ্চ বিদ্যালয় ও ফুলবাড়ি জসি মিঞা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে নজিরবিহীন নকল চলাকালীন সময় ম্যাজিস্ট্রেট পরীক্ষার্থীদের বহিষ্কারে মরিয়া হয়ে উঠলে বাইরে অপেক্ষমান অভিভাবক ও রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা ক্ষুব্ধ হয়ে বিশৃঙ্খলার চেষ্টা চালায়। পরে পুলিশ

"একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা পদ্ধতি চালু করতে হবে। তাহলে নকলের কোনো সুযোগ থাকবে না।"

মোঃ আবদুল আউয়াল
প্রধান শিক্ষক
খিলগাঁও গভঃ স্টাফ কোয়ার্টার হাইস্কুল, ঢাকা

www.pathagar.com

পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনে।

এ রকম পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে অনেক কেন্দ্রে। এ বছর অধিকাংশ কেন্দ্র ছিল স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের দখলে। অনেক কেন্দ্রে প্রশাসনের ভিজিলেন্স টিমের সাথে রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে। এবছর নকলের উল্লেখযোগ্য দিক হলো সারা দেশ থেকে বস্তায় বস্তায় নকল উদ্ধার।

শিক্ষকরা জাতির বিবেক

শিক্ষকরা জাতির বিবেক। শিক্ষকরা আমাদের সন্তানদের শিক্ষিত করে তুলেন। তারা সর্বজন শ্রদ্ধেয়। অথচ এ বছর পাবলিক পরীক্ষায় আমরা শিক্ষকদের গায়ে কলঙ্কের কালি লেপন করতে দেখেছি যা জাতির জন্য দুঃখজনক।

গত ১৫ মার্চ পরীক্ষা শুরু হওয়ার পর যখন পত্রপত্রিকায় পড়েছি নকলে সহায়তার অভিযোগ শিক্ষক বহিষ্কৃত তখন খারাপ লেগেছে। খারাপ লাগারই কথা, সর্বজন শ্রদ্ধেয় একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীকে নকলে সহায়তার অভিযোগে বহিষ্কৃত হতে হচ্ছে এও কি সম্ভব!

যা হোক শিক্ষকরাও মানুষ। আর ভুল মানুষই করে। ভুল থেকেই মানুষ শিখে। আমরা আশা করব যেসব শিক্ষক এ বছর পাবলিক পরীক্ষায় ভুল করেছেন। এই ভুল থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করবেন। কেননা, যারা সর্বজন শ্রদ্ধেয়, তাঁদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে মন সায় দেয় না। কলম থেমে যায়। তাই এই প্রতিবেদনের মধ্য দিয়ে শিক্ষক মহোদয়দের কাছে অনুরোধ, দোহাই আপনারা জাতির বিবেক ধ্বংস করবেন না।

শেষ কথা

এস. এস. সি পরীক্ষার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে একটি বিষয় এ বছর স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে যে, কেন্দ্রগুলোতে রাজনৈতিক প্রভাব বেশি ছিল। কোথাও কোথাও রাজনৈতিক খবরদারির কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে খোদ প্রশাসন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারি দলের নেতা-কর্মীদের দাপটই পরিলক্ষিত হয়েছে বেশি, যা দুঃখজনক। যেসব এলাকায় এবং কেন্দ্রে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের ফলে নকল হয়েছে, তদন্ত করে সেসব রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। কেননা, নেতা-কর্মীরা বিনা বাধায় পার পেয়ে গেলে পরবর্তী পাবলিক পরীক্ষায় এই প্রভাব আরো ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে নকল প্রতিরোধের অন্তরায়গুলো এখনই চিহ্নিত করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে পরীক্ষায় নকল রোধে সুফলগুলো আদায় করে নিতে পারবেন বোর্ড কর্তৃপক্ষ। আমরা আশা করব কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিক্ষার মাধ্যম

www.pathagar.com

www.pathagar.com

শিক্ষার মাধ্যম

শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন এবং মননের ক্ষমতাকে জাগিয়ে তোলা। শিক্ষাকে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে হলে প্রয়োজন উত্তম শিক্ষা। আর উত্তম শিক্ষা লাভ করতে হলে প্রথমেই ভাষা নির্বাচন করতে হবে। কেননা, শিক্ষার্থী কোন ভাষায় শিক্ষা লাভ করবে সেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করবে তার উপর শিক্ষার্থীর থাকতে হবে অগাধ দখল। অর্থাৎ, শিক্ষার্থীর কোনো ভাষার ভিত যদি মজবুত না থাকে তবে সে ভাষায় শিক্ষালাভ করতে যাওয়া ঠিক হবে না। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই বলা যেতে পারে যে শিক্ষার মাধ্যমে হওয়া উচিত শিক্ষার্থীর মাতৃভাষা। কারণ মাতৃভাষার উপর যে-কোনো ব্যক্তিরই দখল থাকে অন্য যে-কোনো ভাষার চেয়ে বেশি। অতএব, আমরা বলতে পারি আমাদের শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা। আর শিক্ষার মাধ্যমে হিসেবে মাতৃভাষা বাংলার দাবি অনেক আগে থেকে। গভর্ণর স্যার জনশোর তাঁর 'Notes on Indian affairs' a বলেছেন—

১. মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত একটি জাতিকে অন্তুতপক্ষে মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের সুযোগ করে দিতে হবে।

২. মাতৃভাষার মাধ্যমেই পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য-দর্শন শিক্ষার সুব্যবস্থা করে দিতে হবে।

ডিরোজিওর শিষ্য ইয়ংবেঙ্গলরাও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার দাবি তুলেছিলো। তাদের 'সর্বতত্ত্বদীপিকা' নামক সংগঠনের ঘোষনাপত্রে ছিলো—

১. মাতৃভাষার বাংলায় শিক্ষা ও সাহিত্যচর্চা করা।

২. সংগঠনের সমস্ত কাজ-কর্ম মাতৃভাষা বাংলায় পরিচালনা করা।

প্রাচ্য-প্রেমিক পণ্ডিত উইলসন সাহেব মাতৃভাষা বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যমে হিসেবে গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন— 'জাতীয় শিক্ষা ও সাহিত্য কেবল মাতৃভাষার মাধ্যমেই গড়ে উঠতে পারে। জ্ঞান-বিদ্যার চর্চা যদি কেবল বিদেশী ভাষার গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তবে তা সমাজের মুষ্টিমেয় লোক, যাদের অর্থ ও অবসর দুই আছে তাদের বিলাসের বিষয় হয়ে উঠে ইংরেজি; যা কখনো এদেশের মানুষের শিক্ষার বাহন হতে পারে না। ইংরেজির মাধ্যমে শ্রেণীগত শিক্ষার ভিত গড়ে উঠতে পারে আর মাতৃভাষার মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষার বিকাশ ঘটে।'

আমাদের দেশে ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা সাম্প্রতিককালে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তবে অবশ্যই সেটা ধনিক শ্রেণীর মধ্যে। ইংরেজি বিদেশী ভাষা, স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে কোনো বিদেশী ভাষায় শিক্ষা লাভ করা কতটা ফলপ্রসূ। এটা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে উচ্চশিক্ষা অর্জনে ইংরেজির বিকল্প

www.pathagar.com

নেই। কথায় বলে, ইংরেজি জানা লোকের ভাতের অভাব হয় না। তবে প্রশ্ন হচ্ছে একেবারে প্রাথমিক পর্যায় থেকেই ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করাটা কতখানি যুক্তিযুক্ত। এর সুফল বা কুফল কতটুকু?

অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা শিশুর মনোবিকাশে বাধাগ্রস্ত করে। শিশুর সাবলিল মানসিক বৃদ্ধি ব্যহত হয়। কারণ, ইংরেজি মাধ্যমে পড়ুয়া একটা শিশু বেশিরভাগ সময়ই অতিবাহিত করে বাংলা পরিবেশে; যদিও ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলগুলোর পরিবেশ ইংরেজি কায়দায় করার একটা অসফল প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। আর ইংরেজি মাধ্যমে শিশু শ্রেণীতেই পাঠ্যবইয়ের সংখ্যা প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে শিশুদের শিক্ষা গ্রহণ ক্ষমতাকে যথাযথ বিচার বিশ্লেষণ করা হয় না। সুতরাং শিশুটি যে তার বিশাল বইয়ের বোঝার চাপে ক্লেশবোধ করবে এটাই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে আরো মারাত্মক ফল দেখা দিতে পারে শিশুটি শিক্ষার প্রতি স্থায়ীভাবে ভীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়তে পারে। এ কারণেই ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষাদান প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষার্থী সংখ্যা বাড়লেও সাফল্যের হার বাড়ছে না। সুতরাং এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত বাংলা।

একইভাবে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়েও শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত বাংলা। তবে এ-সকল স্তরেই ইংরেজি ভাষা শেখার ব্যবস্থা থাকতে হবে। ইংরেজি মাধ্যমে না পড়ার অর্থ এই নয় যে ইংরেজি শেখা যাবে না। এটা সত্য যে, যে ভাষা যত বেশি উন্নত ও গুরুত্বপূর্ণ সে ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা তত বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক বিশ্বে ইংরেজি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষা, সুতরাং এ ভাষায় জ্ঞানার্জনের গুরুত্বও বেশি।

বাংলা ইংরেজির মতো উন্নত ও শক্তিশালী ভাষা নয়। ইংরেজি আন্তর্জাতিক ভাষা। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যোগাযোগের জন্য ইংরেজি অপরিহার্য যার ফলে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষার অপরিহার্যতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে কোন স্তরে এর প্রয়োগ ঘটাতে হবে সে বিবেচনাটাই আসল।

অবশ্যই স্বীকার করছি, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজি অপরিহার্য। কারণ, উচ্চশিক্ষার জন্য পাঠ্যপুস্তক সবই ইংরেজিতে রচিত। এক্ষেত্রে শিক্ষার যে-কোনো বিভাগেই অর্থাৎ, বিজ্ঞান, বাণিজ্য বা কলা, ইংরেজি পড়া ছাড়া উচ্চশিক্ষা লাভ সম্ভব নয়। কারণ, বাংলাভাষার কোনো পাঠ্যপুস্তক নেই। অনুবাদের সংখ্যাও সীমিত। সুতরাং বলা যায় উচ্চতর পর্যায়ে ইংরেজি মাধ্যমেই শিক্ষার সুফল পাওয়া যেতে পারে।

হাসান আজিজুল হক তাঁর 'শিক্ষা, শিক্ষার মাধ্যম' প্রবন্ধে উচ্চশিক্ষায় ইংরেজির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলেছেন, 'চমৎকার মনবাঁধানো ফল করে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক উৎরে এসে উচ্চশিক্ষায় ঢুকেই ছাত্রছাত্রীরা মর্মে মর্মে

www.pathagar.com

টেরপায় তারা অথৈ সাগরে এসে পড়েছে, কোনোদিকেই কূলকিনারা নেই। উচ্চশিক্ষার প্রধান একটি অবলম্বনই তাদের নেই। সেটি হল কাজ চালানোর মতো আয়ত্ত করা একটি বিদেশী ভাষা এবং আমাদের দেশের বেলায় সে ভাষা হল ইংরেজি ভাষা। কথাটা সরাসরি বলে ফেলা গেল। নানা বির্তক থাকলেও, বহুরকম প্রসঙ্গ এর সঙ্গে জড়িয়ে গেলেও এই কথাটি সবাই জানেন, মেনেও নেন। কিন্তু এই একটি বিদেশী ভাষার অবলম্বন না থাকায় ক্ষতিটা যে, কতোটা অতলস্পর্শী হয়ে উঠেছে, এই অভাব যে কর্কট রোগের মতোই শিক্ষা ব্যবস্থার পুরো দেহটাকে ঝাঁঝরা করে ফেলেছে তা ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবক, সরকার, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী কেউ, পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করেন বলে প্রমাণ নেই।' অর্থাৎ উচ্চশিক্ষায় ইংরেজি মাধ্যমে পড়ার উপযোগীতা সম্পর্কে তাঁর ধারণা স্পষ্ট ফুটে ওঠেছে।

তবে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ইংরেজি মাধ্যমে পড়িয়ে কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়া সহজ নয়।

জ্ঞান বিকাশে কোন ভাষা উপযোগী

যে-কোনো ভাষাতেই জ্ঞান বিকাশ সম্ভব। শিক্ষাই জ্ঞান; তাই জ্ঞান বিকাশ বলতে শিক্ষার বিকাশ বোঝতে পারি। শিক্ষা যে-কোনো ভাষাতেই লাভ করা যেতে পারে। তবে শিক্ষা হবে সুশিক্ষা এবং যুগোপযোগী। অন্যথায় সে শিক্ষার কোনো মূল্য থাকবে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও সবসময় শিক্ষা অর্জনের কথা বলেছেন। সুশিক্ষার কথা বলেছেন। 'একজন শিক্ষিত ব্যক্তির যথার্থ পরিচয় তার কর্মে, আচরণে, চিন্তা চেতনা ও রুচিতে এবং মুখের বাক্যে।' শিক্ষার সাথে ভাষার সম্পর্ক নিবিড়। একটি অন্যটির বাহন। সুতরাং যে ভাষা যত উন্নত আর সে ভাষায় জ্ঞানের বিকাশও ব্যাপক। বর্তমান প্রেক্ষাপটে ইংরেজি জ্ঞান বিকাশের উল্লেখযোগ্য বাহন। তার মানে এই নয় যে অন্য ভাষা ছাড়া জ্ঞানার্জন সম্ভব নয়। মহাপণ্ডিত সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটলের জ্ঞান ইংরেজিতে বিকশিত হয়নি। তখন গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষা আন্তর্জাতিক ভাষার মর্যাদা পেত। চীন, জাপানে শিক্ষার মাধ্যম তাদের স্বদেশী ভাষায়। তাদের জ্ঞান বিকাশ ঘটেনি তা বলা যাবে না। জ্ঞান-বিজ্ঞানে তারা যথেষ্ট উন্নত। বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম ধরে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমি সম্পূর্ণ বাংলাভাষার পথ দিয়েই শিখেছিলাম ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, কিছু পরিমান প্রাকৃত বিজ্ঞান। ... আমার বার বৎসর বয়স পর্যন্ত ইংরেজী বর্জিত এই শিক্ষাই চলছিল, ... এর ফলে শিশুকালেই বাংলা ভাষার ভাণ্ডারের আমার প্রবেশ ছিল অবারিত।'

বাংলা ভাষায়ই জ্ঞানের বিকাশ ঘটবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রশ্ন হচ্ছে এই জ্ঞানের উপযোগিতা নিয়ে। এক্ষেত্রে বাংলাভাষার বিকাশ সাধন, বাংলাভাষাকে

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জনপ্রিয় করে তোলার মাধ্যমে এর উপযোগিতা-প্রয়োজনীয়তা আন্তর্জাতিকভাবে প্রসার অনুভব করা সম্ভব। যদিও বর্তমান আধুনিক বিশ্বের প্রেক্ষাপটে ইংরেজিতে জ্ঞান অর্জন অনস্বীকার্য। বিশেষ করে, চাকরি, ব্যবসাবাণিজ্য সবক্ষেত্রেই ইংরেজি অপরিহার্য ভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

চাকরি-ব্যবসা-বাণিজ্য তথা অফিস আদালতের ভাষা

আধুনিক যুগ বিজ্ঞানের যুগ। আধুনিক যুগ বিশ্বায়নের যুগ। বিশ্বায়নের এই যুগে পৃথিবীর সকল দেশ যেন একটি গ্রামের কয়েকটি পরিবারের মতো। মুহূর্তের মধ্যেই যারা একে অন্যের খবরা-খবর আদান প্রদান করতে পারে। বর্তমান যুগে মুক্তবাজার অর্থনীতি প্রবর্তিত হয়েছে। মুক্তবাজার অর্থনীতি আর বহুজাতিক কোম্পানি প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে আন্তর্জাতিক ভাষার গুরুত্ব বেড়েই চলেছে। আন্তর্জাতিক আদান-প্রদান, ভাববিনিময়ের একমাত্র মাধ্যম হলো আন্তর্জাতিক ভাষা এবং তা আমাদের জন্য অবশ্যই ইংরেজি। তাই চাকরি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইংরেজির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ঠিক একই সঙ্গে দেশীয় পরিসরে মাতৃভাষা তথা বাংলার প্রচলনও থাকতে হবে।

ব্রিটিশ আমলে আমাদের দেশের অফিস আদালতের ভাষা ছিল ইংরেজি। ব্রিটিশরা দেশত্যাগ করে চলে যাবার পরেও তার ছোঁয়া রয়ে গেছে আমাদের অফিস আদালতে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারিকৃত এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশের অফিস আদালতে বাংলা ভাষার প্রচলন শুরু হয় সীমিত পরিসরে। এ বাংলাকে আমরা 'দাপ্তরিক' বাংলা বলে অভিহিত করলেও অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও বাংলা ভাষা তার সাবলীলতা পায়নি। কিন্তু এটার প্রয়োজন ছিল এখনও রয়েছে। উচ্চ আদালতের রায়ের ক্ষেত্রে বাংলা এখনও ব্যবহৃত হয় না।

উচ্চশিক্ষা, চাকরি, ব্যবসাবাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু এর জন্য ইংরেজি মাধ্যমে লেখাপড়া ততটা আবশ্যক নয়। কেননা, বিজাতীয় ভাষায় লেখাপড়া শিখলে শিশুর মানসিক তথা বৌদ্ধিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়; যা সাবলীলতা পায় তার মাতৃভাষার শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে। কেবল মাত্র বিশেষ কিছু লক্ষ্য অর্জনের জন্য দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজি শেখা উচিত। এর জন্য আলাদা ইংরেজি মাধ্যম পরিচালিত বিদ্যালয় জরুরি নয়। আমাদের উচিত সরলমতী শিশুদের সাবলীল বিকাশ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদেরকে ভবিষ্যৎ সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। এজন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণের বা প্রদানের বিকল্প নেই। বাংলা মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ'-এ বলেছেন, 'আমরা শিশুকাল হইতে

www.pathagar.com

ইংরেজি বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক, যাহা ইংরেজ ছেলেদের জন্য রচিত, তাহাই পড়িয়া আসিতেছি, ইহাতে নিজের দেশ আমাদের কাছে অস্পষ্ট এবং পরের দেশ, পরের জিনিস আমাদের কাছে অধিকতর পরিচিত হইয়া আসিতেছে।'

শিক্ষা অর্জন ও ভাষার মধ্যে রয়েছে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। এদের একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির অস্তিত্ব যেমন নেই, কল্পনাও করা যায় না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই ভাষা হবে কোনটি। মাতৃভাষা না অন্যকোনো ভাষা? সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় মাতৃভাষা। মাতৃভাষা শিশুর প্রাণের ভাষা। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করলে শিক্ষার্থী সহজে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। এ ভাষায় শিক্ষার্থী কোনো বিষয় যত সহজে বুঝতে পারে এবং হৃদয়ঙ্গম করতে পারে অন্য কোনো ভাষায় তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। মাতৃভাষা শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশ ঘটাতে সুযোগ করে দেয়।

আমরা বাঙালি, বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। মাতৃভাষা সম্পর্কে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বরেছেন 'মানুষ সামাজবদ্ধ জীব। সমাজবদ্ধ মানুষের দুঃখ বেদনা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, অনুশীলন, অধ্যবসায় এবং স্বপ্ন ও আশার প্রতিফলন ঘটে সমাজ দেহে। সমাজ এবং সমাজবদ্ধ মানুষের মুধ্যে মনোগত এবং প্রাণোগত মিলনের ও আদান প্রদানের উপায় স্বরূপ মানুষের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যে সৃষ্টি তাই মাতৃভাষা। এই ভাষার নিরন্তর ক্রিয়ায় সমস্ত মানুষকে এক করে ফেলেছে মাতৃভাষা। নইলে মানুষ সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে মানবধর্ম হতে বিচ্ছিন্ন হতো।' ভাষা শিক্ষার মাধ্যমেই শিশুর শিক্ষা শুরু হয়। ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন, 'আগে চাই বাংলা ভাষার গাঁথুনি, তারপর ইংরেজি শেখার পত্তন।" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষার ক্ষেত্রে তার এই উক্তির মধ্যে দিয়ে শিক্ষা অর্জনের জন্য মাতৃভাষার গুরুত্বকে যথাযথ ফুটিয়ে তুলেছেন। কেননা, 'জীবনের অনন্ত জিজ্ঞাসা বিচিত্র অভিজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যম হচ্ছে মাতৃভাষা।'

শিশুর শিক্ষার প্রথম পর্ব মাতৃভাষার অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য। শিশু জন্মগ্রহণের পর থেকেই ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। তখন সে আপন শক্তিতে সবাইকে অবাক করে দিয়ে একদিন তার সবচে আপন তথা নিকট বন্ধু মাকে 'মা' বলে ডাক দেয়। এভাবে পারিপার্শ্বিক শব্দ শুনে দু'একটি করে শব্দ আয়ত্তের মাধ্যমে আস্তে-আস্তে

"মৌলিক শিক্ষা গ্রহণে মাতৃভাষার বিকল্প নেই। তবে বিভিন্ন বইপত্র কিংবা জার্নাল থেকে তথ্য সংগ্রহে ইংরেজি জানা অত্যাবশ্যক। বিশ্বের অনেক দুর্লভ বইপত্র ও জার্নাল ইংরেজি ভাষায় অনূদিত। তাই সেক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষায় দখল না থাকলে তা থেকে জ্ঞান আহরণ সম্ভব নয়। অন্যদিকে মাতৃভাষায় শিক্ষাব্যবস্থা না থাকলে শিক্ষাগ্রহণকারী কিছুতেই তার মৌলিক শিক্ষা যথার্থভাবে গ্রহণ করতে পারবে না। অর্থাৎ, প্রকৃত শিক্ষাগ্রহণের জন্য মাতৃভাষা ও ইংরেজি দুটোই যথার্থ ভূমিকা পালন করে।"

ড.ম.আখতারুজ্জামান
প্রফেসর, উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

ভাষা আয়ত্ত করে। প্রত্যেক মানব শিশুর মস্তিষ্কে থাকে ল্যাংগুয়েজ একুইজিসন ডিভাইস (Language Acquisition Device) এর বিকাশ সম্ভব হয়ে ওঠে পারিপার্শ্বিকের সাহচর্যে। এভাবে পরিবেশেই হয়ে ওঠে শিশুর শিক্ষার তীর্থক্ষেত্র। শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে জাতীয় ভাষা বা মাতৃভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলাভাষার গুরুত্ব তুলে ধরে একদা লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে লিখেছিলেন, 'মনে আছ আমরা বাল্যকালে কেবলমাত্র বাংলা ভাষায় শিক্ষা আরম্ব করিয়াছিলাম। বিদেশী ভাষায় পীড়নমাত্র ছিল না।' পরবর্তীকালে 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, 'কোন শিক্ষাকে স্থায়ী করিতে হইলে, ব্যাপক করিতে হইলে তাহাকে চিরপরিচিত মাতৃভাষায় বিগলিত করিয়া দিতে হয়। যে ভাষা দেশের সর্বত্র সমীরিত, যাহার্তে সমস্ত জাতির মানসিক নিশ্বাস প্রশ্বাস নিষ্পন্ন হইতেছে, শিক্ষাকে সেই ভাষার মধ্যে মিশ্রিত করিলে তবে সমস্ত জাতির জীবন ক্রিয়ার সহিত তাহার যোগাসাধন করিতে সেই জন্য পালি ভাষায় ধর্ম প্রচার করিয়াছেন।'

শিক্ষা পদ্ধতিতে ভাষার গুরুত্ব খুব বেশি এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্ঞানের বিস্তার, সংস্কৃতির প্রসার এবং জাতীয় ঐক্যবোধের সৃষ্টি। অতএব, আমাদের শিক্ষার অভীষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পৌঁছানোর যথার্থতা ভাষার ওপরে অনেকাংশে নির্ভরশীল। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের ক্ষেত্রেও ভাষা নির্বাচন ও তার ব্যবহারের গুরুত্ব রয়েছে। এ ব্যাপারে ১৯৭৪ সালে শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে বলা হয়েছে "বাংলা ভাষাকে সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রবর্তনের পরও আমাদের শিক্ষার্থীদের পক্ষে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজি শিখবার প্রয়োজন থাকবে। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত মাতৃভাষা বাংলা ব্যতীত কোনো ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন নেই। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে একটি উন্নত আধুনিক বিদেশী ভাষা বাধ্যতামূলকভাবে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত উত্তমরূপে শিখতে হবে। ঐতিহাসিক কারণে বাংলাদেশের বাস্তব পরিবেশ যা তাতে ইংরেজি দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে অব্যাহত থাকবে (৪.৬-৪.৮)।" শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে ইংরেজি শিক্ষার গুরত্বের কথা বলা হয়েছে তবে তার মানে এই নয় শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি হতে হবে। ড. নজরুল ইসলাম প্রণীত শিক্ষানীতি ২০০০-এ বলা হয়েছে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইংরেজি অতিরিক্ত ও তৃতীয় শ্রেণী থেকে বাধ্যতামূলকভাবে ইংরেজি পড়াতে হবে।

শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজির কথা বলতে গেলে ইংলিশ মিডিয়াম (English Medium) স্কুলের কথা বলতে হয়। আমাদের দেশে প্রচলিত কথা ত্রিভঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম প্রতিনিধি এই ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলগুলো। সদ্য ধনিক শ্রেণী তথা শহুরে বাসিন্দাদের জনপ্রিয় এই শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের কী উপহার দিচ্ছে তা আলোচনা সাপেক্ষ। প্রথমে বলতে হয় এই বিদ্যালয়গুলোর পাঠ্যপুস্তকের কথা। এই পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষার্থীরা অর্জন করে বিদেশী কৃষ্টি, কালচার, আচার-আচরণ তথা রীতিনীতি। এমনকি তারা বাংলাদেশে

www.pathagar.com

অবস্থান করেও বাংলাদশের জলবায়ু সম্পর্কে জানে না। জানে না বাংলাদেশের সঠিক ইতিহাস। বিদ্যালয়ে ইংরেজি পরিবেশে এবং বাড়িতে বা বাসায় বাংলা পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের খাপখাওয়াতে তাদের হিমশিম খেতে হয়। তবে কিছু-কিছু মেধাবী শিক্ষার্থীদের কাছে এটা তেমন সমস্যা হয়ে ওঠে না। অধিকাংশ সাধারণ শিক্ষার্থীরা এই দুই পরিবেশের সমন্বয়ে এমন একটি খিঁচুড়ি মার্কা পরিস্থিতির আবর্তে আবর্তিত হয় যা স্বাভাবিকতাকে নষ্ট করে। এই শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা বাংলাভাষার দক্ষতা অর্জন করতে পারে না; ঠিক ইংরেজিও তাদের সঠিকভাবে শেখা হয় না। যেখানে ভাষার দক্ষতাই অর্জিত হয় না; সেখানে সত্যিকারের শিক্ষা তথা সৃজনশীল শিক্ষার কথা চিন্তা করা নেহাতই বেমানান। তাই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষার পরিবর্তে মাতৃভাষার মাধ্যমেই জ্ঞানার্জন যথাযথ উপযুক্ত ও প্রজ্ঞা প্রসূত।

"আমাদের কালে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা শুরু হতো প্রথম শ্রেণী (কোথাও বেবি ক্লাস থাকতো) থেকে। এখন প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে স্পষ্ট দুটি স্তর সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম ঃ প্লে গ্রুপ, নার্সারি, কেজি ওয়ান, কেজি টু; দ্বিতীয়ঃ প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী। সে হিসেবে ধরতে গেলে প্রাথমিক পর্যায়ের পড়াশোনা চলে আট বছর। শিশুর বয়স তখন হয় ১১/১২+, অর্থাৎ কৈশোর ছুঁই ছুঁই অবস্থা। এই সময় শিশুর জন্য যেমন মাতা পিতার দরদি লালন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন মাতৃভাষার নিবিড় লালন।

আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি যে মা আর মাতৃভাষাকে কোনো মানুষই বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। আর ঠিক সেই কারণেই মনে করি, প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা হওয়া উচিত মূলত মাতৃভাষার আদরে এবং পরিচর্যায়। তাহলে শিশুর চিন্তার বিকাশ হবে স্ফূর্ত সুষ্ঠু এবং সুস্থ। বিশেষ করে আমি এতোটাই মনে করি যে প্রাক প্রথম শ্রেণীতে শিশুর উপর বাঙলার বদলে ইংরেজি ভাষা চাপিয়ে দেয়া আর মাতৃস্তন্যে শিশুকে বঞ্চিত করা একই কথা। হয়তো শিশুরা ফুটুর ফাটুর কিছু ইংরেজি শব্দ শিখবে এবং বলতেও পারবে। তবে তারা আত্মস্থ করতে পারবে না উচ্চারণ কিংবা সেই শব্দ প্রয়োগ দক্ষ হবে না। অন্যদিকে বাঙলা ভাষার প্রমিত উচ্চারণের ব্যাপারটা থেকে যাবে তাদের কাছে অজানা। একটা প্রবাদ আছে—' শেখার চেয়ে ভোলা কঠিন।' তাই দেখা যায় পরবর্তী জীবনেও বাংলা ভাষী ব্যক্তিরা প্রমিত বাঙলা ভাষার বিষয় সম্বন্ধে আদৌ সচেতন নন। অহরহ আমরা বিএছছি, এমএছছি, Sata, Satro (ছাতা, ছাত্র), খাইসি, ফালাই দিসি ইত্যাদি উচ্চারণে কথা বলতে শুনি। যেহেতু শিশুকালে ঐ উচ্চারণগুলো তাঁরা শেখেননি, কেউ শেখানোর প্রয়োজনও মনে করেন নি, তাই সচেতনও হন নি। আর ইংরেজি তো ঝোঁকপ্রবণ ভাষা (Stressed language), সে ঝোঁকগুলোও শেখে না শিশুরা (হয়তো শেখার সুযোগ পায় না), তাই তাদের ইংরেজি উচ্চারণও হয় হাস্যকর। প্রাজ্ঞজনেরা বলেন, They speak English in Bangla.

আমার মতে প্রাক প্রাথমিক স্তরের শিশুদের জন্য মাতৃভাষার 'ব্রেস্ট ফিডিং' অনিবার্য। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিলগ্ন অনেক শব্দ তারা শুনে শুনেই শেখে। ওটুকুই যথেষ্ট। বই পুস্তক বা আনুষ্ঠানিক ইংরেজি পড়ার চাপ কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। এক জাপানিকে.জি স্কুলের শিক্ষক আমাদের কে.জি শিক্ষায় ইংরেজি পড়ানো দেখে অবাক হয়ে বলেছিলেন যে জাপানে নাকি কে.জি স্তরে বিদেশী ভাষার নামও বলা হয় না। তারা শেখে মাতৃভাষা। গান গায়, ছড়া পড়ে সুর করে, আঁকি বুকি সারাক্ষণ চলে, চলে

www.pathagar.com

আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার অবস্থা যেমন বেহাল অবিভাবকদের অবস্থাও ঠিক তেমনি। অধিকাংশ শহুরে ধনাঢ্য বাবা-মার কোমলমতী, ফুটফুটে শিশুসন্তানগুলো আনন্দের সাথে লেখাপড়ার সুযোগতো পায়ই না; বরং নানাবিধ বইয়ে ভরা ব্যাগের ভারে তাদের জীবন হয়ে ওঠে ওষ্ঠাগত। পারিপার্শ্বিক প্রতিযোগিতা আর আভিজাত্য বজায় রাখার প্রতিফলন হিসেবে তারা তাদের শিশু সন্তানদের ইংরেজি মাধ্যমের বিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি করেন। শিশুর মেধা, ইচ্ছা তথা ঝোঁককে (Aptitude) কখনও প্রাধান্য দেয়া হয় না। তাই তো অধিকাংশ

নানারকম খেলা, যার মাধ্যমে শিশুর শরীর মন এবং মেধার সমন্বয় সাধিত হবে। ওদের শিশুরা খেলতে খেলতে শেখে বা পড়ে। অথচ আমাদের শিশুরা পড়তে পড়তে খেলার সুযোগ হারিয়ে ফেলে। এমন অবস্থার পরিবর্তন না হলে সমূহ বিপদ হবে। হচ্ছেও। শিশুরা অনেক বই পড়ে, কিন্তু জানে না কিছুই প্রায়। দাঁতভাঙা ইংরেজি শব্দ উচ্চারণ করতে হোঁচট খায়, আর বাঙলা বলে অশাস্ত্রীয় উচ্চারণে। ফলে শিক্ষার হার বাড়লেও শিক্ষার গুণগত মানে আমরা পিছিয়েই থাকছি। তাই আবারও জোর দিয়ে বলতে চাই, প্রাক প্রাথমিক স্তরে শিশুকে ইংরেজি খাওয়ানো বন্ধ করা উচিত। ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষার তো প্রশ্নই ওঠে না।

প্রাথমিক পর্যায়ে দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজির সঙ্গে শিশুদের পরিচয় হলেই ভালো। ক্রমান্বয়ে তা চলুক পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত। অর্থাৎ, মাতৃদুগ্ধের পাশাপাশি শিশুর পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য যেমন বাইরের খাবার দেয়া হয়, ঠিক সেই দর্শনে চলা। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাও হওয়া উচিত মাতৃভাষার মাধ্যমে। বড়লোকের খাদক সন্তান বেশি পুষ্টির ফলে যেমন গাদুম গুদুম হয়, তেমনি নানা অসুখেও ভোগে। তা নিয়ে মা বাবাকে পেরেশান থাকতে হয়। তেমনি প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুকে বেশি ইংরেজি পড়ালে হয়তো তার মেধাগত পুষ্টি বাড়বে, কিন্তু বিভাষা অর্জনের কঠোর সাধনায় সে হারিয়ে ফেলবে তার শৈশব এবং মাতৃভাষার ভাষিক লালন। পাঠ পুষ্টির এনার্জিতে নাকি ইংরেজি মাধ্যমের ছাত্ররা হয় অত্যধিক চঞ্চল কখনও বা অমনোযোগী। তখনও বাবা-মাকে পেরেশান থাকতে হয় টিউটরের সেবা দেয়ার জন্য। আর ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষার সবচেয়ে বড় কুফল হলো, শহর ও গ্রামভিত্তিক স্কুলের শ্রেণীগত বিভেদ ও কৃত্রিম শিক্ষার আভিজাত্য নির্মাণ। সমাজের অর্থনৈতিক শ্রেণী বৈষম্যেই আমরা কাতর, তার উপর শিক্ষার মাধ্যমজনিত শ্রেণী বৈষম্য সৃষ্টির কথা ভাবাই যায় না। তবে হ্যাঁ, কিছু-কিছু স্কুলে ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা তো থাকতেই পারে। সেই ব্যবস্থা এবং সেই দর্শন স্বতন্ত্র। সেখানে আমার আপত্তি নেই।

মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপারেও একই কথা। মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা লাভ করতে হবে তাদের। এই পর্যায়ে ইংরেজি তো পড়তেই হয়। তবে দুঃখের কথা এই যে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা ইংরেজি পাঠ শেখে, ভাষাটা শেখে না। মানে বলতে চাই, আলাপচারিতার ভাষা হিসেবে (Communicative language) শেখে না। সেই ব্যবস্থা থাকলে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা সহজেই দ্বিভাষী হতে পারতো। সেটাকে কল্যাণকর মনে করি।

উচ্চশিক্ষার বিষয় ও পরিধি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ঐ পর্যায়ে বিষয় এবং ভাষার মাধ্যম নির্বাচনটা আর চাপিয়ে দেয়ার ব্যাপার থাকে না। যার যেমন মেধাগত এবং আর্থিক সংগতি, সেটাকেই কাজে লাগায় তারা। ততোদিন মাতৃভাষার ভিত্তিটা শক্ত হয়ে যায়। যা তাকে সারাজীবনই ঋজু রাখবে।"

ড. বেগম জাহান আরা
অধ্যাপক, আধুনিক ভাষা ইন্সটিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

ক্ষেত্রেই শিক্ষা শিক্ষার্থীর আনন্দ বয়ে আনার পরিবর্তে তাদের দুঃখের সাগরে নিক্ষেপ করে। তাই তো বারবার ঘুরেফিরে আমাদের দেশে প্রচলিত 'কিন্ডারগার্টেন' বিদ্যালয়গুলোর কথা বলা দরকার। শিক্ষাবিদ হেনরী ফ্রোয়েবল শিশুদের তুলনা করেছিলেন বাগানে কচি চারার মতো। তাই তাদের সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে বিকশিত করার মহৎ উদ্দেশ্য তিনি 'কিন্ডারগার্টেন' স্কুলের কথা বলেছিলেন, যেখানে শিশুরা খেলাধুলার তথা আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করবে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি ফ্রোয়েবলের চিন্তাভাবনার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইংরেজি স্কুলে সন্তানকে পড়ানো এখন Status রক্ষার Symbol হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই ইংরেজি ভাষা শেখানোর চর্চার বদলে একগাদা বই নিয়ে স্কুলে যাওয়া আসাটাই মুখ্য হয়ে ওঠে। নানাবিধ বইপত্র এবং শিক্ষা উপরকরণের চাপে নূয়ে পড়া শিশুদের চিত্র দেখলে ফ্রোয়েবল যে নীরবে অশ্রু বিসর্জন দিতেন এ-কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। পারিপার্শ্বিকতা, শিক্ষার্থীর চাহিদা, শিক্ষা পরিবেশ ইত্যাদির কথা মাথায় রেখেই কোনো দেশের শিক্ষাব্যবস্থা তথা শিক্ষা পরিকল্পনা করা হয়। শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের মাধ্যমে জাতীয় জীবনের সার্বিক বিকাশ তথা উন্নতির পথে ধাবিত হওয়ার উদগ্র বাসনার তাড়নায়ই গঠিত হয় শিক্ষা কমিশন, গৃহীত হয় শিক্ষা পরিকল্পনা। জাতীয় ঐতিহ্য, কৃষ্টি, কালচার বা রীতিনীতির পরিচায়ক মাতৃভাষা শিক্ষা পরিকল্পনায় প্রাধান্য পায় শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে। বোদ্ধা মহল মনে করেন, আমরা বাঙালি, বাংলা আমাদের মাতৃভাষা; তাই আমাদের শিক্ষার মাধ্যমও হওয়া উচিত বাংলা ভাষা।

বিশ্বের সব উন্নত দেশই শিক্ষার প্রায় শুরু থেকে একটি বা একটির বেশি বিদেশী ভাষা শেখা আবশ্যিক করলেও শিক্ষার একেবারে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যমটা রেখে দেয় মাতৃভাষা। মাতৃভাষায় লেখাপড়া শুরু মানে সন্তান জন্মের পর মায়ের শাল দুধ মুখে দেয়ার মতো। শাল দুধ যেমন শিশুর রোগ প্রতিরোগ ক্ষমতা বাড়ায়, তেমনি শিশুর প্রথম পড়া মাতৃভাষায় হলে ভাষা শেখার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে।

www.pathagar.com

শিক্ষা বাণিজ্যে কিন্ডারগার্টেন স্কুল ॥ এক

ঐতিহাসিক পটভূমি

একবিংশ শতাব্দীতে এসে আমাদের দেশে কিন্ডারগার্টেন শিক্ষার প্রসার লাভ করলেও এর শুরুটা হয়েছিল স্বাধীনতা লাভের পরপরই। শুরুতে রাজধানীতে দু'একটা কিন্ডারগার্টেন প্লে থেকে কেজি ওয়ান পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকলেও এখন কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলো কোথাও কোথাও একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত চালু করেছে।

কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা পদ্ধতি প্রথম চালু হয়েছিল আজ থেকে ১৬৩ বছর আগে জার্মান দেশে, ১৮৩৭ সালে। বিখ্যাত জার্মান শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক Mr. Fridrich Froebel প্রথম কিন্ডারগার্টেন শিক্ষার প্রচলন ঘটান। বর্তমানে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অধিকাংশ দেশে কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা পদ্ধতি চালু রয়েছে। 'কিন্ডারগার্টেন' শব্দটির মূল অর্থ হচ্ছে 'ফুলের বাগান'। শিশুরা হচ্ছে ফুলের মতো নিষ্পাপ। আর স্কুলটিকে ধরা যাক বাগান হিসেবে। যে বাগানে ফুলের সমারোহ অর্থাৎ, শিশুদের সমারোহ ঘটে। সে অর্থেই কিন্ডারগার্টেন স্কুল নামকরণ করা হয়েছে। ইদানীং কিন্ডারগার্টেন শিক্ষার সাথে সংগতি রেখে প্রি-ক্যাডেট নামকরণেও বহুসংখ্যক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসব স্কুলগুলোও কিন্ডারগার্টেন শিক্ষার আওতাভুক্ত।

পরিসংখ্যান

বর্তমানে প্রতিদিনই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, এমনকি গ্রামেগঞ্জেও একটি/দুটি কিন্ডারগার্টেন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। ফলে প্রতিদিনই সংখ্যার পরিসংখ্যান পরিবর্তন হচ্ছে। এক জরিপে দেখা গেছে, ২০০০ সাল পর্যন্ত ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় ৭০০০টি কিন্ডারগার্টেন, প্রি-ক্যাডেট ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে রাজধানী ঢাকায় রয়েছে প্রায় দুই হাজার কিন্ডারগার্টেন স্কুল। এসব স্কুলে পাঁচ থেকে ত্রিশজন করে শিক্ষক নিয়োজিত রয়েছে। গড় হিসেবে সারাদেশে প্রায় ১,২০,০০০ (একলক্ষ বিশ হাজার) জন শিক্ষক নিয়োগপ্রাপ্ত রয়েছে ধারণা করা যায়। তবে সরকারিভাবে এ হিসেবের সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া কঠিন। কেননা, কোথাও কোথাও কিন্ডারগার্টেন স্কুল নামকরণ করা হলেও শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের হিসেবে এগুলোকে প্রাইভেট কোচিং সেন্টার হিসেবেও আখ্যা দেওয়া যায়। এসব নাম সর্বস্ব কিন্ডারগার্টেন স্কুলে পাঠ্যসূচি, পাঠ্যতালিকা প্রণয়ন, নিয়মিত পরীক্ষা গ্রহণ এবং কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। নাম সর্বস্ব স্কুলসহ হিসেব করলে কিন্ডারগার্টেন স্কুলের সংখ্যা হবে সাত হাজারেরও অধিক।

www.pathagar.com

শিক্ষাব্যবস্থা

কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলো মূলত দু'ভাগে বিভক্ত। বাংলা মিডিয়াম ও ইংলিশ মিডিয়াম। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের সংখ্যা খুব বেশি না হলেও এসব স্কুলের অধিকাংশই বিদেশের শিক্ষাপদ্ধতি মেনে চলছে। তাই ইংলিশ মিডিয়াম কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলো দাবি করছে, বাইরের শিক্ষা পদ্ধতি মেনে চলার কারণে কিন্ডারগার্টেন স্কুলের শিক্ষার মান অনেক উন্নত।

এসব স্কুলে সাধারণত বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা উপেক্ষিত। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ক্ষেত্রে আরেকটি দিক উল্লেখযোগ্য যে, শুধুমাত্র উচ্চবিত্ত শ্রেণীর সন্তানরাই যোগ্যতা ধারণ করে এসব ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে লেখাপড়া করার। কারণ, বেতন, ভর্তি ফি, সেসন ফি এসব স্কুলে এতই বেশি যে সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের ধরাছোঁয়ার বাইরে। বেতন ও ভর্তি ফি বেশি নেওয়ার কারণ হিসেবে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোর যুক্তি হলো, উন্নত পাঠদান পদ্ধতি, বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে তারা অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ করে। যে সব শিক্ষককে ভালো বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান করতে হয়। এ ছাড়া ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোর অধিকাংশই রাজধানী, রাজধানীর বাইরে বিভাগীয় শহরসহ বিভিন্ন উন্নত এলাকায় প্রতিষ্ঠিত। সেখানে জমির চড়ামূল্য, উচ্চহারে বাড়ি ভাড়া প্রদান করতে হয়। সংগত কারণে শিক্ষার্থীর কাছ থেকে টাকার অংক বাড়ানো ছাড়া তাদের গতি থাকে না।

বাংলা মিডিয়াম কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলো সেদিক থেকে ব্যতিক্রম। এসব স্কুলগুলো যে-কোনো অঞ্চলে, যে-কোনো পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত। এসব স্কুলের লেখাপড়ার মান কখনো-কখনো প্রশ্নসাপেক্ষ। সরেজমিনে এমনও দেখা গেছে যে, ফ্ল্যাট বাসা ভাড়া নিয়ে একটি কক্ষকে হার্ডবোডের পাটিশন দিয়ে দুই বা তিনটি কক্ষ করা হয়েছে। এতে এক রুমের কথাবার্তা, শিশু শিক্ষার্থীর হইচই পাশের কক্ষের শিক্ষার্থীদের পাঠদান দারুণভাবে বিঘ্নিত করে। এতে করে শিশুরা না পারছে হাঁটাচলা, ছুটোছুটি করতে; না পারছে বিনোদনের জন্য খেলার মাঠ, সংস্কৃতি চর্চার কোনো পরিবেশ। মানে শিশুমনের বিকাশ বাধাগ্রস্ত ও কোণঠাসা হয়ে পড়ছে এখানে।

এজন্যে গেন্ডারিয়ার সতিশ সরকার রোডস্থ লিভারেটর পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মো: ফখরুদ্দিন সিদ্দিকী আমাদের অপরিকল্পিত নগরায়ণ ও জনসংখ্যার চাপকে দায়ী করেন। তিনি মনে করেন, "জনসংখ্যার বাড়তি চাপ ও অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফলে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কিন্ডারগার্টেন স্কুলগলো যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না।"

তাই বলে যেখানে সেখানে যত্রতত্র স্কুল গড়ে উঠবে? "ওঠতে বাধ্য। কেননা,

www.pathagar.com

শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হলে এর বিকল্প নেই। উপযুক্ত পরিবেশ নেই, এই অজুহাত দেখিয়ে সবাই যদি হাত গুটিয়ে বসে থাকে তাহলে 'সবার জন্য শিক্ষা' ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। সুতরাং ভালো পরিবেশ, ভালো স্কুলের পাশাপাশি দু'একটা সাধারণ স্কুলও প্রতিষ্ঠিত হবে।"

পাঠদান পদ্ধতি

ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের পাঠদান পদ্ধতি সম্পূর্ণ নিজস্ব। এক্ষেত্রে ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থাই অধিকাংশরা মেনে চলে। দুএকটি রয়েছে আমেরিকান শিক্ষাব্যবস্থা নির্ভর। এসব স্কুলের পাঠ্যপুস্তকও বাইরে থেকে আমদানি করতে হয়। যার ফলে পাঠ্যপুস্তকের জন্যে শিক্ষার্থীকে স্কুল কর্তৃপক্ষের ওপর পুরোপুরি নির্ভর থাকতে হয়।

বাংলা মিডিয়াম কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোর পাঠ্যতালিকা ও পাঠদান পদ্ধতি ভিন্ন। তারা সরকারের কারিকুলাম-এর পাশাপাশি বেসরকারিভাবে প্রকাশিত পাঠ্যবই ও পাঠ্যসূচির ওপর নির্ভরশীল। যদিও ইংরেজির ক্ষেত্রে বিদেশের পাঠক্রম মেনে চলে। এই ত্রিমুখী শিক্ষাব্যবস্থার ফলে কোমলমতি শিশুদের অনেক সময় প্রচণ্ড চাপে থাকতে হয়। এ ক্ষেত্রে প্লে/নার্সারি ও প্লে গ্রুপের ছাত্রদের জন্য সরকারের কারিকুলাম অর্থাৎ, বোর্ড বইয়ের কোনো চাপ থাকে না। এদের জন্য বেসরকারিভাবে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনার বই পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তারপরও পাঠ্যবই ও পাঠ্যসূচির দীর্ঘসূত্রিতার কারণে শিশুরা নাস্তানাবুদ। এক কথায় বলা চলে জ্ঞানার্জনের কঠিন বিড়ম্বনায় কুপোকাত হয়ে পড়ে কোমলমতি শিশুরা।

শিক্ষা বাণিজ্যে কিন্ডারগার্টেন স্কুল

অনেকেই কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাকে 'শিক্ষা বাণিজ্য' আখ্যা দিয়ে থাকেন। কেউ কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোকে বলেন, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। দ্বীপ শিক্ষা প্রি-ক্যাডেট স্কুলের অধ্যক্ষও এ-কথা আংশিক স্বীকার করে বলেন, "ব্যবসা মানেই লেনদেন, দেয়া ও পাওয়ার সুযোগ। শিশুদের আমরা সুশিক্ষা দান করি, বিনিময়ে আমরা পারিশ্রমিক নিচ্ছি। অভিভাবকগণ অর্থের বিনিময়ে শিশুদের সুশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে।"

লিবারেটর পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাকে 'শিক্ষা বাণিজ্য' বলতে নারাজ। তিনি এটাকে আখ্যা দিতে চান 'শিক্ষার প্রাইভেটাইজেশন হিসেবে। তিনি বলেন, "তবে আমি মনে করি অর্থ আদায়ের

www.pathagar.com

উদ্দেশ্য মহৎ হলে শিক্ষাকে বাণিজ্য হিসেবে দেখলে দোষ নেই। প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলো বড় অংকের টাকা নিচ্ছে ঠিকই, তারা ভালো টিচিংও দিচ্ছে। এটা দোষের কিছু নয়।" অর্থাৎ, তিনি মনে করেন শিক্ষাকে বাণিজ্যিকরণ করা দোষের কিছু নয় যদি উদ্দেশ্য সৎ থাকে।

আর যদি উদ্দেশ্য থাকে টাকা আদায়ের মাধ্যমে নিম্নমানের বই পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভূক্তি, প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ আদায় ?

"এটা অবশ্যই দোষণীয়। কিন্তু এর সাথে আমি কিছু-কিছু প্রকাশককেও দায়ী করব, যারা নিম্নমানের বই প্রকাশ করে টাকার লোভ দেখিয়ে বই পাঠ্য করাতে চায়।" শুধু নিম্নমানের পাঠ্যবই অন্তর্ভুক্তি ছাড়াও চড়ামূল্যে শিক্ষার্থীদের কাছে বই বিক্রয়, অতিরিক্ত বেতন আদায়সহ আর্থিক দিক থেকে নানা অভিযোগও রয়েছে কোনো কোনো কিন্ডারগার্টেনের স্কুলের বিরুদ্ধে।

কেসস্টাডি : কেজি বই

শুরু থেকেই এই অভিযোগটি রয়েছে যে, আমাদের দেশে যেসব কিন্ডারগার্টেন বই পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্যে প্রকাশিত হচ্ছে, তার অধিকাংশই অপরিকল্পিত পাঠপক্রিয়া, শিশুদের মনস্তাত্ত্বিক দিক লক্ষ্য না রেখে পাঠ্যসূচি তৈরি, ভুল তথ্য, অবৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন, অনবিজ্ঞ-অলেখককে দিয়ে বই লেখানো ইত্যাদি।

কিন্তু এই নিয়ে কারো মাথা ব্যথা নেই। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কোনো দৃষ্টি এদিকে আছে বলে মনে হয় না। অথচ নির্বিঘ্নে শিশুর মেধা ও মননের বিকাশের পরিবর্তে মেধাবিকাশের অন্তরায় এমন সব পাঠ্যপুস্তক তাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। এর সত্যতা প্রমাণের লক্ষ্যে নিবন্ধকার বাজার থেকে বিভিন্ন প্রকাশনার কয়েকটি বই সংগ্রহ করে। দেখা গেছে, এসব বইয়ের অধিকাংশ লেখকই পরিচয়হীন। একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। আবার একই ব্যক্তি বাংলা, ইংরেজি, অংক, সাধারণ জ্ঞান, আরবিসহ সকল বইয়ের লেখক।

বাজারের বইগুলোয় একই বিষয়ে নানারকম বিভ্রান্তিকর তথ্য, ভুল বানান,

---

"উন্নয়নশীল দেশ বাংলাদেশ। এখানে সরকার যেহেতু পরিকল্পিত ও সুচিন্তিত উত্তম শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারছে না, ফলে এই সুযোগ কতিপয় ব্যক্তি কাজে লাগিয়ে একদিকে সমাজ সেবা অন্যদিকে শিক্ষার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাসহ বেকারত্ব হ্রাস, স্বাক্ষরতার হাত বৃদ্ধি ইত্যাদি কাজগুলো করে যাচ্ছে। তাই এটাকে শুধু বাণিজ্য বললে ঠিক হবে না। বাণিজ্য মানেই লেনদেন দেয়া ও পাওয়ার সুযোগ। শিশুদের আমরা সুশিক্ষা দিয়ে থাকি, তার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করি। অর্থাৎ বিনিময় প্রথা আছে বলেই শিশুরা উন্নত শিক্ষা গ্রহনের সুযোগ পাচ্ছে।"

মো: শাহীন পারভেজ
অধ্যক্ষ, দীপশিখা প্রি-ক্যাডেট এন্ড হাই স্কুল

www.pathagar.com

শিশুর মনস্তাত্ত্বিক ধ্যানধারণা বিবর্জিত পাঠ্যসূচি আমাকে অবাক করেছে। বইয়ের মান, বয়স অনুযায়ী উপযোগী কিনা; ভাব-বিষয় ও কথার মধ্যে সংগতিপূর্ণ এবং শিশুদের আকর্ষণ করে কি-না— সেসব না ভেবে বই রচিত হয়। পাঠ্যসূচীতেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ প্রসঙ্গে জনৈক অভিভাবক আলমগীর হোসেন বললেন, "অসংখ্য ভুল তথ্যের একগাদা বই প্রতিদিন আমার কন্যাকে বহন করতে হয়। অবাক লাগে এসব বইই শিক্ষকরা পাঠ্য করছে।" বিদ্যানিকেতন প্রি-ক্যাডেট স্কুল অ্যান্ড কলেজের চেয়ারম্যান কায়দুজ্জামান আজাদ এ ব্যাপারে বললেন, "বাস্তব বিবর্জিত, ভুলে ভরা, নিম্নমানের প্রোডাকশন— এসব বই থেকে ভালো মানসম্পন্ন বই বাছাই করা খুবই কঠিন। দু'একটা প্রকাশনী আছে যাদের একটা কমিটমেন্ট রয়েছে ভালো, মানসম্পন্ন, শিশুদের উপযোগী বই প্রকাশ করা। তবে ভালো ও যোগ্য প্রকাশকের সংখ্যা খুবই কম।" শিক্ষার্থী রুবাইয়াত শবনম অনিকা বলেছে, "স্যাররা এত বেশি বেশি পড়া দেয়, ভীষণ কষ্ট হয় মুখস্থ করতে।"

যা হোক, বাজারের দু'একটি বইয়ের তথ্যগত ও বানানরীতির প্রয়োগ যৎসামান্যই এই নিবন্ধে তুলে ধরা হলো। ছোটদের 'সাধারণ জ্ঞান' এর বই কিন্ডারগার্টেন স্কুলের প্লে গ্রুপ থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত অধিকাংশ স্কুলেই আবশ্যকীয় পাঠ্যপুস্তক হিসেবে বিবেচিত হওয়ার ফলে সাধারণ জ্ঞানের ওপর বাজারে রয়েছে প্রচুর বই। বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন তথ্যে, বৈচিত্র্যপূর্ণ অঙ্গসজ্জায় 'শিশুর জ্ঞান' ভাণ্ডার উজ্জীবিত ও বিকশিত করার লক্ষ্যে কেজি বইয়ের প্রায় সব প্রকাশকই সাধারণ জ্ঞানের একাধিক বই প্রকাশ করে থাকে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে অধিকাংশ বইয়েই তথ্যগত ভুল পরিলক্ষিত।

একই বিষয়ে আলাদা আলাদা তথ্য থাকার কারণে অজানা কারো পক্ষেই সম্ভব নয় সঠিক তথ্যটি খুঁজে নেওয়া। নিম্নের ছকও তাই বলে—

বইয়ের নাম	উল্লিখিত তথ্য
জানতে হবে শিখতে হবে	বাংলাদেশের আয়তন দেওয়া আছে ১,৪৩,৯৯৮.২৬ বর্গ কি. মি.
ছোটদের সাধারণ জ্ঞান	বাংলাদেশের আয়তন দেওয়া আছে ১,৪৩,৯৯৯.৬০ বর্গ কি. মি.
দেখব এবার জগৎটাকে	বাংলাদেশের আয়তন দেওয়া আছে ১,৪৮,৩৯৩. কি. মি.
আমার জানার জগৎ	বাংলাদেশের আয়তন দেওয়া আছে ১,৪৪,০০০ বর্গ কি. মি.
জানতে হবে অনেক কিছু	বাংলাদেশের আয়তন দেওয়া আছে ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি. মি.

www.pathagar.com

এর একই বিষয়ে আলাদা আলাদা তথ্য বিরাজমান অধিকাংশ বইয়ে। কোনো বইয়ের সাথে কোনো বইয়ের তথ্যের সমন্বয় নেই।

অনুরূপভাবে পৃথিবীর ব্যাস কিংবা পরিধি নিয়ে আলাদা আলাদা তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে। যা আদৌ সমীচীন নয়। পৃথিবীর বয়স কেউ লিখেছে ৫০০ কোটি বছর, কেউ লিখেছে ৩০০ কোটি বছর, কেউ লিখেছে ৪৫০ কোটি বছর। অর্থাৎ, যে সব তথ্য সকল বইয়ে একই থাকার কথা, তা পরিলক্ষিত হয়নি বাজারের অধিকাংশ কেজি বইয়ে।

ইংরেজি Rhymes-এ খুব বেশি প্রচলিত Twinkle Twinkle Little Star-ছড়াটি। এটি উপস্থাপন করা হয়েছে একেক প্রকাশনীর বইয়ে একেকরকমভাবে। নামকরণে কেউ লিখেছে 'Twinkle Twinkle Little Star', 'Little Star' ও 'Twinkle Twinkle' নামে। কেউ Twinkle লিখে কমা (') ব্যবহার করেছে; কেউ কমা বা কোনো যতিচিহ্ন ব্যবহার করেনি। অর্থাৎ, যার যার মনগড়াভাবে শব্দ বাক্য, যতিচিহ্ন ব্যবহার বর্জন কিংবা গ্রহণ করেছে। বাংলা বইয়ের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, বানান বিভ্রাট, কবিতার ছন্দপতনসহ নানা অসংগতি। যেমন— কেজি ও প্রথম শ্রেণীর উপযোগী করে লেখা 'আমার সাথী' বাংলা বইয়ে কাজী নজরুল ইসলামের 'ভোর হল' কবিতাটির বিকৃত উপস্থাপন :

ভোর হল

ভোর হলো দোর খোলো
খুকুমনি ওঠরে
পাখি ডাকে জুঁই শাখে
ফুল কলি ফোটে রে।

আরেক প্রকাশনীর 'আমার বাংলা পড়া' বইয়ে 'আমার পণ' কবিতাটি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। উপস্থাপন করেছে নিজেদের মতো করে।

যেমন-

ভাই বোন সবারে
যেন ভালবাসি
একসাথে থাকি যেন
সবে মিলে মিশি
ভালো ছেলের সাথে
মিশে করি খেলা,

এ-রকম চিত্র অধিকাংশ প্রকাশনা সংস্থার বইয়েই। অনেকেই কবি নজরুল ইসলাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সুকুমার রায়-এর কবিতা ও ছড়ার মূল রূপ পরিবর্তন করে নিজেদের মতো করে সাজিয়েছে। ইংরেজি, অংক, পরিবেশ পরিচিতি, বিজ্ঞান সব ক্ষেত্রেই একই অবস্থা। এই প্রতিবেদনে ২/১টি

www.pathagar.com

বিষয়ে উদাহরণ টানা হলো মাত্র।

শিশুতোষ পাঠ্যপুস্তকে এ জাতীয় ভুল-ভ্রান্তি দেখার দায়িত্ব অবশ্যই সরকারের। অথচ সরকারের এ ব্যাপারে কোনো নজরদারি কিংবা খবরদারি নেই। এমনও দেখা গেছে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত বই, সেখানেও তথ্যগত ও অশুদ্ধ বানান।

এ ব্যাপারে এখনই যদি সরকার দৃষ্টি নিবদ্ধ না করেন, তাহলে আমাদের কোমলমতি শিশুরা যেভাবে নানারকম, আজগুবি তথ্য ও তত্ত্বের ভারে 'জ্ঞান বিভ্রাট' এ আটকে যাচ্ছে, যা থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় আছে কিংবা থাকবে বলে মনে হয় না।

তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এখনই কিন্ডারগার্টেন বইয়ের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ না করলে শিশুদের শিক্ষার ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ডুবে যেতে বাধ্য।

সরকারে দৃষ্টিভঙ্গি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা নিয়ে সরকারের সুনির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা এখন পর্যন্ত চোখে পড়েনি। যদিও কয়েক বছর আগে। সরকারের মন্ত্রি পরিষদের এক বৈঠকে কিন্ডারগার্টেনসহ বেসরকারি সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রেজিস্ট্রেশন অধ্যাদেশ সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। উক্ত রেজিস্ট্রেশন প্রস্তাব অধ্যাদেশ-এ উল্লেখ করা হয়, একটি বিদ্যালয় রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রতিষ্ঠানের নামে নিজস্ব সম্পত্তি বাধ্যতামূলক।

এ আদেশ বলবৎ করলে দেশের সিংহভাগ কিন্ডারগার্টেন ও প্রি-ক্যাডেট স্কুল বন্ধ হয়ে যাবে। তাই সরকার এ আদেশ বলবতের আগে নতুন করে ভেবে দেখছেন। যদিও এ ব্যাপারে বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন এসোসিয়েশন দাবি—কিন্ডারগার্টেন, প্রি-ক্যাডেট ও সমমানের বিদ্যালয়সমূহকে প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে রেজিস্ট্রেশন না দিয়ে সহজ শর্তে কিন্ডারগার্টেন স্কুল হিসেবে রেজিস্ট্রেশনের অনুমতি প্রদান এবং উক্ত বিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়নরত ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বোর্ডের বই প্রদানসহ ৫ম ও ৮ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তিপরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া।

পরিশেষে

বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও শিক্ষার মানোন্নয়নে যেহেতু কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোর একটা অংশীদারিত্ব বজায় রয়েছে এবং শিক্ষা বিস্তারে কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোর ভূমিকা খাটো করা যাবে না, তাই সরকারের উচিত কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোর ব্যাপারে স্বচ্ছ ও সুদূরপ্রসারী কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করা। এ ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোর দাবি 'কিন্ডারগার্টেন পরিচালনা বোর্ড' গঠন অনেকটা যুক্তিযুক্ত। এই বোর্ড কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোর ভালোমন্দ দেখাসহ পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যসূচির মান নিরূপণে সজাগ দৃষ্টি রাখবে।

পাশাপাশি কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোর উদ্দেশ্যও থাকতে হবে মহৎ। যেমন কেউ-কেউ মনে করেন শিক্ষাকে বাণিজ্য হিসেবে দেখা দোষের কিছু নয়। কিন্তু শিক্ষা প্রদানের নামে অসৎ বাণিজ্য অবশ্যই দোষণীয় এবং অপরাধের সামিল। যে-কোনো পণ্যের বাণিজ্য থেকে শিক্ষা বাণিজ্যকে আলাদা হিসেবে দেখতে হবে সবসময়। এই আলাদা ব্যাপারটি হতে হবে মহৎ, সৎ, বস্তুনিষ্ঠ এবং জাতির উন্নয়ন ভবিষ্যত প্রজন্মকে মেধাবী ও মননশীল হিসেবে গড়ে তোলতে বিকাশে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেওয়া।

www.pathagar.com

শিক্ষা বাণিজ্যে কিন্ডারগার্টেন স্কুল ॥ দুই

প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে কেজি শিক্ষার গুরুত্ব বেশি হলেও আমাদের দেশে ইদানীং পিতামাতা-অভিভাবকগণ সন্তানদেরকে কেজি স্কুলে ভর্তি করেন নানাবিধ কারণে। এই নানাবিধ কারণগুলো হচ্ছে—

১. ভালো কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির আগে সন্তানের মেধাকে শাণিত করার লক্ষ্যে কেজি স্কুলে ভর্তি করানো।
২. প্রতিবেশীর সন্তান কেজি স্কুলে পড়ে তাই আমারটাকেও দিতে হবে জাতীয় প্রতিযোগী মনোভাব।
৩. শিশুদের মানসিক গঠন অনুযায়ী শিক্ষা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।
৪. সাধারণ শ্রেণীর ধারণা কেজি স্কুলে ভর্তি করা গেলে সন্তান ইংরেজি বিষয়ে দ্রুত অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবে।
৫. ভালো কোনো স্কুলে ভর্তি করতে না পেরে কেজি স্কুলই আপাত আশ্রয়স্থল হিসেবে গণ্য করে।
৬. কেজি স্কুলে প্রি-স্কুল শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে।

অর্থাৎ, কেজি স্কুলে সন্তানকে ভর্তি করানো মানে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার পদক্ষেপ গ্রহণই অধিকাংশ অভিভাবকদের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। অথচ শিশুজীবনের প্রথম পাঁচবছরকে মনোবিজ্ঞানীরা মানবজীবনের গঠনমূলক সময় হিসেবে অভিহিত করেছেন। কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা এমন একটি শিশু বান্ধব (Child Friendly) প্রক্রিয়া যা প্রত্যেক শিশুর জন্ম থেকে আট বছর বয়স পর্যন্ত দৈহিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের জন্য কাজ করে। এই সময়ে শিশুরা থাকে কাদার মতো নরম। এ বয়সে শিশুর শারীরিক অভ্যাস, মানসিক ও সামাজিক ব্যবহার একটি নির্দিষ্টরূপ পেতে থাকে। এই সময়ে শিশুর জন্য সৃষ্ট পরিবেশের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করেই তার ভবিষ্যত জীবনের ভিত রচিত হয়। এ সত্যকে সামনে রেখে বহুবছর ধরে শিক্ষাবিদগণ গভীর মনোনিবেশ সহকারে শিশু শিক্ষার আকৃতি ও প্রকৃতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে শিশুদেরকে কিভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় তার স্বরূপ আবিষ্কারের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত রয়েছেন। শিশুদের ব্যক্তিত্বের পার্থক্যকে স্বীকার করে নিয়ে তাদের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনই এ প্রচেষ্টার মূল বিষয়।

www.pathagar.com

আমাদের দেশের কিন্ডারগার্টেন পাঠ্যবইয়ের অবস্থা দেখলে মনে হয় এ শিক্ষার বিকৃতির চরমরূপ নিয়েছে। অগোছালো, হযবরল বাণিজ্যিক অধিকাংশ সকল কিন্ডারগার্টেন গড়ে উঠেছে। সুষ্ঠু নিয়মনীতির কোনো বালাই এখানে নেই। হরেকরকম পাঠ্যবইগুলোতে শিশু মনোবিজ্ঞানির দিকগুলো একেবারেই অনুপস্থিত। কিন্ডারগার্টেনের নামে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক ক্লাশ পর্যন্ত পড়ানো হচ্ছে। অথচ এখানে শুধু শিশুদের পড়াশোনার ব্যবস্থাই থাকার কথা, সেটাই তো কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাদর্শন।

জার্মান শব্দ Kindergarten-এর ইংরেজি অর্থ হচ্ছে The Children Garden (শিশুদের বাগান) জার্মান দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ ১৮৩৭ সালে এ প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করেন। শিশুশিক্ষাবিদ Froebel গতানুগতিক বিদ্যালয়গুলোর সমস্যা স্বকীয়ভাবে উপলব্ধি করেন এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যানিকেতনের জন্য বিদ্যালয় (School) শব্দটি ব্যবহার করতেও অনীহা প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, শিশুদেরকে বাগানের অগণিত চারা ও ফুলের সঙ্গে তুলনা করা চলে। ফোয়েবেলের শিশু উদ্যানে থাকবে না বইখাতার বহর, শিশুরা ঘরের চেয়েও অধিক আদর যত্ন ও স্নেহমমতায় খেলবে মনের আনন্দে। নানাধরনের খেলাধুলার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে জন্ম নিবে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ। কেটে যাবে স্কুলভীতি। শিশুরা খেলবে, আনন্দ করবে এবং শিখবে।

বাংলাদেশে কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষার ভিন্নচিত্র, বিকৃত চিত্র লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেশে কেজি শিশুদের ভারীভারী একগাদা বই দেওয়া হয়। আর না দিয়েই বা উপায় কী। অধিকাংশ কিন্ডারগার্টেনের প্রতিষ্ঠাতা কাম প্রিন্সিপাল টাকা কামানোর লোভে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বই পাঠ্যতালিকায় দিয়ে থাকেন। বই যত বেশি টাকা তত বেশি। ফলে বাড়ির কাজও এত বেশি যে, শিশুকে রীতিমতো গবেষণায় বসার মতো অবস্থায় পড়তে হয়। কিন্তু কেজি শিক্ষাদর্শন অনুসারে তো পাঠ্যবইয়ের গুরুত্ব থাকার কথা নয়। একটি শিশু প্রথম শ্রেনী পর্যন্ত বারো'শ থেকে পনের'শ শব্দ নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে আসে। তাই কেজি পাঠ্যবই যদি প্রণয়ন করতেই হয় তাহলে তা শিশুর মানসিক, বয়স ও সামর্থ্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণভাবে করতে হবে। শিশুর পাঠ্যবই হবে প্রজাপতির মতো বর্ণিল। অর্থাৎ বইয়ের ছবি, অংকন, প্রচ্ছদ, রং, বর্ণ, বাক্য সবকিছুই চিত্তাকর্ষক এবং মনোগ্রাহী হবে। ভাষা হবে সহজ, বিষয় হবে উদ্দিপ্তকারী। যেমন-রক্ত না হয়ে হবে রক্ত। সহায়তাকারী হিসেবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন শিক্ষিকা থাকতে পারেন। শিক্ষা মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কেজি বই রচিত হওয়া উচিত এবং তার শিখণ শিক্ষণ প্রক্রিয়া পরিচালিত হওয়া উচিত। যদিও শিশুদের পাঠ্যবই রচনা ও মূল্যায়নের পক্রিয়াগত কোনো ইন্সটিটিউশন গড়ে ওঠেনি আমাদের দেশে; কেবলমাত্র দু একটি কর্মশালা,

www.pathagar.com

সেমিনারই যা মাঝেমধ্যে সরকারি কিংবা বেসরকারিভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এতে কাজ উদ্ধার হওয়ার কোনো কারণ নেই। আমি মনে করি শিশুদের বই রচনায় একজন মনোবিজ্ঞানীর রূপরেখা অনুয়ায়ী সাজানো কিংবা আঁকা-লেখা হওয়া দরকার। এক্ষেত্রে একজন শিক্ষিকা যদি শিশুশিক্ষা ও শিশুমনোবিজ্ঞানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন তাহলে কেজিশিক্ষা অনেকাংশে বিজ্ঞানসম্মত ও কার্যকর হবে। কেননা শিক্ষিকা মায়ের মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালোবাসা, আদর-সোহাগে ভরে দিবেন শিশুর মন। সেজন্য মাস্টার্স ডিগ্রিধারী পণ্ডিতের প্রয়োজন পড়ে না। অথচ কেজি বইয়ের যে তালিকা এবং Content-এর যে Load তা দেখে বিস্মিত হতে হয়।

বাংলাদেশে তিন ধরনের কিন্ডারগার্টেন আছে। বাংলা মিডিয়াম, ইংরেজি মিডিয়াম এবং ধর্মীয় ভাবধারায় পরিচালিত কিন্ডারগার্টেন। এই তিন ধরনের কিন্ডারগার্টেনে পাঠ্যবই পাঠ্যসূচি ও লেখাপড়ার কোনো মিল নেই। প্রকৃতপক্ষে কিন্ডারগার্টেনগুলোর একটির সঙ্গে আরেকটির শিক্ষাপদ্ধতিরও মিল নেই। বাংলা মাধ্যমের কিন্ডারগার্টেনগুলোতে সাধারণত তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে বইপত্র পড়ানো হলেও তৃতীয় শ্রেণী হতে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষার বইপত্র পড়ানো হয়। ইংরেজি মাধ্যমের কিন্ডারগার্টেনগুলোতে বিদেশী পদ্ধতির এক জগাখিচুড়ি অবস্থা চলছে। অধিকাংশ স্কুল নিজেদের বইকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। এসব স্কুলের পাঠ্যসূচীতে ধারাবাহিকতার অভাব পরিলক্ষিত। অভাব জাতিতত্ত্বের। দৃষ্টির, কালচারের। অন্যদিকে ধর্মীয় ভাবধারার কথা বলে পরিচালিত কিন্ডারগার্টেনগুলোতে পাঠ্যবই সরবরাহের দায়িত্ব পালন করে থাকে মূলত জামাতের শিক্ষাবিষয়ক সংগঠন ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি। এসব কিন্ডারগার্টেনগুলো প্রিপারেটরী, নার্সারি বা কেজি স্কুল নামে পরিচিত। এসব প্রতিষ্ঠানগুলোর বিচিত্র ধরনের নামের সঙ্গে ক্লাশ বা শ্রেণীর নামকরণেও জগাখিচুড়ি অবস্থা। বাংলা মাধ্যমের কোনো কোনো কিন্ডারগার্টেনের (কেজির) বাংলা নাম 'শিশুশ্রেণী' কোনো কোনোটি আবার ইংরেজি 'প্লেগ্রুপ', কেজি ইত্যাদি নামও রাখা হয়। ক্লাশ বা শ্রেণীর কোনো সামঞ্জস্য নেই। কোনো কোনো কিন্ডারগার্টেনে প্রথম শ্রেণী বা স্ট্যান্ডার্ড ওয়ানের আগে তিনটি শ্রেণী আবার কোনোটিতে দুটি শ্রেণী আছে। অর্থাৎ, প্রথম শ্রেণী বা স্ট্যান্ডার্ড ওয়ানের আগে শিশুকে কিন্ডারগার্টেনগুলোতে তিনটি বা দুটি শ্রেণীতে তিন বা দু'বছর পড়তে হয়। বইয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায়, একটি বই কোনো এক স্কুলে প্লে-গ্রুপে পাঠ্য করা হয়েছে, একই বই অন্য কোনো স্কুলে ক্লাস ওয়ানে পড়ানো হচ্ছে। এ অসামঞ্জস্যের ফলে অভিভাবকরা বিশেষ প্রয়োজনে বা অবস্থানগত বদলির কারণে এক কিন্ডারগার্টেন থেকে অন্য কিন্ডারগার্টেনে শিশুদের ভর্তি করাতে গেলে সমস্যায় পড়েন। কেজি

www.pathagar.com

শিক্ষার এ দূরবস্থার জন্য সরকারি সুষ্ঠু নীতিমালার অভাব, উদাসীনতা এবং অভিভাবকদের মনমানসিকতা দায়ি।

কেজি স্কুলগুলো কোনো নীতিমালার দ্বারা পরিচালিত হয় না। প্রতিষ্ঠানগুলোতে অবাধে মাধ্যমিক এমনকি উচ্চমাধ্যমিক ক্লাশ পর্যন্ত পড়ানো হচ্ছে। ফলে এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা দেয় অন্য কোনো রেজিস্টার্ড বা অনুমোদিত বিদ্যালয়ের অধীনে। এ নিয়ে একধরনের দুর্নীতি ওপেনসিক্রেট। বেসরকারি স্কুল-কলেজের প্রধানদের নিয়মিত উৎকোচ প্রধান করে থাকে কিন্ডারগার্টেনগুলো। সরকারি কর্মকর্তারাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই উৎকোচ সম্পর্কে জ্ঞাত থাকেন বলে খবরদারির দরকার মনে করেন না।

কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা থাকবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। অথচ সেখানে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত চালাচ্ছে। এর পেছনের কারণ, আমাদের অর্থ সামাজিক অবস্থা, সুশাসনের অভাব, আর অপরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থা। কিন্ডারগার্টেন ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো দীর্ঘদিন থেকে অনুমোদিতভাবে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে গেলেও তা নিয়ে প্রশাসনের কোনো মাথাব্যথা নেই।

১৯৭৩ সাল থেকে বাংলাদেশে ইংলিশ মিডিয়াম লেখাপড়া শুরু হয়। তখন সিদ্দিক টিউটোরিয়াল নামে একটিমাত্র ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ছিল। পরে এক এক করে বেড়েছে স্কুলের সংখ্যা। বর্তমানে ঢাকায় আছে প্রায় অর্ধ শতাধিক ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। এ স্কুলগুলোতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে। বেশিরভাগ কিন্ডারগার্টেন তথা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের পাঠ্যবই বিদেশি। ফলে এসব প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা দেশীয় ঐতিহ্য ও চিন্তাচেতনার বদলে বিজাতীয় ভাবধারায় গড়ে উঠছে। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে যেসব পাঠ্যবই আছে তার মধ্যে ওরিয়েন্টাল ল্যাঙ্গুয়েজ নামে একটি বইয়ের মধ্যে বাংলাদেশের পরিচিতিমূলক একটি অধ্যায় আছে। তা ছাড়া অন্যান্য সব পাঠ্যবই-ই ইংল্যান্ডের। ফলে কিন্ডারগার্টেন ছাত্রছাত্রীরা পাঠ্যবইয়ে বাংলাদেশের ইতিহাস ঐতিহ্যের বদলে পড়ছে ইংল্যান্ডের ইতিহাস।

মাতৃভাষা ব্যতিরেকে শিক্ষা সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়। মনোবিজ্ঞানিকভাবে শিক্ষা দিতে চাইলে অবশ্যই কেজি শিক্ষা মাতৃভাষায় হতে হবে। কেননা মাতৃভাষা ছাড়া মানুষ/শিশু চিন্তা করতে পারে না। শিশুর চিন্তন, শিখন প্রক্রিয়ার কাঠামো গড়ে ওঠে মাতৃভাষার ভিত্তিতে। ‘কেননা শিশুদের ভাষা অর্জনের ব্যাপারটি রহস্যঘেরা। রহস্য-উন্মোচনের জন্য বিদ্বানেরা একাধিক মতবাদ গড়ে তুলেছেন। এর মধ্যে তিনটি মতবাদই সবচেয়ে বেশি আলোচিত। এক. আচরণিক মতবাদ (Behavioristic Theory, দুই সাহজাত্যিক মতবাদ

www.pathagar.com

(Nativistic), তিন. বোধাত্মক মতবাদ (Cognitive Theory)।' রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আগে চাই মাতৃভাষার গাঁথুনি পরে ইংরেজি শিক্ষার পত্তন।' রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধটি পড়ার পর বাংলাদেশের কেজি শিক্ষা বা কেজি পাঠ্যবইয়ের অবস্থার কথা চিন্তা করলে ভড়কে উঠতে হয়। কেজি শিক্ষার নামে যে ইংরেজি শিক্ষা বিকশিত হয়েছে, যেভাবে ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা গড়ে উঠেছে তা ভাবলে কষ্ট লাগে। এই ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা একটি শ্রেণী বৈষম্য সৃষ্টির মাধ্যম। শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের ফলে উচ্চবিত্তের জন্য গড়ে উঠেছে এ শিক্ষা। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে ৬ হতে ১৪ হাজার টাকা বেতন দেওয়া হয় একজন শিক্ষককে।

ইদানীং উচ্চবিত্ত সমাজে সন্তানকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ানো স্ট্যাটাস রক্ষার উপায় হিসেবে ভাবা হয়। বাংলা ভুলে গিয়ে ইংরেজি না শিখতে পারলে এটা কোনো শিক্ষা হলো? এই হলো স্ট্যাটাস রক্ষাওয়ালাদের দর্শন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাংলা একাডেমীতে একুশের বইমেলায় কোনো এক স্টলে এক বাঙালি অভিভাবক এসে স্ট্যান্ডার্ড ফোরে পড়ুয়া ছেলের জন্য হন্য হয়ে ইংরেজি গল্পের বই খুঁজছিলেন। তাকে ইংরেজি গল্পের বই না দিতে পেরে বিকল্প হিসেবে বাংলা ভাষায় রচিত গল্পের বই নেওয়ার অনুরোধ করলে তিনি গর্ব করে বললেন, 'আমার ছেলে বাংলা পড়তে পারে না।'

এই হলো তথাকথিত ইংরেজি শিক্ষিত ভদ্রলোকদের দম্ভ। নিজ ভাষাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ভিনদেশী ভাষা নিয়ে ঠুনকো লাফালাফি। বলছি না, ইংরেজি ভাষা শেখার দরকার নেই। অবশ্যই দরকার আছে। আমি এও বলছি না যে, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল উঠে যাক। আমার কথা হচ্ছে, যথাযথ ও গুণগত ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া হোক। এবং ইংলিশ মিডিয়ামেও নিজ দেশের কৃষ্টি-কালচার, ইতিহাস-ঐতিহ্য শেখানো সম্ভব। যেখান থেকে যা প্রয়োজন, যতটা প্রয়োজন উন্নত শিক্ষাব্যবস্থার জন্য; তা গ্রহণ করা যেমন দোষণীয় নয়; তেমনিভাবে দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য কৃষ্টি-কালচার বাদ দিয়েও শিক্ষার পূর্ণতা আশা করা সম্ভব নয়।

তাই এ ব্যাপারে সরকারের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বাস্তবসম্মত বিধি প্রণয়ন করা উচিত। সেই সাথে ইংলিশ মিডিয়াম নামক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তৃপক্ষেরও দায়িত্ব এড়ানোর সুযোগ নেই। কেননা, অন্য অনেক বাণিজ্য থেকে শিক্ষা বাণিজ্য সম্পূর্ণ আলাদা।

জামাতে ইসলামি ভাবধারায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত কিন্ডারগার্টেনগুলোতেও দেশের প্রকৃত ঐতিহ্য ও চিন্তা চেতনার বদলে নিজস্ব (জামাতের) ভাবধারার বই পড়ানো হয়। জামাতের ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি প্রণীত এসব পাঠ্যবই

www.pathagar.com

এমনভাবে প্রণীত, যাতে ইসলামের নামে শিশুদের মধ্যে জামাত-শিবির সম্পর্কে ভালো ধারণা গড়ে ওঠে এবং পরবর্তীকালে এর সঙ্গে যুক্ত হয়। শিক্ষাকে সঠিক পথে চালানোর সরকারি উদ্যোগ কোনো আমলেই সঠিক নয় এবং আন্তরিক নয়।

সরকার ১৯৯৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ড. তহমিনা হোসেনের নেতৃত্বে ১১ সদস্যের কমিটি গঠন করেছিল। কমিটি কিন্ডারগার্টেন ধরনের প্রতিষ্ঠান যেমন- ইংরেজি ও বাংলা মিডিয়াম, নার্সারি, প্রিপারেটরি ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোর সঠিক তথ্য সংগ্রহ করে নীতিমালা প্রণয়ন করবে। কমিটি ১৯৯৭ সালের প্রথম দিকে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ নেয়। প্রাথমিক তথ্যের মধ্যে ছিল স্কুলের নাম ঠিকানা, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা, স্কুলপ্রধানের নাম সংগ্রহ। এজন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়। এ জরিপের মূল দায়িত্ব দেওয়া হয় দেশের সকল জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারকে। প্রাথমিক তথ্য সংগৃহীত হয় মাত্র ১৬৭৩টি প্রতিষ্ঠানের। পরবর্তী সময়ে এসব প্রতিষ্ঠানের পূর্ণাঙ্গ জরিপ করার জন্য ৬ পৃষ্ঠার একটি জরিপ ফরমও তৈরি করা হয়। এটি পূরণ করার জন্য মন্ত্রণালয় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়। প্রথমদিকে সময় ছিল ৩০ এপ্রিল। পরবর্তীকালে সময় বর্ধিত করা হয় ৩০ মে পর্যন্ত। কিন্তু তাতেও সাড়া পাওয়া যায়নি। অথচ ধারণা করা হয় দেশে ৫০০০ অধিক কিন্ডারগার্টেন রয়েছে। শুধু ঢাকা শহরেই এর সংখ্যা ২০০০-এর কাছাকাছি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারাও তা স্বীকার করেন। কিন্তু যেসব প্রতিষ্ঠান এ জরিপ ফরম পূরণ করেননি অর্থাৎ, তথ্য দেননি তাদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে তার সিদ্ধান্ত মন্ত্রণালয় আদৌ নিতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে কিন্ডারগার্টেনগুলোর বেশিরভাগই প্রভাবশালী ব্যক্তিদের আত্মীয়স্বজন দ্বারা পরিচালিত। ব্যানবেইস এর সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তা জানান, তারা এ পর্যন্ত গোটাদেশের মাত্র ৬০৭টি প্রতিষ্ঠানের জরিপ ফরম পেয়েছেন। অনুসন্ধানে জানা যায়, ৮০'র দশকে কিন্ডারগার্টেন্ প্রতিষ্ঠার হিড়িক পড়ে যায়। তখন থেকেই সরকার এগুলোর কর্মতৎপরতার ব্যাপারে কোনো দায়িত্ব অনুভব করেননি। অথচ স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই প্রি-প্রাইমারি বা প্রাকপ্রাথমিক থেকে যেকোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে

'বাজারে প্রচলিত কেজি বইগুলোর অনেকটাই অন্ত:সারশূন্য। লেখার অসামঞ্জস্যতা, নিম্নমানের ছবি কিংবা ভুল তথ্য বইগুলোতে প্রায়সই লক্ষ্য করা যায়। ফলশ্রুতিতে দেশীয় বইয়ের পাশাপাশি আমরা পার্শ্ববর্তী দেশের বইও পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত করি।'

মিসেস হামিদা হক

অধ্যক্ষ, অশ্বিনী কুমার শিশুনিকেতন, বরিশাল

www.pathagar.com

'রেজিস্ট্রেশন অব প্রাইভেট স্কুল অর্ডিন্যান্স ১৯৬২' আইন চালু ছিল যা এখনো বহাল আছে। ঐ আইন অনুযায়ী যেকোনো ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে গেলে প্রথম শর্ত হচ্ছে ঐ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জমি থাকতে হবে; দ্বিতীয়ত, একটি পরিচালনা পরিষদের মাধ্যমে ঐ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালিত হতে হবে, যে পরিচালনা পরিষদে সরকারেরও একজন প্রতিনিধি থাকবে। ফলে দেখা যায় ঐ তিনটি শর্ত অনুযায়ী অননুমোদিতভাবে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চলতে পারে না। অথচ এদেশের কিন্ডারগার্টেনগুলো ভাড়া করা বাড়িতে চলে। এমনও দেখা যায়, তিনতলা ভবনের নিচতলা ও তৃতীয় তলায় কোনো পরিবার বাস করলেও দ্বিতীয় তলায় স্কুলের কার্যক্রম চলছে।

'৬২ সালের আইনের ব্যর্থতা দেখে এরশাদ সরকার কিন্ডারগার্টেন ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলো নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য 'দ্য মার্শাল ল' ইনভেস্টিগেশন টীম অব প্রাইভেট স্কুল' নামে একটি কমিটি গঠন করেছিল ১৯৮৩ সালে। এর প্রধান ছিলেন তৎকালীন ব্রিগেডিয়ার সরদার আলী আহসান। এই কমিটি রাজধানী ঢাকার বেশ কিছু কিন্ডারগার্টেন জাতীয় প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে একটি তদন্ত রিপোর্ট দেয়। কিন্তু তা পরে ধামাচাপা পড়ে যায়। '৮৩ সালের পরে ১৯৮৯ সালেও নতুন অ্যাক্ট হয় ১৯৬২ সালের অ্যাক্ট পরিবর্তন করে। এ নতুন আইনেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিজস্ব বাড়ি, নিজস্ব পরিচালনা পরিষদ এবং ঐ পরিষদের মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা— এই তিনটি শর্তই বহাল ছিল। তখন ঐ আইনের ভিত্তিতে কিন্ডারগার্টেনগুলোর রেজিস্ট্রেশন প্রদান শুরু হয়। সে সময়ে প্রায় ১৫০টি এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান রেজিস্ট্রেশন নেয়। অনেকে নানা আশঙ্কায় তাদের প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন করায়নি। ১৯৯১ সালে কেজি স্কুলের রেজিস্ট্রেশন বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে এ বিষয়ে আর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

কেজি শিক্ষাকে আধুনিক শিশু মনোবিজ্ঞানভিত্তিক করার জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনও সুপারিশ করেছেন। কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনে শিশুদের জন্য 'শিশুভবন', 'শিশুউদ্যান' স্থাপনের সুপারিশ করেছিলেন। শিশুশিক্ষা ও শিশুমনোস্তত্ত্ব সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় গবেষণা পরিচালনা করে দেশে বিজ্ঞানসম্মত শিশুশিক্ষা বা কেজিশিক্ষা প্রণালি প্রবর্তন করা ইত্যাদির জন্য একটি শিশুশিক্ষা গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলে খুদা কমিশন। এই ইনস্টিটিউট স্থাপন না হওয়া পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমীতে শিশুশিক্ষা বিভাগ এর কাজ চালিয়ে নেওয়ার সুপারিশ করেন। কিন্তু '৭৫-এর পর কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমীতে (NAPE) এখন পর্যন্ত শিশুশিক্ষা বিভাগ খোলা হয়নি। অন্যদিকে বেসরকারি পর্যায়ে Institute of Child Education (ICE) নামে

www.pathagar.com

১৯৯৭ সাল থেকে শিশুশিক্ষার ওপর কোর্স চালু করেছে। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক কমিটি ১৯৯৭ তাদের প্রতিবেদন সরকারের কাছে জমা দিয়েছেন। প্রাথমিক শিক্ষাকে আধুনিকায়ন করার জন্য এই প্রতিবেদন বাস্তবায়ন হলে প্রাথমিক শিক্ষা মানসম্মত পর্যায়ে পৌঁছাবে বলে তৎকালীন কমিশন আশা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে আমাদের সবকিছুই পরিবর্তনের হিড়িকে এটিও ধামাচাপায় পড়ে যায়। তবে প্রাথমিক শিক্ষাবিষয়ক কমিটি প্রাকপ্রাথমিক বা কেজিশিক্ষার জন্য কোনো ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠায় সুপারিশ করেননি এবং জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০, যা মহান সংসদে পাস হয়েছে সেখানে প্রাকপ্রাথমিক শিক্ষা বা কেজিশিক্ষার ওপরে কোনো দিকনির্দেশনা নেই। এ নীতির সঙ্গে জড়িতরা কেজিশিক্ষার আধুনিক ধ্যানধারণা সম্পর্কে অবগত ছিলেন না।

সবার জন্য শিক্ষা : ২০০০ সালের মূল্যায়নের অংশ হিসেবে ডাকার সম্মেলনে উপস্থাপিত বাংলাদেশ প্রতিবেদনে শিশুশিক্ষা কর্মসূচিকে যে লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে এই কর্মসূচির মাধ্যমে শিশুদের দৈহিক ও মানসিক বিকাশ নিশ্চিত করে তাদের যথাযথ দক্ষতা দৃষ্টিভঙ্গি ও অভ্যাস অর্জন দ্বারা স্কুলের জন্য প্রস্তুত করা। ২০০০ সালের মধ্যে চার পাঁচ বছর বয়সী শিশুশ্রেনীর বয়সের শিশুসংখ্যা ছিল প্রায় ৮.৪০ মিলিয়ন। সব প্রাথমিক স্কুলের শিশুশ্রেণীর শিশুদের এ কার্যক্রমের আওতাভুক্ত করা হলে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বর্তমান হারের প্রেক্ষিতে প্রায় ৪.২০ মিলিয়ন শিশু এই কর্মসূচির আওতায় আসবে।

আলোচ্য নিবন্ধে সচেতনতার ও অভিজ্ঞতার অভাব, উপাত্তের ও প্রতিষ্ঠানের অভাব শিক্ষাসামগ্রী ও প্রশিক্ষিত শিক্ষিকার অভাবকে এই শিশুশিক্ষার/পূর্বপ্রস্তুতিমূলক শিক্ষার বাধা হিসেবে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ ছাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুশ্রেণীতে শিশুর বিকাশমূলক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে একটি বই প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এই শ্রেণীতে আরও কার্যকর শিশুশিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। এটি সরকারের একটি প্রশংসিত পদক্ষেপ। বিশ্বের আধুনিক শিক্ষাধারণার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার

'বলতে সংকোচ নেই, বাজারে যেসব বই 'কেজি বই' হিসেবে চিহ্নিত, তার অধিকাংশই বাস্তবতা বিবর্জিত, অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার ফলশ্রুতি। অনেক প্রকাশনা সংস্থা প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করে রং চঙা একটি অন্তসার শূন্যজ্ঞানশূন্য বই প্রকাশ করে বাজারজাত করেন এবং বিক্রয় প্রতিনিধিরা এসে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্ণা দেন, তখন দারুন একটা দুঃখবোধ আমাদেরকে ব্যথীত করে।'

মিসেস জাহানারা বেগম
অধ্যক্ষ, অমৃতলাল শিশুকানন, বরিশাল

www.pathagar.com

পদক্ষেপ এটি। কিন্তু বাংলাদেশে বিরাজমান কিন্ডারগার্টেন জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং কেজি বই ও পাঠ্যপুস্তক নিয়ন্ত্রণের আশু প্রদক্ষেপ প্রয়োজন। সরকার, অভিভাবক এবং শিক্ষাবিদসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবশ্যই জাতির মঙ্গলের কথা চিন্তা করতে হবে। কেজি শিক্ষাকে বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক করার ক্ষেত্রে ভূমিকা নিতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে এও উপলব্ধি করতে হবে যে শিক্ষাব্যবস্থার প্রাণশক্তি বর্তমান থাকে পাঠ্যসূচী, পাঠ্যক্রম, পাঠদান পরিবেশ ও শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে। আর এই উপলব্ধি যথাযথ এবং আন্তরিক হলেই যে মাধ্যমেই শিক্ষা প্রদান করা হোক না কেন তা পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার রূপ পাবে।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

শিক্ষা পদ্ধতি ও প্রস্তুতি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বৃত্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি-পাঁচালি

একজন শিক্ষার্থীর জীবনে প্রথম পাবলিক পরীক্ষা হলো এসএসসি। তবে এসএসসি পরীক্ষার পূর্বে সীমিত পর্যায়ের আরো দুটি পাবলিক পরীক্ষায় একজন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করতে পারে, সে দুটো পরীক্ষা হলো প্রাথমিক ও জুনিয়র পর্যায়ের বৃত্তিপরীক্ষা। তবে সকল শিক্ষার্থীর পক্ষে এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয় না, শ্রেণীতে যারা মেধাবী বলে প্রমাণিত হবে শুধু তারাই এই পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে।

আর এদের ভেতর থেকে যারা বিশেষভাবে মেধাবী বলে প্রমাণিত হবে শুধু তারাই বৃত্তি পাবে। তাই বৃত্তিপরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা ও বৃত্তি পাওয়া, প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাছে বিশেষ মর্যাদার। প্রতিবছর হাজার হাজার শিক্ষার্থী প্রাথমিক ও জুনিয়র পর্যায়ের বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়; তাদের উদ্দেশেই এই প্রতিবেদন।

দৃশ্যপট-এক ঃ চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। নিজের শরীর পর্যন্ত দেখা যায় না। এই অন্ধকারেই ওরা হাঁটছে পরিচিত কাঁচা মাটির ভঙ্গুর পথ ধরে। হাঁটতে সুবিধা নেওয়ার জন্য ওদের সকলের হাতে বাতাসে কম্পমান হারিকেনের আলো মিটমিট করে জ্বলছে। ওদের গন্তব্যস্থল গাজিপুরস্থ একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বাড়ি থেকে যার দূরত্ব আধকিলো। এই পথটুকুন ওদের প্রতিদিন হাঁটতে হয়। কারণ, ওরা প্রাইমারি বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে। সংখ্যায় ওরা পাঁচজন। ক্লাসের মেধাবী শিক্ষার্থী। বৃত্তি পরীক্ষা দেবে বলে লেখাপড়ার চাপটা একটু বেশি। স্কুলের স্যাররাও বিশেষ খেয়াল রাখছে ওদের প্রতি। বিশেষ কোচিং, স্টাডি ক্লাবে লেখাপড়া করাচ্ছে প্রতিদিন, প্রতি সন্ধার পর, স্কুলে। পরীক্ষার্থী শিক্ষার্থীরাও বই-খাতা-কলম বগলবন্দি করে স্বাচ্ছন্দে চলে আসে স্কুলে। আর দায়িত্ববান শিক্ষকরা ওদের বিশেষভাবে পড়াচ্ছেন, যাতে ওরা বৃত্তি পায়।

দৃশ্যপট-দুই ঃ অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী তানিয়া। ছোট ভাই স্বপন পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। দু'জনই মেধাবী। দু'জনই আসন্ন বৃত্তিপরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে। তাই ওদের লেখাপড়ার চাপটা একটু বেশি। ওদের দু'জনের জন্য একজন টিউটর রয়েছে। প্রতিদিন বিকাল চারটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত টিউটরের কাছে ওদের পড়তে হয়। এ ছাড়া প্রতি রাত বারটা পর্যন্ত তানিয়া পড়ে। স্বপন দশটা পর্যন্ত। নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান ওরা। একই টেবিলে ওদের পড়তে হয়। কিন্তু ইদানীং তানিয়া বেঁকে বসেছে, দু'জন এক রুমে এক টেবিলে বসে পড়া যায় না। ডিস্ট্রাব হয়। তাই স্বপনকে ট্রান্সফার করে অন্যরুমে নিয়ে যেতে হবে। তানিয়ার দাবি যুক্তিপূর্ণ হলেও দু'রুমের বাসায় স্বপনের ট্রান্সফার বিষয়ক জটিলতা দূর করতে হিমসিম খেতে হলো তানিয়ার বাবা-মাকে। শেষতক সিদ্ধান্ত হলো এই রুমেই

www.pathagar.com

দু'পাশে দুটো টেবিল থাকবে। দু'টেবিলে দু'ভাই-বোন পড়বে এবং স্বপনকে বলা হলো শব্দ কমিয়ে পড়তে। এভাবে একটি সমাধান খুঁজে বের করলেন নিম্নমধ্যবিত্ত তানিয়ার বাবা-মা। কিন্তু বাবা-মায়ের সিদ্ধান্তে তানিয়া-স্বপন কেউই মন থেকে একশ ভাগ সন্তুষ্ট হতে না পারলেও বাবার আয় রোজগারের কথা ভেবে লেখাপড়ায় মন দিয়েছে। কারণ, বৃত্তি পরীক্ষার সময়ও খুব দূরে নয়।

দৃশ্যপট-তিন ঃ বিশালকায় আলিশান একটি বাড়ি। উচ্চবিত্ত এক পরিবারের বাস এ বাড়িতে। দু'ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ির কর্তা মহাসুখে দিনযাপন করছেন। বাড়ির স্থায়ী সদস্য চারজন হলেও, চাকর-বাকর, পাইক-পেয়াদায় বাড়িটি সবসময় পূর্ণ। ফলে কোলাহল যেটুকু চাকর-বাকরদের জন্যেই। যদিও প্রচলিত কোলাহলে ইদানীং কিছুটা ভাটা পড়েছে ওপর মহলের নির্দেশে। মানে বাড়ির কর্তার কড়া হুকুম এ বছরের বাকি সময়টুকু এ বাড়িতে কোলাহল করা চলবে না। শব্দ করে কথা বলা যাবে না। এটা-সেটা আওয়াজ চলবে না। কারণ, এ বাড়ির বড় ছেলের সামনে বৃত্তি ও বার্ষিক পরীক্ষা। বড় ছেলের বৃত্তি পাওয়া না-পাওয়া এ বাড়ির স্ট্যাটাস রক্ষার বিষয় জড়িত। তাই ছেলের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে আলাদা আলাদা টিচার। প্রতিদিন দু'বেলা বৃত্তি কোচিং। ছেলের ব্রেন ঠাণ্ডা রাখতে খাবারের ভেন্যুতে সংস্কার সাধন। এ ছাড়া সার্বক্ষণিক তদারকির জন্য একজন ফুলটাইম শিক্ষক—ইত্যাদি ইত্যাদি আয়োজন বড় ছেলে যাতে ট্যালেন্টপুল বৃত্তি নিয়ে ফিরতে পারে—স্ট্যাটাস রক্ষার প্রধানতম হাতিয়ার এ মুহূর্তে এ বাড়ির বড় ছেলে।

প্রস্তুতি পর্ব-এক

উপরের দৃশ্যপট তিনটি পরীক্ষার পূর্ব প্রস্তুতির তিনটি কথ্যচিত্র। আমাদের সমাজেরই তিনটি অংশ। প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্যপটের সঙ্গে আমরা সকলেই কমবেশি পরিচিত। তৃতীয় দৃশ্যপট বিত্তবানদের একটি। যার সাথে পরিচয় খুব কমসংখ্যক লোকের।

কথ্যচিত্র তিনটি উল্লেখের কারণ এই যে, প্রাথমিক ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি সম্পর্কে শিক্ষার্থী-শিক্ষক-অভিভাবকদের সাথে আলাপ করতে গিয়ে শ্রেণীভেদে প্রস্তুতির ধরন যেমন জানা গেছে, তেমনি জানা গেছে আমাদের দেশে লেখাপড়া শিখতে নিম্নবিত্তদের প্রাণান্ত প্রচেষ্টার কথা। সবাই লেখাপড়া করতে চায়, শিখতে চায়। সব অভিভাবক অন্তত এটুকু ধারণা রাখে আজকাল সন্তানদের লেখাপড়া শেখানো ছাড়া কোনো গতি নেই। তবুও তাদের সন্তানরা লেখাপড়া শিখতে পারে না। শিখতে গিয়ে থেমে যায় বিদ্যার্জনের চাকা। কারণ, 'আমাদের দেশে লেখাপড়া শিখতে টাকা লাগে। বেশি বেশি টাকা।' গরিবদের বেশি বেশি টাকা নেই। ভাত-কাপড়ের সংস্থানের পরে লেখাপড়ার টাকা থাকে না। তাদের

www.pathagar.com

ভাষায়, স্কুলের বেতন বেশি, কাগজ-কলমের দাম অনেক। বছরের শুরুতে বইপত্র কিনতে গিয়ে জমি বন্ধক রাখতে হয়। হালের গরু বেচতে হয়। তাই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সন্তাদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। বিদ্যার্জনের চাকা থেমে যায়। এই চিত্র বাংলাদেশের আটষট্টি হাজার গ্রামের। এই চিত্র বাংলাদেশের।

প্রিয় পাঠক, প্রস্তুতি পর্বের প্রাক্‌কথন এভাবে না লিখলেও হয়তো হতো কিন্তু প্রতিবেদন তৈরি করতে গিয়ে মনে হয়েছে অংশবিশেষ হলেও একথাগুলো বলা উচিত। কেননা অনেক সত্য আছে যা ইচ্ছে করলেই চেপে রাখা যায় না।

প্রস্তুতি পর্ব-দুই

পর্যবেক্ষণ করে জানা গেছে, গ্রাম পর্যায়ের স্কুলগুলো থেকে শহরের স্কুলগুলোর প্রস্তুতি অনেক ভালো। শহরের অধিকাংশ স্কুলের শিক্ষকদের প্রায় একই কথা—'প্রস্তুতি অবশ্যই ভালো'। তবে ভালো স্কুলগুলোর ভালোর ফলাফল সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ, কোটাভিত্তিক ফলাফল নির্ধারণের কারণে ভিকারুন নিসা নূন স্কুলের মতো প্রতিষ্ঠানে থেকেও ১৯৯৯ সালের জুনিয়র বৃত্তিপরীক্ষায় ১০১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৮ জন ট্যালেন্টপুল, ৮ জন সাধারণ এবং প্রাইমারিতে ১১৫ জন পরীক্ষা দিয়ে ৩ জন ট্যালেন্টপুল ও ১ জন সাধারণ বৃত্তি পেয়েছে। এত কম পাওয়ার কারণ কোটাভিত্তিক ফলাফল নির্ধারণ।

যাক, আবারো প্রস্তুতির কথায় আসা যাক, রাজধানীর ভিকারুন নিসা নূন, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল, গভঃ ল্যাবরেটরি স্কুল, ধানমন্ডি বয়েজ স্কুল এবং উদয়ন স্কুল, জাতীয় স্কুলগুলোর প্রস্তুতি যে ভালো এ কথা স্বীকার করতেই হবে। তেমনি রাজধানীর বাইরে জেলা স্কুলের প্রস্তুতিও ভালো বলে স্বীকার করতে হবে। ভালো স্কুলের শিক্ষকদের সাথে আলাপ করে জানা গেছে, তারা বিশেষ প্রস্তুতি হিসেবে নিয়মিত ক্লাসের বাইরে কোচিং নিয়ে থাকেন। যদিও খোদ রাজধানীর একটি স্কুল কমলাপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক মুহাম্মদ কুদরত-ই-খুদা বলেছেন ভিন্ন কথা। 'আমার এলাকার লোকগুলো দারিদ্র্যসীমার মধ্যে বাস। আমার স্কুলে দরিদ্র, রিকশাওয়ালার সন্তানও আছে। তারা ঠিকমতো স্কুলের বেতন পর্যন্ত দিতে পারে না। তাদের প্রস্তুতি কেমন হবে বুঝতেই পারছেন।' কারণ হিসেবে মুহাম্মদ কুদরত-ই-খুদা বলেছেন, 'লেখাপড়া করতে আজকাল টাকা লাগে।' একই কথা প্রযোজ্য গ্রামের স্কুলগুলোর ক্ষেত্রে। গ্রামের স্কুলগুলোর চূড়ান্ত পরীক্ষা প্রস্তুতি বলতে নিয়মিত ক্লাসের বাইরে কখনো-কখনো কোচিং করানো হয় কিংবা বিশেষ ব্যবস্থাপনায় স্টাডি ক্লাবে লেখাপড়া করানো হয়। যা দৃশ্যপট এক-এ উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু শহরের স্কুলগুলোর পরীক্ষার্থীদের চূড়ান্ত প্রস্তুতি বলতে শুধু কোচিং-এ সীমাবদ্ধ নয়। শ্রেষ্ঠ স্কুলগুলোর শিক্ষার্থীরা মূলত উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত শ্রেণীর। তাই তাদের চূড়ান্ত প্রস্তুতি

www.pathagar.com

বলতে স্কুলে কোচিং-এর বাইরে বিশেষ কোচিং এবং বাসায় প্রতি বিষয়ে আলাদা আলাদা টিউটর। অবশ্য শ্রেষ্ঠ স্কুলগুলো সাপ্তাহিক ও মাসিক ক্লাস পরীক্ষা নিয়ে থাকেন শিক্ষার্থীদের।

বৃত্তিসংক্রান্ত সরকারি প্রজ্ঞাপন

প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতিতেই প্রাথমিক ও জুনিয়র বৃত্তিপরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রশ্ন প্রণয়নেও প্রচলিত পদ্ধতি মানা হয়। বৃত্তির টাকা নির্ধারিত '১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের মঞ্জুরি নং ৬৪ হিসাবের খাত ২৫ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৫৫৬০ কোডভুক্ত সাধারণ শিক্ষার জন্য অভ্যন্তরীণ মেধাবৃত্তির প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ হইতে মিটানো হইবে।' এ ছাড়া বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী যে-কোনো সরকারি/বেসরকারি স্কুলে বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ পাবে।

আর প্রাইমারি বৃত্তির টাকার হার আরো কম। বহু বছর যাবৎ একই হারে টাকা পেয়ে আসছে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা। যা খুবই অপ্রতুল বলে অভিযোগ করেছেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। অথচ প্রায় প্রতি বছর শিক্ষার্থীদের স্কুলের বেতন বাড়ছে। খাতা-কলমসহ শিক্ষা-উপকরনের দাম বেড়েই চলছে। বাড়ছে না বৃত্তির টাকা বাড়ছে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগসুবিধা। কোটার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। উল্লেখ্য যে, দেশের প্রতি ওয়ার্ড/ইউনিয়ন পর্যায়ে ১ জন ছেলে ও ১ জন মেয়ে সাধারণ বৃত্তি এবং মেধাবৃত্তির জন্য কিছু কোটা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। প্রতিবছর ছাত্রসংখ্যা বাড়লেও কোটা বাড়ছে না। চাকরীর কোটার মতো মেধার স্বীকৃতিতে কোটা মানে মেধাকে জোর করে মাটির নিচে চাপা দেয়া। একই কোটায় শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। প্রাইমারি ও জুনিয়র উভয় ক্ষেত্রেই। জুনিয়র বৃত্তিপরীক্ষায় ঢাকা অঞ্চলের গত তিন বছরের পরিসংখ্যান দেখলেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১৯৯৭ সালে ঢাকা অঞ্চলে জুনিয়র বৃত্তিপরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ২৯০২০ জন শিক্ষার্থী, ১৯৯৮ সালে ৩৩২১২ জন শিক্ষার্থী, ১৯৯৯ সালে ৩৮৪৫৬ জন শিক্ষার্থী এবং ২০০০ সালে ৪২০৯৭ জন শিক্ষার্থী অর্থাৎ, প্রতিবছরই প্রাথমিক ও জুনিয়র বৃত্তিপরীক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়লেও বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে তেমন কোনো তারতম্য নেই। এক্ষেত্রে একবছর কোটা বাড়লেও পরের বছর আবার কমেও যেতে পারে।

অবশ্য প্রাথমিক বৃত্তিপরীক্ষার ক্ষেত্রে ফলাফলের কোটা নির্ধারিত।

অবাক ব্যাপার এই যে ১৯৯৭ থেকে ১৯৯৯ এসে প্রাথমিক বৃত্তিপরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৭১,৫৬৭ জন বাড়লেও বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে মাত্র ২ জন। যদি এই হয়, আমরা মনে করি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ানোর কোনো যুক্তিকতা নেই। অথচ শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রত্যেক স্কুল থেকে ২০%

www.pathagar.com

শিক্ষার্থীকে বৃত্তিপরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করার আদেশের পাশাপাশি বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীর কোটা বাড়ানো উচিত।

পরিশেষে

জুনিয়র ও প্রাথমিক বৃত্তিপরীক্ষায় সব মহলের কাছে যে ব্যাপারটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয়েছে, তা হলো জুনিয়র ও প্রাথমিক উভয় ক্ষেত্রেই বৃত্তিপ্রাপ্তদের কোটা ও বৃত্তির টাকার ব্যাপারটি। যৎসামান্য কোটা নির্ধারণের কারণে বৃত্তিপরীক্ষা থেকে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ হারিয়ে যায়। লেখাপড়ায় অনাগ্রহ দেখা দেয়। বৃত্তির টাকাও খুবই অপ্রতুল। একজন অভিভাবকের ভাষায় 'আমি যা পেয়েছি, আমার সন্তানও তাই পাচ্ছে, অসুবিধা কি?' হাস্যোচ্ছলে জনৈক অভিভাবক মহোদয় এ কথাটি বললেও আমরা মনে করি এই বক্তব্য থেকে তার ভেতরের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে।

প্রতিবছরই, বাজেটে শিক্ষাখাতে সবচে বেশি বরাদ্দ রাখা হচ্ছে। এই বরাদ্দ কাগুজে বরাদ্দই যেন না হয়, তবেই হয়তো শিক্ষাখাতে বাজেটে অধিক বরাদ্দের যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যাবে। পাশাপাশি বৃত্তিপ্রাপ্তদের সনদ বিতরণের ব্যাপারটিও ভেবে দেখতে হবে। বৃত্তিপরীক্ষা যাতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাধারণত শিক্ষার জন্য অভ্যন্তরীণ মেধাবৃত্তির প্রকল্পেই বন্দি না রেখে ভবিষ্যতে সুশিক্ষিত, মেধাবী মুখ বেরিয়ে আসার পরিকল্পনাও থাকতে হবে বৃত্তিপরীক্ষার একটি প্রধান উদ্দেশ্য।

এজন্য চাই একটি সুনির্দিষ্ট, সংস্কারমূলক শিক্ষানীতি। এক্ষেত্রে পুরনো নীতিমালা পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে বৃত্তিপরীক্ষার জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত।

www.pathagar.com

এস. এস. সি পরীক্ষার প্রস্তুতি

পরীক্ষার পূর্ব প্রস্তুতি শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের জন্যই প্রযোজ্য নয়; শিক্ষক অভিভাবকদেরও জানা দরকার। কেননা, শিক্ষক প্রথমে জানবেন, পরে, শিক্ষার্থীকে শেখাবেন। সচেতন অভিভাবকরাও নিজের অভিজ্ঞতা থেকে, জানা থেকে সন্তানকে পরামর্শ দিয়ে শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারেন। চলতি প্রতিবেদনের উদ্দেশ্যও সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে এগিয়ে গেছে।

পরীক্ষার সময়সূচি হাতে পাওয়া মানেই শিক্ষার্থীর প্রহর গোনা শুরু প্রথম দিনের প্রথম বিষয়টির জন্যে। দুটো কারণে প্রথম দিন ও বিষয় নিয়ে পরীক্ষার্থীদের উৎকণ্ঠা ও উদ্দীপনা থাকে। এক. শিক্ষা জীবনের প্রথম ধাপ অতিক্রমের চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা। দুই. প্রথম বিষয়টি যেহেতু ইংরেজি, যা আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃত। আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থীর কাছে ইংরেজি বিষয়টি বিদেশী ভাষার জন্যে কঠিন। অবশ্য এ ব্যাপারে অনেকে মনে করেন শিক্ষার্থীদের ইংরেজি ভাষা শেখানোর শিক্ষকের অভাব রয়েছে। অধিকাংশ স্কুলেই অযোগ্য ইংরেজি শিক্ষক পাঠদান করছে। যদিও বেশ কয়েক জন মেধাবী শিক্ষার্থীর সাথে আলাপ করে জানা গেছে, ইংরেজি বিষয় নিয়ে তারা মোটেই উৎকণ্ঠায় ভুগছে না, বরং ইংরেজি বিষয়টি তাদের কাছে বেশ উপভোগ্য। তাহলে বলতে হবে ইংরেজি বিষয়ে তাদের প্রস্তুতি ভালো এবং যথার্থ। অর্থাৎ, যে কোনো বিষয়ে প্রস্তুতি ভালো মানেই শিক্ষার্থীর কাছে বিষয়টি উপভোগ্য হওয়া স্বাভাবিক। আর উপভোগ্য হওয়া মানে সে বিষয়ে আশানুরূপ ফল লাভ অবশ্যম্ভাবী।

ইংরেজি বিষয়ে দরকারি প্রস্তুতি

মাধ্যমিক Text বই এ ৭৫টি Lesson আছে। এই Lessonগুলো শিক্ষকের সাথে, অন্য শিক্ষার্থীদের সাথে অনুশীলন করতে হবে। নিয়মিত এবং যথাযথভাবে Lesson গুলো অনুশীলন করলে যে কেউই পরীক্ষায় ৯০%-এর বেশি নম্বর পাবে। আর অনুশীলন না করে মুখস্থ করে গেলে 'শূন্য' নম্বর পাওয়াও বিচিত্র কিছু নয়। কারণ, 'মুখস্থ' কোনো কিছুই পরীক্ষায় আসবে না। এটা অনেকটা ক্রিকেট খেলার অনুশীলনের মতো। ক্রিকেট খেলায় যে যত বেশি অনুশীলন করবে সে তত বেশি Score বা run করতে পারবে। ইংরেজি ভাষা শিক্ষার ব্যাপারটাও তাই। নিয়মিত

www.pathagar.com

অনুশীলনের মাধ্যমে ৪টি Skill, যথা Listening, Speaking, Reading এবং Writing-এর উপর দক্ষতা বাড়াতে হয়। পরীক্ষার জন্য শেষের দুটি Skill বেশি important. Reading Comprehension-এ ভালো নম্বর পেতে হলে প্রথমেই Passage-টি ভালো করে বারবার পড়তে হবে এবং তারপর প্রশ্নগুলো ভালোভাবে পড়ে যথাযথ উত্তর লিখতে হবে। প্রশ্নের উত্তর কি হবে, কতটুকু হবে এবং কেমন হবে তার জন্য প্রশ্নের নির্দেশাবলি বারবার পড়তে হবে। প্রশ্নের নির্দেশাবলি না পড়ে উত্তর লেখা উচিত হবে না। প্রশ্নের উত্তর লেখার আগে মনে করতে হবে আমি কি লিখতে যাচ্ছি এবং আমার উত্তর যথাযথ (to the point) হচ্ছে কিনা। Reading comprehension-এর উপর বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করা হবে। কোন প্রশ্নের উত্তর এক বা দুই শব্দে কিংবা একটি বাক্যে করা লাগতে পারে। কি ধরনের প্রশ্ন হবে, তা নতুন মানবণ্টন দেখে নিশ্চিত হতে হবে।

Writing skill পরীক্ষার জন্যে letter, application, paragraph, essay ইত্যাদি আছে। এই প্রশ্নগুলিতে ভালো নম্বর পেতে হলে নিয়মিত ইংরেজি লেখা অভ্যাস (Practice) করতে হবে। প্রত্যহ English Newspaper, story books, Magazines ও model letters, paragraphs and essays পড়তে হবে এবং সেগুলো কিভাবে সীমিত Words-এর মধ্যে সুন্দর করে লেখা হয়েছে তা দেখতে হবে এবং সেভাবে লেখার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

Grammar and Vocabulary-এর ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের খুব সচেতন হতে হবে। পাঠ্যপুস্তকের প্রতিটি Lesson শেষে বেশ কিছু Grammatical excercise আছে এবং সেগুলি ভালো করে Practice করতে হবে। নতুন পাঠ্যক্রমানুসারে Grammar বই Reference হিসেবে নিজে-নিজেই পড়তে হবে। Grammar-এর বিশেষ বিশেষ অংশগুলো যেমন Clauses, phrases, use of articles, parts of speech, use of prepositions, joining of sentences, correct use of verb forms, transformation of sentences ইত্যাদি শিক্ষার্থীকে অবশ্যই জানতে হবে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেকস্টবুক বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত Sample question যথাযথভাবে অনুশীলন করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রকাশিত ভালো Test papers ফলো করে স্যারদের সাথে আলাপ করা যেতে পারে। Test paper-এ উল্লিখিত ভালো স্কুলের প্রশ্নগুলোর দিকে মনোযোগ বেশি দেওয়া উচিত। নতুন মান বণ্টনও ভালোভাবে লক্ষ করবে। মান বণ্টন অনুসারে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে হবে।

পরীক্ষার পূর্ব প্রস্তুতি

পরীক্ষার চূড়ান্ত প্রস্তুতি মূলত নির্বাচনী পরীক্ষার পর থেকে এস.এস.সি পরীক্ষার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ধরা হয়। এ সময়ে পুরো সেলেবাসে চোখ বুলিয়ে নেওয়া ছাড়া

www.pathagar.com

বিভিন্ন স্কুলের নির্বাচনী পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর যাচাই-বাছাই এবং বাদ পড়া প্রশ্নের উত্তর সমূহ অভ্যস্থ করতে ব্যস্ত থাকে শিক্ষার্থীরা। পাশাপাশি যে যে বিষয়গুলোয় একশভাগ প্রস্তুতি হয়নি, সে বিষয়ে মনোযোগী হওয়া। পাঞ্জেরী শিক্ষা সংবাদের-এর বর্ষ ১ সংখ্যা ৫, ডিসেম্বর সংখ্যায় (পৃষ্ঠা ১৫) 'এসএসসি পরীক্ষার্থীদের ভালো ফলাফল করতে হলে যেভাবে পড়তে হবে' শিরোনামে একটা 'পরামর্শ' পত্র ছাপা হয়েছিল— আমি মনে করি এটি এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য সময়ানুগ পরামর্শপত্র। এখানে সেই পরামর্শ পত্রের সারসংক্ষেপ তুলে ধরছি।

১. পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি ঃ
একজন শিক্ষার্থীকে তার সব বিষয়ের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা।

২. সময়ানুবর্তিতা ঃ
বিষয়ভিত্তিক রুটিন তৈরির মাধ্যমে সময় ভাগ করে নেওয়া। রোজ সকাল ও রাতে কম হলেও ৩ + ৩ = ৬ ঘণ্টা নিয়মিত পড়াশোনা করা। বিষয়ভিত্তিক সময় ভাগ করে নেওয়া।

৩. কোচিং ক্লাস ঃ
নির্বাচনী পরীক্ষার পরে চূড়ান্ত পরীক্ষার পূর্ব পর্যন্ত অনেক স্কুলে কোচিং ক্লাস হয়ে থাকে। এসময়টা একজন শিক্ষার্থীর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোচিং ক্লাসে নিয়মিত হাজির থাকা এবং শিক্ষকদের নির্দেশ নিয়মিত পালন করা।

৪. পরীক্ষার দিনের প্রস্তুতি ঃ
পরীক্ষার আগের রাতে অধিক সময় পড়াশোনা করে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটানো ঠিক না। প্রত্যূষে ঘুম থেকে উঠতে হবে। দিনের বিষয়টি নিশ্চিত হতে আরেকবার পরীক্ষার সময়সূচিতে চোখ বুলিয়ে, বিষয়টি স্মৃতিতে একবার জাবর কেটে নেওয়া যেতে পারে এবং দু-তিনটে কালো কালির কলম, একটা রবার ও একটা স্কেল সঙ্গে নেওয়া। অবশ্যই প্রবেশপত্র ও নিবন্ধন কার্ড সঙ্গে নিতে হবে।

আরো যা বাঞ্ছনীয়

- ❑ উত্তর প্রাসঙ্গিক (to the point) ও নির্ভুল হওয়া।
- ❑ পরীক্ষার প্রশ্ন নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর নির্ভুলভাবে দেওয়া সম্ভব সে প্রশ্নগুলোই নির্বাচিত করতে হবে।
- ❑ উত্তর লেখার সময় Point-এর উপর গুরুত্ব দিতে হবে। Point গুলো

www.pathagar.com

সব থাকবে কিন্তু উত্তরটি হতে হবে সংক্ষিপ্ত। উত্তরের ভাষা হবে সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল। অবান্তর এবং অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিতে হবে।

- ❑ বিষয়ানুগ প্রয়োজনীয় ডাটা, চিত্র অঙ্কন এবং নির্ভুল হতে হবে।

পরীক্ষায় যতগুলো প্রশ্নের উত্তর করতে বলা হয়, নির্ধারিত মানবণ্টন ও সময়ের দিকে খেয়াল করে সবগুলো প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করা। তবে ভুল উত্তর দেয়ার চেয়ে না দেয়াই ভালো।

* সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। মাথা ঠাণ্ডা রেখে যথাসম্ভব দ্রুত উত্তর দেওয়া, যাতে সব কয়টি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়। প্রয়োজনে সময় ভাগ করে নেওয়া। নির্দিষ্ট সময়ের আগে উত্তর দেয়া শেষ হলে, যতটুকু সময় পাওয়া যায় Revision দিতে হবে।

আমার মতে, একজন শিক্ষার্থীকে পরীক্ষার পূর্বে যে ব্যাপারগুলো খেয়াল রাখতে হয়, তা হলো—

ক. শিক্ষার্থীকে রুটিন অনুযায়ি দৈনিক ৬ থেকে ৮ ঘন্টা পড়াশোনা করতে হবে। বইয়ের Topic গুলো ভালোমতো পড়তে হবে এবং কতগুলো বিশেষ প্রশ্নের বিশেষ নোট তৈরি করতে হবে; যাতে উত্তর Uncommon হয়।

খ. এসএসসি পরীক্ষার্থীদের Test paper ভালোভাবে Follow করতে হবে। ভালো স্কুলের প্রশ্নের ধরন অনুযায়ি প্রস্তুতি নিতে হবে।

গ. বারবার Model Test দিয়ে পরীক্ষারভীতি দূর করতে হবে।

ঘ. সব বিষয়কে সমান গুরুত্ব দিয়ে পড়িতে হবে।

ঙ. প্রয়োজনে নিজ থেকে লেখার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। কেননা, সব প্রশ্ন Common পাওয়া যাবে। এরকম আশা করা যায় না।

ভূপতি রঞ্জন দাশ
সিনিয়র ইংরেজি শিক্ষক
সেন্ট প্ল্যাসিডসং হাই স্কুল, চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

এস.এস.সি পরীক্ষায়
কমিউনিকেটিভ ইংলিশ

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। শিক্ষার উন্নয়ন ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। কেননা শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই প্রতিফলিত হয় কোনো জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন-প্রবাহ। আর শিক্ষার বিস্তারিত পরিকল্পনা বিন্যস্ত থাকে শিক্ষাক্রমে।

কোনো শিক্ষাক্রমই অপরিবর্তনীয় ও চিরন্তন নয়। জাতীয় আদর্শ ও লক্ষ্য, সমকালীন জীবনের চাহিদা এবং ক্রমবিকাশমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির সংস্কার ও নবায়ন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

যার ফলশ্রুতিতে ১৯৯৩ সালে তিন স্তরের শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও নবায়ন প্রচেষ্টার প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এবং সেকেন্ডারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ও হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্টের সহায়তায় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিভিন্ন বিষয়ে কমিটি গঠন করে। শিক্ষাক্রম পাঠ্যসূচি পরিমার্জন ও নবায়নের কাজ সম্পন্ন করে এবং ১৯৯৬ শিক্ষা বর্ষে ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীতে নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রর্বতনের মাধ্যমে পরিমার্জিত ও শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়। সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষাক্রম চালু হয় ১৯৯৭ সাল থেকে। আর Communicative English ৯৬-এ নবম শ্রেণী থেকে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রবর্তন করা হয়। যে কারণে ২০০১ সালের এস.এস.সি পরীক্ষায় প্রথম বারের মতো ইংরেজি Communicative system-চালু করা হয়।

২০০১ সাল থেকে চালু হওয়া জাতীয় শিক্ষাক্রমে ইংরেজির পরিমার্জন রূপ এবং মাঠ পর্যায়ে Communicative এর বাস্তব চিত্র ফুটে ওঠেছে এই প্রতিবেদনে ও পাঠ্যপুস্তক অনুযায়ী প্রথমবারের মতো Communicative English-এ কী রকম প্রস্তুতি নিচ্ছে ২০০১ সালের শিক্ষার্থীরা, এ বিষয়টিও গুরুত্ব পেয়েছে আলোচ্য প্রতিবেদনে।

পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির মূল লক্ষ্য ছিল শিক্ষাক্রমকে জীবনমুখী ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করা এবং এর দিক নির্দেশনা প্রদান ও পাঠ্যসূচি সমন্বয়করণ।

পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম প্রবর্তনের প্রাক্কালে NCTB প্রণীত 'শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি ঃ মাধ্যমিক স্তর-এর দ্বিতীয় খণ্ডের রিপোর্ট ডিসেম্বর ১৯৯৫' অনুযায়ি পূর্বে প্রচলিত শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাব্যবস্থার সার্বিক ত্রুটি ও ঘাটতি বিস্তারিত

www.pathagar.com

আলোচিত হলেও এই প্রতিবেদনের সীমাবদ্ধতার কথা মনে রেখে তা পত্রস্থ করা সম্ভব নয়। ইংরেজি বিষয়ে পূর্বেকার শিক্ষাক্রমে যে বিচ্যুতি প্রধানতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, তা হলো, 'কোনো ভাষানীতি ও ভাষা শেখানোর সার্বিক পরিকল্পনা না থাকাতে বিদেশী ভাষা হিসেবে ইংরেজি পঠনপাঠনের বদলে ইংরেজি সাহিত্য পাঠের উপর বেশি জোর দেওয়া হতো। নবম-দশম শ্রেণী পর্যন্ত Structural English এর উপর গুরুত্ব দিয়ে ইংরেজি ভাষা শেখানো হলেও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে ইংরেজি ভাষার বদলে ইংরেজি সাহিত্যে কসরত করানোর উদ্দেশ্যে কবিতা ও গদ্য-সাহিত্যের সংকলন পাঠ্য করা হয়।'

যার ফলে সে সময় Communicative English শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্তি জরুরি মনে করেন জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটি। কারণ, পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে যে ধরনের জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ আহরণের সুযোগ রাখা হয়, আমাদের শিক্ষাক্রমেও সে সুযোগ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা রাখা। বিশেষ করে ইংরেজি বিষয়ের ক্ষেত্রে যোগাযোগ ও ভাবের আদান-প্রদানের জন্য ভাষার দক্ষতা ও তথ্য প্রক্রিয়াকরণ সম্পর্কে যোগ্যতা অর্জনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

Communicative English শিক্ষা চালু করার যুক্তি দেখিয়ে NCTB তাদের নির্দেশাবলীতে বলেছে, The aim of document is to provide a communicative syllabus for the teaching and learning of English Secondary and Higher Secondary Levels in Bangladesh. ....

This syllabus has been produced in order to bring about change, and in particular, a change of teaching methodology. In order to implement change successfully, it is essential to understand that English is not like most of the other subjects specified on the curriculum. For, unlike them English is not a content-based subject, but a skill-based subject. English is not about any particular topic, but, rather, it is about practising something-listening, speaking, reading and writing...

...It is about practising language skills. The English Language classroom should, above all else, be an interactive one. The students should practice English with the teacher, the teacher with the students, and most important of all, the students with each other. That is what communicative English language teaching and learning is about : the acquisition of language through constant and regular practice.

www.pathagar.com

For the successful implementation of this syllabus, many new things will be required. Chief among these are suitable communicative language materials that will enable teachers to reactivate their classes and appropriate examinations that will test language skills, not the ability to memorise the contents of textbooks or, even worse, note books, without understanding. The changes that are required in order to bring about an improvement in the teaching and learning of English are radical and manifold and it will take time for these changes to be fully understood, accepted, absorbed, and, finally, have their desired effect It is hoped, however, that for all those involved in this arduous task of bringing about necessary change, this syllabus will prove to be a clear and effective guide.

কিন্তু বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। বেশ কয়েকটি স্কুলের ইংরেজি শিক্ষকের সাথে আলাপ করে জানা গেছে NCTB-র কর্মপরিকল্পনার সাথে স্কুলগুলোর রয়েছে বিস্তর ব্যবধান। Communicative English শিক্ষার্থীকে পড়ানোর পদ্ধতি এখনো অনেক শিক্ষক পুরোপুরি অবগত নন। শিক্ষার্থীদের পাঠস্পৃহা বৃদ্ধি ও তাদের সৃজনশীলতা বিকাশের লক্ষ্যে NCTB-র নির্দেশিকা রয়েছে তা জানেন না অধিকাংশ শিক্ষক। নিজ থেকে শিক্ষকরা যা বুঝেন তাই ছাত্রদের বোঝাতে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। মূলত শিক্ষকরা পুরনো পদ্ধতিতেই শিক্ষার্থীদের ক্লাস নিচ্ছেন। এতে ছাত্ররা কতটুকু জানতে পারছে, এ নিয়ে Class Ten-এ পড়ুয়া এক ছাত্রের সাথে কথা বললে ছাত্রটি জানায়, 'কিছুই বুঝি না। স্যাররাও আমাদের ঠিকমতো বোঝাতে পারেন না। শুধু ক্লাসে এসে বই দেখিয়ে বলেন, এই থেকে এই পর্যন্ত পড়ে আসবে। ভাগ্যিস বাসায় আমার টিউটর আছেন, নয়তো ইংরেজিতে লাড্ডু পেতে হতো।' এই হচ্ছে রাজধানীর একটি স্কুলের ছাত্রের কথা। Communicative English এখন শিক্ষার্থীদের কাছে ক্ষুধা নিবারণে শুকনা রুটি খাওয়ার মতো। চর্বণ করে যাচ্ছে সাধ্য মতো, পেটে চালান করতে কষ্ট হচ্ছে। মফস্বল স্কুলের চিত্র তো আরো করুন। মফস্বল স্কুলের অধিকাংশ শিক্ষকই ইংরেজি ভালো বোঝেন না। Communicative English সম্পর্কে তাদের ধারণা হ-য-ব-র-ল। কারো কারো মতে 'সো টাফ'। আর দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটির ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক কাজী নূরুল হক-এর মতে, 'কমিউনিকেটিভ ইংলিশ হলো ইংরেজি ভাষা শেখার ক্ষেত্রে সম্মিলিত পাঁচটি পদ্ধতির একটি পদ্ধতি। যাকে আমরা হাতের পাঁচটি আঙ্গুলের সাথে তুলনা করতে পারি। আমরা কী করলাম, পাঁচটি আঙ্গুল কেটে একটি আঙ্গুল অর্থাৎ, Communicative English রাখলাম। ফল দাঁড়াল এই; আমরা একটি কাজই করতে পারব। তার মানে হাতের পুরো

www.pathagar.com

ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে।' বিএন কলেজের ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক সত্যরঞ্জন পাল বলেছেন 'শেখানো ও শেখা দুটি পরিপূরকভাবে সম্পর্কিত। ইংরেজি শেখানোর জন্য যত মহাপরিকল্পনা আমরা নেই না কেন, দক্ষ শিক্ষকের অভাব পূরণ করতে না পারলে পরিকল্পনা ব্যর্থ হবে।' অধিকাংশরা বলছেন, 'নতুন পদ্ধতিতে Grammar নেই। Grammar না পড়লে ইংরেজি শিখবে কিভাবে?' যদিও ভিকারুননিসা নূন স্কুলের ইংরেজির শিক্ষিকা ওয়াহিদা জাফর বলেছেন, 'না, Communicative English সম্পর্কে অনেকের একটা ভ্রান্ত ধারণা জন্ম নিয়েছে, এই পদ্ধতিতে নাকি Grammar একেবারেই নেই। Grammar আছে। কিন্তু ভিন্ন রকমভাবে উপস্থাপন করা আছে আর কি। Narration, Voice Change করা নেই বলেই যে Grammar নেই তা নয়। আসল কথা হচ্ছে Communicative English সম্পর্কে অনেক টিচার এখনও পুরাপুরি ক্লিয়ার নন। যথাযথ প্রশিক্ষণ না থাকার কারণে এ-রকম বক্তব্য হচ্ছে।'

এখন কথা হচ্ছে, যে সব শিক্ষক এ ব্যাপারে clear নন, তাদের সঠিক ধারণা দেওয়ার দায়িত্ব কার? অবশ্যই কারিকুলাম প্রণেতাদের। মানে NCTB-র উচিত যে কোন System প্রণয়নের পূর্বে শিক্ষকদের সে বিষয়ে সম্যক ধারণা দেওয়া। যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাপূর্বক দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেওয়া। যদিও English Language Teaching Improvement Project-এর প্রকল্প পরিচালক রায়হানা শামস প্রকল্পের শুরুতে বলেছেন, 'অবশ্যই আমরা প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। একসাথে তো আর সকল শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব নয়। ধীরে ধীরে কয়েকটি ধাপে প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। আমরা কয়েকটি জোনে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছি।' আমরা মনে করি সর্বোস্তরে Communicative শিক্ষা চালু করার উপায় খুঁজে বের করতে হবে। পাশাপাশি একটা স্বচ্ছ ধারণা শিক্ষক এবং সর্বস্তরের মানুষের মাঝে গ্রোথীত করা এবং তা করতে হলে NCTB'র ব্যাপক পরিকল্পনা, প্রচার-প্রচারণার দরকার রয়েছে। এ ব্যাপারে NCTB প্রচারমাধ্যমগুলোর সহযোগিতা নিতে পারে। নয়তো, যে লক্ষ্যে সরকার Communicative English চালু করেছে, তার সাফল্য মুখ থুবরে পড়তে বাধ্য। একটা অভিযোগ অধিকাংশ শিক্ষক একই সুরে করেছেন, NCTB থেকে তারা যথার্থ ট্রেনিং পান নি। কোনো কোনো স্কুলের কাউকে প্রশিক্ষণের জন্য ডাকা হলেও তা যথার্থ নয় মোটেই। কিংবা NCTB শহরের ভালো স্কুলগুলোর শিক্ষকদের যতটা গুরুত্বের সাথে প্রশিক্ষণ কিংবা মনিটরিং করছেন, দুর্বল কিংবা গ্রাম পর্যায়ের স্কুলগুলোর দিকে বোর্ডের দৃষ্টি বিমাতাসুলভ। অবশ্য এ ব্যাপারে রায়হানা শামস বলেছেন, 'আমরা মনে করছি শহরের স্কুলগুলোর শিক্ষকরা গ্রামের স্কুলের শিক্ষকদের থেকে কিছুটা হলেও অভিজ্ঞ। তাই আমরা অভিজ্ঞদের দিয়েই Systemটি শুরু করেছি। ক্রমান্বয়ে গ্রাম পর্যায়ে এই পদ্ধতি ডেভেলপ করা হবে।' অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে গুরুত্বপূর্ণ কোনো

www.pathagar.com

সিদ্ধান্ত বোর্ড শুধুমাত্র একটি চিঠি পাঠিয়েই দায়িত্ব পালন করে ক্ষান্ত হন। যেহেতু NCTB'র পক্ষ থকে নিয়মিত কোনো মনিটরিং কিংবা ফলোআপ নেই তাই স্কুলগুলোও সরকারের চিঠিপত্র কিংবা কাগুজে নির্দেশাবলী অধিকাংশ সময় অবহেলায় ফেলে রাখেন। কিন্তু Communicative English-এ মনিটরিং অন্য বিষয়গুলো থেকে আলাদা এবং গুরুত্ববহ। ইংরেজি বিদেশী ভাষা এবং মাতৃভাষার পরেই এর অবস্থান। ইংরেজি ভাষার প্রতি আমাদের দখল দুর্বল। NCTB বলছে এটা ইংরেজি শেখায় ভালো উদ্যোগ। সর্বোপরি ইংরেজির বর্তমান দৈন্যতা কাটাতে এবং বিশ্বমানের পর্যায়ে নিয়ে যেতেই Communicative English চালু করেছে। কিন্তু ভালো সিদ্ধান্ত তখন আর ভালো থাকে না যদি না এর পারিপার্শ্বিকতা অনুকূলে না থাকে। উদাহরণস্বরূপ যত অত্যাধুনিক যন্ত্রই ব্যবহারের আশায় সংগ্রহ করি না কেন, ব্যবহারবিধির সঠিক ধারণা না পেলে তা কোনো কাজে আসে না এবং তা অব্যবহৃত থেকে একসময় চিরস্থায়ীভাবে অকেজো হয়ে পড়ে। তেমনি Communicative ইংরেজি শেখার একটি ভালো পদ্ধতি মেনে নিলেও এর সঠিক প্রয়োগবিধি, নিয়মিত মনিটরিং, যথাযথ প্রশিক্ষণ না দেওয়া হলে শিক্ষার্থীকে ইংরেজি শেখাবার কারিগররা অত্যাধুনিক ভাষা নামক এই যন্ত্রটির প্রয়োগবিধি জানতে জানতে হয়তো Communicative English কমিউনিকেট, এ যথেষ্ট বিড়ম্বনার সৃষ্টি হবে। স্কুলের শিক্ষকদের সাথে আলাপ করে যা বুঝা গেছে, শহরের ভালো স্কুলগুলো এত কিছুর পরও মোটামুটি একটা প্রস্তুতি নিতে পারছে কিংবা পারবে। কারণ, ভালো স্কুলগুলোর শিক্ষকরা গ্রামের স্কুলগুলোর শিক্ষক থেকে অনেক বেশি অভিজ্ঞ। তেমন এসব স্কুলের শিক্ষার্থীরাও গ্রামের শিক্ষার্থীদের তুলনায় মেধাবী। এদের পরিবার এবং পারিপার্শ্বিকতা আলাদা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষিত-সচেতন পরিবারের সন্তানরা শ্রেষ্ঠ স্কুলগুলোর শিক্ষার্থী। তাই Communicative English Systemটি গ্রামের শিক্ষার্থীদের কাছে কঠিন হলেও শহরের ভালো স্কুলগুলোর কাছে কঠিন হলেও শহরের ভালো স্কুলগুলোর কাছে অপেক্ষাকৃত সহজতর।

সরকারের উচিত প্রাথমিক পর্যায় থেকেই ইংরেজি শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে Communicative এর দক্ষ, অভিজ্ঞ কারিগর তৈরি করা। তবেই হয়তো সবক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থী শিক্ষকের কাছ থেকে ইংরেজি ভাষা শেখার যথার্থ জ্ঞান আহরণ করতে পারবে। শিক্ষার্থীরা মেধায় মননে পোক্ত হয়ে ভবিষ্যতের দক্ষ কারিগর সৃষ্টি হবে। বিশ্বমানের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের সন্তানরাও মাথা তুলে দাঁড়াবে।

www.pathagar.com

কেসস্টাডি : ELTIP-এর কার্যপদ্ধতি

ইংরেজি ভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে Communicative Teaching approach বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গত প্রায় চারদশক ধরে অত্যন্ত সফল ও জনপ্রিয় পদ্ধতি হিসেবে অনুসৃত হয়ে আসছে। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের ইংরেজি চর্চা ও ব্যবহারের প্রেক্ষাপট বদলে গেলেও এই ভাষাটি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কোনো পদ্ধতিগত সংস্কার ঘটেনি। বরং প্রাচীন ও কিছুটা সেকেলে Grammar Translation পদ্ধতিতেই গত প্রায় তিন দশক ধরে ইংরেজি শিক্ষাদান চলে আসছিল। তবে, দেরিতে হলেও বাংলাদেশে পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এর উদ্যোগে এদেশে Communicative language teaching এর প্রসার ঘটতে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রধান ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে English language Teaching Improvement Project (EITIP)

EITIP এর যাত্রা শুরু হয় ১৯৯৭ সালে। প্রথমেই এ প্রজেক্ট দেশের বিরাজমান ইংরেজি শিক্ষাদান পদ্ধতির উপর একটি বেসলাইন স্টাডি করে এবং এর সংস্কারের জন্য সুপারিশ ও নীতিমালা প্রণয়ন করে। এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু হয় নতুন text বই প্রণয়নের মধ্য দিয়ে। প্রাথমিক পর্যায়ে ৬ষ্ঠ-৮ম এবং পরবর্তীতে ৯৯-এ নবম-দশম শ্রেণীর ইংরেজি পাঠ্যবই Communicative approach এর আলোকে নতুন করে লেখা হয়। অর্থাৎ, এ বছর অনুষ্ঠিত এস.এস.সি পরীক্ষার ইংরেজি বিষয়টি Communicative System হয়েছে। পাঞ্জেরী শিক্ষা সংবাদ-এর পক্ষ থেকে এক জরিপ-এ দেখা গেছে, অধিকাংশ শিক্ষার্থীই Communicative English না বুঝেই পরীক্ষা দিয়েছে। এই না বুঝার কারণ, Communicative approaach সকল শিক্ষকের মাঝে করা যায় নি। ELTIP-এর ধীরগতি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার ফলে মফস্বল এলাকার স্কুলগুলোর শিক্ষকগণ এখনো প্রশিক্ষণ পাননি। আর যারা প্রশিক্ষণ পাননি তাদের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয় শিক্ষার্থীদের মাঝে Communicative System Approch করা। অর্থাৎ, Communicative English Language শিখতে যে চারটি Skill-Listening, Speaking, Reading and Writing রয়েছে, শিক্ষার্থীদের পাঠদানের আগে তার পদ্ধতিগত কলাকৌশল জানা শিক্ষকদের জন্য অবশ্যই জরুরি। এ ব্যাপারে ELTIP-এর প্রকল্প পরিচালক ইতঃপূর্বে পাঞ্জেরী শিক্ষা সংবাদ-এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "দেখুন, আমাদের এই প্রজেক্টের (ELTIP) কাজ হচ্ছে সরকারের সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়ন করা। Education project is soft project। এর ইমপেক্ট খুব স্লো। হুট করে কোনো রেজাল্ট পাওয়া সম্ভব নয়। মাত্র তো Nienty eight থেকে ফাইনালি প্রজেক্ট শুরু হয়েছে। শিক্ষকদের ট্রেনিং দেয়া শুরু হয়েছে জুলাই Ninety Nine থেকে। বুঝতেই পারছেন খুব একটা সময় পাইনি।"

www.pathagar.com

তিনি আরো জানিয়েছেন, সবচে বড় সমস্যা প্রয়োজনীয় ট্রেইনার না পাওয়া। টেম্পরারি প্রজেক্ট হওয়ায় অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও অনেক ট্রেইনার আসতে চায় না। তাই ELTIP কে প্রথমে ট্রেইনার তৈরি করে তারপর টিচারদের ধাপে ধাপে ট্রেনিং দিতে হয়।

এই ট্রেনিংটা হচ্ছে ভলান্টারি সিস্টেমে। ক্লাস্টার সিস্টেমে থানা বেসড ট্রেনিং দেয়া হয়। সারাদেশে ৪টি বিভাগীয় ও ১৪টি স্যাটেলাইট রিসোর্স সেন্টার এর মাধ্যমে ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে।

শিক্ষকদের ধারণা পেতে এই প্রতিবেদনে ELTIP কর্তৃক ট্রেনিং-এর কয়েকটি ধাপ ছক আকারে তুলে ধরা হলো-

চার বিভাগের অধীনে নিম্নের ছক অনুযায়ী স্যাটেলাইট সেন্টারগুলোর ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে যা নিম্নরূপ :

DHAKA (RRC)
- → Maymenshing (SRC)
- → Dhaka (SRC)
- → Gajipur (SRC)

পাশের ছক অনুযায়ী হিসেব করলে দেখা যায় সারাদেশের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

DHAKA (RRC)
- → Feni (SRC)
- → Chitagong (SRC)
- → Comilla (SRC)

নিতান্তই কম। স্যাটেলাইট রিসোর্স সেন্টার প্রতিটা জেলা ভিত্তিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

DHAKA (RRC)
- → Rajshahi (SRC)
- → Rongpur (SRC)

www.pathagar.com

DHAKA (RRC)
- → Khulan (SRC)
- → Jessore (SRC)

এসব সেন্টারে ট্রেনিং দেয়া হয় নিম্নের ছক অনুযায়ী :

DHAKA (RRC)
- → Testing
- → Textbook writing
- → Training

ট্রেনিং এর একমাত্র উদ্দেশ্য একজন শিক্ষক কিভাবে শিক্ষার্থীদের Communicative English শিখাবে। শ্রেণী কক্ষে কিভাবে approach করবে। কথোপকথন কিরূপ হবে ইত্যাদি। তাই ক্লাস্টার বেসড্ (Cluster Based) ট্রেনিং দেয়া হয়। এক্ষেত্রে ELTIP প্রকাশিত Teacher গাইড অনুযায়ী ট্রেনিং দেওয়া হয়।

FORMING CLUSTERS
- ↓ English teachers from one school form cluster
- ↓ Two/Three Schools form a cluster
- ↓ Some clusters in a thana from a training batch

* This is the way of forming clusters. পুরো পক্রিয়াটি ছক-এ ফেললে নিম্নরূপ দাঁড়ায়-

www.pathagar.com

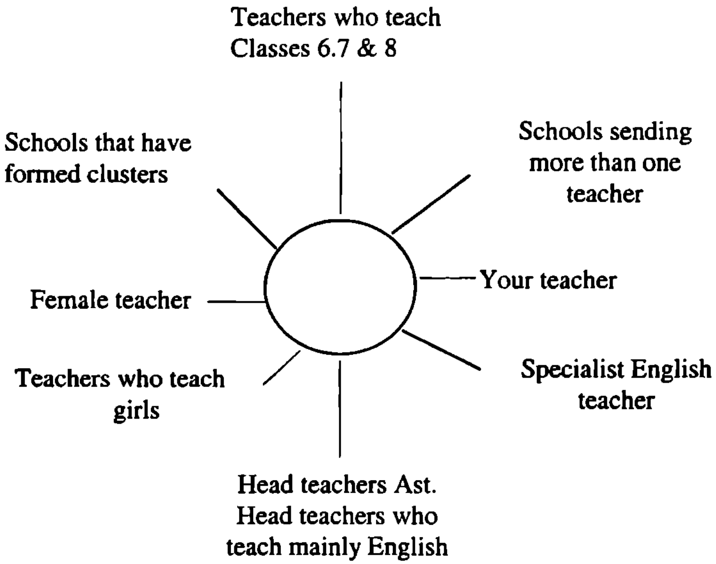

ট্রেইনার জনাব মোঃ জুলফিকার হায়দার জানালেন, তারা এ পর্যন্ত ১৩টি ব্যাচে ৪৯৮ জন মাধ্যমিক পর্যায়ের ইংরেজি শিক্ষককে ট্রেনিং দিয়েছেন। এর মধ্যে ঢাকায় ৭টি ব্যাচ, ময়মনসিংহ-এ ৬টি ব্যাচ ও গাজীপুরে ২টি ব্যাচ। তিনি জানালেন, "ELTIP-এর পক্ষে আমরা কাজ করে যাচ্ছি ঠিক, আমাদের প্রাণান্ত চেষ্টাও রয়েছে; কিন্তু যারা প্রশিক্ষণ নেবেন, তাদের একান্ত ইচ্ছেটাই পুরো ব্যাপারটিকে সার্থক করতে সাহায্য করবে। আমাদের এই ট্রেনিং যে শুধু শিক্ষার্থীদের পড়ানোর জন্যই উপযোগী তা নয়, এতে একজন শিক্ষকেরও Quality Develop হচ্ছে।" অথচ বাস্তবে দেখা গেছে, স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের অনুরোধ সত্ত্বেও তারা শিক্ষক এ প্রজেক্টের প্রতি বিরূপ মনোভাব শোষণ করেননি এ ছাড়াও একটি মহল মনোপ্রাণে চাচ্ছেন পুরো প্রজেক্টটি যাতে বন্ধ হয়ে যায়। এ কারণেই কি-না জানি না, ব্রিটিশ কাউন্সিল এই প্রজেক্টের প্রতি আগের মতো আন্তরিক নন, যে-কোনো সময় তাদের সহযোগিতা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আর তাই যদি হয় তবে একটি ভালো উদ্যোগের অপমৃত্যু হবে। আমরা ফের পেছনে ফিরে যাবো; যা জাতির জন্য অবশ্যই দুর্ভাগ্যজনক।"

পরিশেষে বলা যায়, Communicative English System প্রক্রিয়াটি ইংরেজি শেখার ভালো উপায় হলেও শিক্ষকদের দ্রুত যথাযথ প্রশিকইদতে ব্যর্থ হলে এবং প্রজেক্ট সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের মাঝে সঠিক ধারণা দিতে না পারলে পুরো প্রক্রিয়াটি ব্যর্থতার পর্যবসিত হয়ে পড়বে। এক্ষেত্রে ELTIP-র উচিত হবে Communicative English-এর ইতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরে বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে প্রচারণা চালানো।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়
শিক্ষা সংলাপ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পূর্বের শিক্ষা কমিশন রিপোর্টগুলোর সুন্দর পেপার ওয়ার্ক ছিলো বটে, বাস্তবসম্মত ছিল না

—আ.ন.ম এহ্ছানুল হক মিলন

সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়। দেশের বিরাজমান শিক্ষা সংকট দূর করে, শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানোসহ একটি জাতিকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার মূল দায়িত্ব ন্যস্ত এই মন্ত্রণালয়ের। ফলে যে দলই যখন সরকার গঠন করেন, অন্যান্য দু'একটি মন্ত্রণালয়ের সাথে এই মন্ত্রণালয়টি নিয়েও ভাবেন। কাকে দেয়া যায় এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বভার। ২০০১ সালে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় এসে অনেক ভেবেচিন্তে এই মন্ত্রণালয়ের মূল দায়িত্বভার তুলে দেন ওসমান ফারুক সাহেবকে। তার সহযোগী হিসেবে নিয়োগ দেন আ.ন.ম এহ্ছানুল হক মিলনকে। শুরুতেই নিজের কাধে দায়িত্ব তুলে নেন যথাসময়ে শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যবই তুলে দেওয়ার। প্রায় পুরোপুরি সার্থক হন তিনি। এরপর নকল রোধে আন্দোলন শুরু করেন। নকলরোধেও তিনি প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেন।

সরকারের একজন প্রতিমন্ত্রী হয়েও আ.ন.ম এহ্ছানুল হক মিলন যতটা আলোচিত পূর্ণমন্ত্রী হয়েও অনেকে তা পারেননি। তাই বর্তমান সরকারের আমলে বাংলাদেশের শিক্ষা নিয়ে কোনো কথা এলেই মিলনের কথা চলে আসে। সংগত কারণে শিক্ষা বিষয়ক পত্রিকা পাঞ্জেরী শিক্ষা সংবাদের সম্পাদক হিসেবে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা, মাঠ পর্যায়ে শিক্ষার হালচাল নিয়ে আ.ন.ম. এহ্ছানুল হক মিলনের সঙ্গে কথা বলতে উদ্যোগী হই। তাই ২০০৩ সালের অক্টোম্বর মাসের কোনো একটি দিনে আ.ন.ম এহ্ছানুল হক মিলনের সফরসঙ্গী হয়ে বেরিয়ে পড়ি একগুচ্ছ প্রশ্ন নিয়ে। নানা কথা, আলাপ-আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে একের পর এক প্রশ্ন তুলে ধরি জনাব মিলনের কাছে। খোলামেলা এই আলোচনায় উঠে আসে শিক্ষাব্যবস্থার অতীত বর্তমান ভবিষ্যত সম্পর্কে নানাসব তথ্য। যার উল্লেখযোগ্য অংশ এখানে তুলে ধরা হলো।

একজন এহ্ছানুল হক মিলন

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ.ন.ম এহ্ছানুল হক মিলন চাঁদপুর জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেমিস্ট্রিতে এম.এস.সি ডিগ্রি লাভের পর উচ্চশিক্ষার্থে যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। সেখানে New York Institute of Technology থেকে M.B.A ডিগ্রি লাভ করার পর বেশ কিছুকাল Brooklyn College ও Borough Manhattan College-এ

www.pathagar.com

অ্যাডজাস্ট লেকচারার পদে এবং Super Farm Pharmaceutical Industry-তে কেমিস্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে দীর্ঘদিন তিনি Cloverdale Incorporated-এর Vice President পদে নিয়োজিত ছিলেন।

আ.ন.ম এহ্ছানুল হক মিলন এমপির'র রাজনৈতিক জীবনের কৃতিত্বপূর্ণ উত্তরণের সূত্রপাত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। তিনি ১৯৭৮-৭৯ সালে ফজলুল হক হলের ক্রীড়া সম্পাদক পদে সর্বোচ্চসংখ্যক ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। ১৯৭৯-৮০ সালে তিনি একই হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম আন্ডার গ্রাজুয়েট ভি.পি নির্বাচিত হন। পরবর্তী নির্বাচনেও তিনি দ্বিতীয় বারের মতো ভি.পি নির্বাচিত হন।

ছাত্রজীবনে শিক্ষা ও রাজনীতির পাশাপাশি জনাব মিলন খেলাধুলাতেও সমান পারদর্শী ছিলেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় ভলিবল দলের একজন নিয়মিত খেলোয়াড়। ব্যক্তিজীবনে তিনি বিবাহিত এবং একমাত্র কন্যা-সন্তানের পিতা। তাঁর সহধর্মিণী নাজমুন নাহার বেবী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হল শাখা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সাবেক সভানেত্রী।

কথোপকথন : পর্ব

প্রশ্ন : শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কাজ করতে আপনার কেমন লাগছে?

আ.ন.ম এহ্ছানুল হক মিলন: আমি চ্যালেঞ্জে বিশ্বাসী। আমি মনে করি চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়েই কর্মজীবনে কারো সৃজনশীলতা বিকাশের সুযোগ থাকে। সে কারণেই আমি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পছন্দ করি এবং আমি যে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে আছি, এখানেও চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তাই ভালোই লাগছে। তা ছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয় তো সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মতো এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে কাজ করার মধ্যে আনন্দ আছে।

প্রশ্ন : এই মন্ত্রণালয়ে কাজ করতে কোন অসুবিধা বোধ করছেন কিনা?

আ.ন.ম এহ্ছানুল হক মিলন: চ্যালেঞ্জ যেখানে রয়েছে সেখানে প্রতিবন্ধকতা থাকবেই। তবে আমি সকল প্রতিবন্ধকতার মোকাবিলা করে এগিয়ে যাচ্ছি। সকল অসুবিধা, সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করতেই আমার চ্যালেঞ্জ। আর অসুবিধা কিছু তো থাকাও উচিৎ। তাহলে আমার মেধা খাটানোর সুযোগ বেশি থাকবে। অসুবিধা দূর করতে গিয়ে আমাকে নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করতে হবে। আর এসব কৌশল গ্রহণের মধ্য দিয়েই আমি হয়তো আমার কাজের সঠিক পথ খুঁজে পাবো।

প্রশ্ন : আপনাকে যদি বলা হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় বাদ দিয়ে অন্য কোন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিতে, তখন কোন মন্ত্রণালয় বেছে নেবেন?

www.pathagar.com

আ.ন.ম এহ্ছানুল হক মিলন: চলতি দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিয়ে অন্য মন্ত্রণালয়ে দেয়ার মানেই হচ্ছে, আমি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছি। এক্ষেত্রে আমাকে অন্যকোনো মন্ত্রণালয়ে না দিয়ে বরং দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া উচিত। আমাকেও বুঝতে হবে সঠিক দায়িত্ব পালনে আমি ব্যর্থ হয়েছি, আমাকে সরে দাঁড়াতে হবে।

প্রশ্ন : বর্তমান সরকার গ্রেডিং পদ্ধতিতে বারবার সংস্কার করছে। এতে কি প্রমাণিত হচ্ছে না যে আমাদের শিক্ষার্থীদের মেধা মূল্যায়নে কার্যকর পদ্ধতি গ্রহণে কোথাও না কোথাও ভুল থেকেই যাচ্ছে?

আ.ন.ম এহ্ছানুল হক মিলন: গ্রেডিং পদ্ধতির মানদণ্ড যাচাই হয়ে থাকে আন্তর্জাতিক মান অনুসারে। সে পর্যায়ে শুধু ফলাফল ঘোষণা করলেই চলবে না। সব দিকে নজর দিতে হবে। যেমন প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, উত্তরপত্র দেখা, কারিকুলাম, ইকোনোমিক ব্যাকগ্রাউণ্ড, সিভিল সোসাইটি, শিক্ষকদের মান ইত্যাদি মিলিয়ে শিক্ষার মান যখন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছবে তখনই গ্রেডিং পদ্ধতির সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যাবে। অর্থাৎ, শিক্ষার বিশ্বায়ণের যুগে শিক্ষাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যেতে সব বিষয়ে সমন্বয় থাকতে হবে। সব বিষয়ে মান সঠিক থাকতে হবে। এ-কথা সত্য যে, আমাদের সমসাময়িক মেধাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যেতে শিক্ষাকে যে স্তরে রাখা উচিত, তা হয় নি। তবে ধাপে ধাপে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। গ্রেডিং পদ্ধতির প্রয়োগ এ কারণেই। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে কী করে আরো আধুনিক করা যায়, কী করে আমাদের শিক্ষার্থীদের ফলাফলকে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে মূল্যায়ন করা যায় তা নিয়ে নিরন্তর আমাদের গবেষণা চলছে।

প্রশ্ন : সম্প্রতি এক ঘোষণায় এসেছে এসএসসি পর্যায়ে শিক্ষকদের হাতে থাকবে ৩৬ নম্বর। কথা হচ্ছে এ ৩৬ নম্বর সঠিকভাবে প্রদানে একজন শিক্ষকের যতটুকু পেশাগত সততা ও পেশাগত দক্ষতা থাকা প্রয়োজন আপনার মতে কি সবক্ষেত্রে তা আছে?

আ.ন.ম এহ্ছানুল হক মিলন: ৩৬ নম্বর নয়, আমরা এটাকে কমিয়ে ৩০ নম্বরে নিয়ে এসেছি। বোর্ডের হাতে থাকবে ৭০ নম্বর, বাকি ৩০ নম্বর থাকবে শিক্ষকের হাতে। বোর্ড এবং শিক্ষকের নম্বরের মধ্যে সমন্বয় থাকবে। উভয় ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা পাশ মার্ক থাকতে হবে। শিক্ষকদের ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। এ পদ্ধতি উন্নত বিশ্বেও প্রচলিত। যা কিছুই হোক, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতির অবকাশ যাতে না থাকে, সে ব্যবস্থা অবশ্যই থাকবে। এখনো আছে। অন্যায় যে করে তাকে শাস্তি পেতেই হবে।

প্রশ্ন : ১৯৬২ সালে প্রকাশিত শরীফ কমিশনের (১৯৫৯ সালে গঠিত) সুপারিশ ছিল তিন বছর মেয়াদি বি.এ. কোর্স এবং ২৫ নম্বর ছিল শিক্ষকদের

www.pathagar.com

হাতে। সে পদ্ধতি ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমানে অভিজ্ঞতার আলোয় এসএসসি পর্যায়ে নতুন এ পদ্ধতিকে আপনি কীভাবে দেখছেন? এ সিদ্ধান্তের পক্ষে আপনার সুপারিশগুলো কি কি?

আ.ন.ম এহ্ছানুল হক মিলন: পূর্ববর্তী কমিশন রিপোর্টগুলো ব্যর্থ হওয়ার অনেক কারণ রয়েছে। আমি বলছি না, পূর্বের কমিশন রিপোর্টগুলো খারাপ ছিল। কমিশন রিপোর্টগুলো সুন্দর Paper Work ছিল বটে, বাস্তবসম্মত ছিল না। বর্তমানে যে শিক্ষা কমিশন হচ্ছে তা বর্তমানের সাথে তাল মিলিয়ে করা হচ্ছে। এ কমিশনের মূল উদ্দেশ্য শিক্ষাকে মডারেট করা। Paper Work তৈরির আগে ইকোনোমিক সাপোর্ট সম্পর্কে আগে ভাবতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা, 'আপনি আপনার সন্তানকে স্কুলে পাঠান, খরচ চালানোর দায়িত্ব সরকারের।' এ লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে বর্তমান কমিশন।

প্রশ্ন : এ পদ্ধতিতে কোনো শিক্ষক কারচুপি করছে, পক্ষপাতিত্ব করছে এমন অভিযোগ প্রমাণিত হলে তার বিরুদ্ধে কী ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পদক্ষেপ নিবেন?

আ.ন.ম এহ্ছানুল হক মিলন: কোনো শিক্ষক যদি দায়িত্বে অবহেলা করেন, কারচুপি কিংবা কোনো প্রকার দুর্নীতির আশ্রয় নেন এবং তা প্রমাণিত হয়— সেক্ষেত্রে অবশ্যই শাস্তির বিধান রয়েছে এবং এ শাস্তি হবে দৃষ্টান্তমূলক। যাতে এ ধরনের অপরাধ অন্য কোনো শিক্ষক আর কখনো করার সাহস না পান।

প্রশ্ন : আপনার কি মনে হচ্ছে না এ পদ্ধতি প্রবর্তনে শিক্ষকদের দুর্নীতির ক্ষেত্র আরো বেড়ে যাবে?

আ.ন.ম এহ্ছানুল হক মিলন: না, আমি মনে করি না। তাহলে উন্নত বিশ্বে এ পদ্ধতি গ্রহণযোগ্যতা পেত না। শিক্ষকদের পেশাগত সততা থাকতে হবে। অসৎ হবার কোনো সুযোগও আমরা রাখবো না।

প্রশ্ন : আমাদের দেশে আজ তিন ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি চালু আছে, এসএসসি, দাখিল এবং ও লেভেল। মাদ্রাসার মধ্যেও দুটো ভাগ। এই যে একটা এলোমেলো অবস্থা, এতে কি মেধা মূল্যায়নে জটিলতা তৈরি হচ্ছে না? শিক্ষা পদ্ধতিকে ভেঙে কি একটি অভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতি তৈরি করা যায় না?

আ.ন.ম এহ্ছানুল হক মিলন: আমিও চাই ইউনিফর্ম শিক্ষানীতি চালু হোক। আমি চাইলেই তো আর হবে না। সময়, অর্থ প্রয়োজন। জেনারেল এডুকেশনের পাশাপাশি আমরা মাদ্রাসা শিক্ষাকেও আধুনিক করতে চাই। ধর্মীয় বোধকে গুরুত্ব দিয়েই মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকায়ন করা হবে। ধর্মীয় শিক্ষা যাতে সমাজে কর্মবিমুখ, বেকার সৃষ্টি না করে সে দিকে খেয়াল রেখেই নীতি প্রবর্তিত হবে। তবে ধর্মীয় শিক্ষাকে জেনারেল শিক্ষা করা আদৌ সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

তেমনিভাবে ইংরেজি শিক্ষার দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হবে। English Medium School থাকবে, শিক্ষা থাকবে। কিন্তু এটাকে দেশের আলোকে সাজাতে হবে। পরিভাষা ইংলিশ হবে, Thought হবে দেশীয়।

প্রশ্ন : English Medium এ পড়ানোর জন্য সেরকম কোনো প্রকাশনা নেই। এ ক্ষেত্রে সরকারেরও কোনো উদ্যোগ আছে বলে মনে হয় না। আপনি কী মনে করেন English Medium-এ পড়ানোর জন্য প্রকাশনার দিকটি দেখাও জরুরি?

আ.ন.ম এহ্ছানুল হক মিলন: অবশ্যই এটি একটি Important thing. English Medium স্কুলগুলোর জন্য ভালো প্রকাশনা না থাকার কারণ আমাদের মার্কেট ছোট। English Medium School-গুলোয় শিক্ষার্থী সংখ্যা কম হওয়ার কারণে প্রকাশকরা বই প্রিন্ট করছে না। English Medium এর জন্য সরকার মনিটরিং সেল গঠন করছে। বিদেশী বইয়ের আলোকে আমাদের দেশীয় পটভূমিতে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের বই কী করে করা যায় তা নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে।

প্রশ্ন : প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সংক্রান্ত অধ্যাদেশে যে-সব শর্তাবলি উল্লেখ আছে বর্তমানে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কি তা ঠিকমতো পালন করছে? না করলে তাদের বিরুদ্ধে কি ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন?

আ.ন.ম এহ্ছানুল হক মিলন: আমাদের দেশে অনেক অধ্যাদেশই সঠিকভাবে পালন করা হয় না। সেক্ষেত্রে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ব্যতিক্রম নয়। তবে শিক্ষা যেহেতু আলাদা একটি ব্যাপার, শিক্ষার সাথে যেহেতু জাতির উন্নয়ন সম্পর্কিত, তাই অন্যসব বিষয়ের সাথে শিক্ষাকে মেলানো ঠিক নয়। যারা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে উচ্চশিক্ষা প্রদান করবে, তাদের অবশ্যই সৎ, নিষ্ঠাবান ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে। তাদেরকে মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত হওয়া ঠিক হবে না। কারণ, সরকারের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমোদন প্রদানের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে। যখন দেখা যাবে সে লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কাজ করছে না, তারা শিক্ষার মানের দিকে না ছুটে অর্থের দিকে ছুটছে তখন অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যানকে প্রধান করে নয় সদস্য বিশিষ্ট মনিটরিং সেল গঠন করা হয়েছে। গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এ সেলের সদস্য। যারা অধ্যাদেশ অমান্য করছে তারা মনিটরিং-এ ধরা পড়বে এবং আমরা যথাযথ ব্যবস্থা নেব।

প্রশ্ন : প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখন কমার্শিয়াল ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত হয়েছে। এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি? এখান থেকে বের হওয়া ছাত্রছাত্রীরা বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক কর্মক্ষেত্রে কতটা সাফল্যের মুখ দেখবে বলে আপনার

www.pathagar.com

মনে হয়?

আ.ন.ম এহ্ছানুল হক মিলন: আমি তা মনে করি না। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কখনোই কমার্শিয়াল ইন্ডাস্ট্রি নয়। এগুলোকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবেই আমি দেখছি।

বর্তমান বিশ্ব Open Marketing-এর যুগ সত্য। তবে শিক্ষার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক চিন্তাধারা থাকা ঠিক নয়। সার্টিফিকেট সঠিকভাবে দেওয়া হলে শিক্ষার্থীরা অবশ্যই প্রতিযোগিতামূলক কর্মক্ষেত্রে টিকে থাকবে। সার্টিফিকেট সঠিকভাবে দেওয়া হচ্ছে কিনা, তার জন্য সেন্ট্রাল পরীক্ষা পদ্ধতি থাকলে বোঝা যাবে। বর্তমানে যেভাবে সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে তা সঠিকভাবে দেওয়া হচ্ছে কি-না নিরূপণ করার জন্য ইতোমধ্যে কিছু কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে।

প্রশ্ন : উন্নত দেশগুলোতে সবকিছুই পরিকল্পিতভাবে হয়। দেশের জন্য কতজন ইঞ্জিনিয়ার প্রয়োজন, কতজন ডাক্তার প্রয়োজন, কতজন উকিল প্রয়োজন, দেশের প্রশাসনিক কার্য সম্পাদনের জন্য কতজন প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দক্ষ লোক প্রয়োজন, সে অনুযায়ী তারা ছক তৈরি করে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির কোটা তৈরি করে। আমাদের দেশে সে রকম কোন স্টাডি বা গবেষণা আছে কি? না থাকলে সরকারিভাবে এ ধরনের ব্যবস্থাগ্রহণ জরুরি কি-না? আমাদের দেশে ধরে নিচ্ছি আজ দু'লক্ষ এমএ পাশ লোক আছে। দু'লক্ষ এম এ পাশ লোক আমাদের প্রয়োজন কিনা? না থাকলে কেন তাদেরকে সার্টিফিকেট দিচ্ছি?

আ.ন.ম এহ্ছানুল হক মিলন: বিষয়টা হচ্ছে-Cut your coat according to your cloth. অর্থ থাকলে যে-কোনো পরিকল্পনাই সফলভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। আমিও মনে করি আমাদের দেশের ডিমাণ্ড অনুযায়ী শিক্ষার এলোকেশন প্রয়োজন। শুধু সাধারণ শিক্ষা নয়, কারিগরি শিক্ষার দিকেও জোর দিতে হবে। অথচ ১৪০ মিলিয়ন মানুষের দেশে একটা মাত্র টেক্সটাইল কলেজ রয়েছে। আমাদের আরো টেক্সটাইল কলেজ প্রয়োজন, আইটি কলেজ প্রয়োজন, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রয়োজন। তাহলেই আমাদের মেধাবী শিক্ষার্থীদের ধরে রাখা সম্ভব হবে। চাহিদা অনুযায়ী সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য আমরা প্রস্তুত।

প্রশ্ন : দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ৫-১০ টাকা বেতনে ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করছে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে একজন ছাত্রছাত্রীকে ৫-১০ হাজার টাকা মাসে বেতন দিতে হচ্ছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীর পেছনে সরকারকে বিপুল পরিমাণ টাকা ভর্তুকি দিতে হচ্ছে। এ ভর্তুকির টাকায় আছে দেশের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের খাজনা। সরকারের উদ্দেশ্য মহৎ। পাশ করে ঐ সব ছাত্রছাত্রীরা দেশের সেবা করবে। কিন্তু সব সময় তা হচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে পাশ করে তাদের অনেকেই চলে যাচ্ছে বিদেশে।

www.pathagar.com

দেশের সাথে তাদের কোনো যোগাযোগ নেই। এক্ষেত্রে এটা ভাবলে কেমন হয় যে সে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ডিগ্রিটা নেবে তার সাথে তার পেছনে ব্যয় হওয়া রাষ্ট্রীয় ভর্তুকিরও একটা সার্টিফিকেট ধরিয়ে দিয়ে বলা হবে— তোমার পেছনে রাষ্ট্র এত টাকা ব্যয় করেছে। কর্মজীবনে প্রবেশ করে তুমি এ টাকা সুদে-আসলে রাষ্ট্রকে শোধ করবে। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

আ.ন.ম এহছানুল হক মিলন: এটা একটা বৃহৎ চিন্তার বিষয়। এ প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর নেই। অবশ্যই রাষ্ট্র একজন শিক্ষার্থীর পেছনে যে টাকা ব্যয় করছে, শিক্ষার্থী তা ফেরত দিতে বাধ্য। তবে এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা প্রয়োজন। একজন শিক্ষার্থীর পেছনে রাষ্ট্র যে টাকা ব্যয় করছে, তা স্টুডেন্ট লোনের মাধ্যমে প্রথমে শিক্ষার্থীকে টাকার অংকটা জানিয়ে দিতে হবে। যাতে পরবর্তী জীবনে সে এই টাকা ফেরত দিতে পারে। এ পদ্ধতি বিশ্বের অনেক দেশেই প্রচলিত। ভবিষ্যতে এ ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার চিন্তা করছে সরকার।

প্রশ্ন : আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নকল প্রবণতা রোধ করার জন্য আপনি যে আন্দোলন করছেন তার প্রশংসা করছি। ছাত্রছাত্রীরা নকল করলে তাদের বহিষ্কার করা হচ্ছে। কিন্তু এই নকলের দায় কি শুধু ছাত্র কিংবা ছাত্রীর একার? খানিকটা তার শিক্ষকের ওপরও কি পড়া উচিত নয়? কেন তার ছাত্রকে নকল করতে হচ্ছে? কেন সে তার ছাত্রকে নকল ছাড়া পরীক্ষা দেয়ার জন্য প্রস্তুত করতে পারেনি? সুতরাং শুধু ছাত্রকে নয়, এই নকলের দায়ভার খানিকটা ঐ শিক্ষকেরও কি নেয়া উচিত নয়?

আ.ন.ম এহছানুল হক মিলন: শুধু শিক্ষক কেন? অভিভাবক, সমাজসেবী, রাষ্ট্র সকলকেই এ দায়িত্ব নিতে হবে। নকল একটা সরাসরি দুর্নীতি। এটাকে চলতে দেওয়া যায় না। কোনো সচেতন মানুষই এটাকে চলতে দিতে পারেন না। নকল প্রতিরোধে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। এটাকে সামাজিক আন্দোলন হিসেবে আরো ভালোভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। নকলকারীদেরকে চিহ্নিত করে তাদেরকে ঘৃণা করতে হবে। যারা এ কাজে সহযোগিতা করে তাদেরকেও ঘৃণার পাত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যে সকল শিক্ষক নকলের মতো একটি ঘৃণিত বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদেরকে সহযোগিতা করে তারা আসলে জাতির শত্রু। এসব শত্রুদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা আমরা করবো।

প্রশ্ন : এবার একটি অন্য ধরনের প্রশ্ন। এইচএসসি পরীক্ষা চলাকালে পত্রিকায় একটা ছবি ছাপা হয়েছে। নকলের দায়ে অভিযুক্ত কিছু মাদ্রাসার ছাত্র ও তাদের অভিভাবক আপনার পায়ে হুমড়ি খেয়ে ক্ষমা চাচ্ছে। আমরা কি এর বিপরীত কোনো দৃশ্য কল্পনা করতে পারি না? পরীক্ষার হলে ছাত্রছাত্রীরা নকল করছে এ দৃশ্য দেখে সরকারের কোন মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী লজ্জায় অপরাধবোধে মাথা

www.pathagar.com

নিচু করে হলো থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। তারপর তারা নকলরত ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের সামনে হাত জোড় করে বলছে, আমাকে আপনারা ক্ষমা করুন। আমি ব্যর্থ, আমি আমার দেশের শিক্ষকদের দিয়ে ছাত্রছাত্রীদেরকে নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত করাতে পারিনি। আমি কথা দিচ্ছি আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আমি এ ব্যর্থতাকে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করব। এমন কোনো দৃশ্য কি আপনি কখনো কল্পনা করেন?

আ.ন.ম এহছানুল হক মিলন: এ-কথা অস্বীকার করব না, বিদেশে এ-রকম একটি দৃশ্যের কারণে একজন শিক্ষামন্ত্রী মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করেন। আমাদের দেশে এমনটি কখনো ঘটে না। কারণ, সরিষায় ভূত থাকলে ভূত তাড়াবে কে? এ ক্ষেত্রে আমার একার দায় নয়। আমি যদি ৩২ বছর যাবৎ মন্ত্রী থাকতাম, তাহলে এর দায়ভার আমি বহন করতাম এবং আপনার কথাটি মেনে নিয়ে বলতাম, 'হ্যাঁ'।

প্রশ্ন : শিক্ষাব্যবস্থা, কারিকুলাম, বই ইত্যাদি তৈরির ক্ষেত্রে কনটিনিউয়াস রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের কাজগুলো কারা করছে? এদের নিয়োগের ক্ষেত্রে দক্ষতা কিংবা যোগ্যতা কতটুকু নিরপেক্ষভাবে হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন?

আ.ন.ম এহছানুল হক মিলন: নিরপেক্ষভাবে হচ্ছে মনে করি না। এটা সরকারের আমলাতান্ত্রিক ব্যাপার। সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর জন্য মনিটরিং সেল রয়েছে। তারা কাজ করছে। আমার ক্ষেত্রে বলতে পারি, আমি যা কিছুই করছি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টি থেকেই করছি। নিষ্ঠার সাথে, দায়িত্বের সাথে করছি।

প্রশ্ন : আমাদেরকে সময় সময় শিক্ষা কমিশন গঠন করতে হয় কেন?

আ.ন.ম এহছানুল হক মিলন: বিগত সরকারগুলো সুন্দর Paper Work, সুন্দর শিক্ষা কমিশন করে গেছেন ঠিক; কিন্তু সেগুলো বাস্তবের সাথে সংগতি রেখে করা হয়নি। তাই সুন্দর Paper Work হওয়া সত্ত্বেও সেগুলো আলোর মুখ দেখে নি।

প্রশ্ন : আমাদের দেশে প্রতিবছর প্রায় ৩৫ লাখ বাচ্চা জন্ম নিচ্ছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে এসে পরীক্ষা দিচ্ছে ৫-৬ লাখ। বাকি ৩০-৩১ লাখ কোথায় যাচ্ছে?

আ.ন.ম এহছানুল হক মিলন: হ্যাঁ, শিশুদের বড় অংশটিই মাধ্যমিক শিক্ষার আগেই ঝরে যায়। সে সব শিশুদের অর্থাৎ, যারা উচ্চশিক্ষার আগেই ঝরে যাচ্ছে, তাদের একটা অংশকে Vocational শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। আমরা এসব শিশুদের নিয়ে ভাবছি কী করে তাদেরকে জনসম্পদে রূপান্তর করা যায়। এজন্যে আরো বেশি পরিমাণে কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি করা হবে। সকল শিক্ষার্থীর সর্বোচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সামর্থ নেই। তাই তাদের কথা চিন্তা করে কী করে অল্প শিক্ষা নিয়েও দেশের উন্নয়নে কাজ করতে পারে সেদিকে আমরা দৃষ্টি দিচ্ছি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : এনসিটিবি'র রিসার্স অফিসার/স্পেশালিস্ট কারা? আপনার মতে প্রকৃত যোগ্য লোকদের খুঁজে বের করে এনে কি রিসার্স ওয়ার্কে ঢোকানো হচ্ছে?

আ.ন.ম এহছানুল হক মিলন: সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী অনেক ক্ষেত্রেই যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য জায়গায় দেওয়া সম্ভব হয় না। তবে এটা সেনসিটিভ একটা সেক্টর। এসব জায়গায় অবশ্যই উপযুক্ত লোক থাকা প্রয়োজন। কারণ, দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ে যারা গবেষণা করবেন তাদেরকে অবশ্যই নিষ্ঠাবান ও উপযুক্ত হতে হবে।

প্রশ্ন : আমাদের দেশের শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি? আপনি কি মনে করেন বর্তমানে শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি সঠিক? না হলে নতুন কোন পদক্ষেপ নেয়ার কথা চিন্তা করছেন কি-না?

আ.ন.ম এহছানুল হক মিলন: বর্তমানে শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি মোটেই সঠিক নয়। তবে সার্টিফাইড রেজিস্টার কনসেপ্টে শিক্ষক নিয়োগ করা হলে অনেকটা স্বচ্ছতা ফিরে আসবে।

প্রশ্ন : বর্তমানে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল খুব দ্রুত ডেভেলপ করছে। এখন জেলা শহরগুলোতেও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল চালু হয়ে গেছে। স্পষ্টতই এটা এখন লক্ষ করা যাচ্ছে যারা ধনী তাদের ছেলেমেয়ে চলে যাচ্ছে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে আর যারা গরিব তাদের ছেলেমেয়ে যাচ্ছে বাংলা মিডিয়াম স্কুলে। এতে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দুটো শ্রেণী তৈরি হচ্ছে। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?

আ.ন.ম এহছানুল হক মিলন: দুটো নয়, একাধিক শ্রেণী তৈরি হচ্ছে। এদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব। এ লক্ষ্যে আমরা কাজও করছি। তবে আমাদের সময় প্রয়োজন। সবকিছু একদিনে করা সম্ভব নয়। যে কোনো পলিসি ইমপ্লিমেন্ট করতে সময় প্রয়োজন।

প্রশ্ন : প্রচলিত শিক্ষা এবং পরীক্ষা পদ্ধতি ছাত্র-ছাত্রীদের নোটবই নির্ভরতার পক্ষে। দেশের প্রচলিত শিক্ষা এবং পরীক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন না এনে সরকার অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নোটবই নিষিদ্ধ করেছেন। ফলশ্রুতিতে শিক্ষার্থীদের চাহিদার কথা ভেবে প্রকাশকরা কিন্তু এই নিষিদ্ধ নোটবই ছাপছেন এবং শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগণ এ নিষিদ্ধ নোটবই কিনছেন। এতে সামাজিকভাবে এ আইনটি অকার্যকর হয়ে পড়ছে। এমতাবস্থায় হয় এ আইনটি প্রত্যাহার করে নেয়া দরকার নতুবা প্রচলিত শিক্ষা এবং পরীক্ষা পদ্ধতিতে এমন মৌলিক পরিবর্তন আনা দরকার যাতে শিক্ষার্থীকে নোট/গাইড বই নির্ভর না হতে হয়। আপনার অভিমত কি?

আ.ন.ম এহছানুল হক মিলন: আপনার প্রশ্নেই উত্তর রয়েছে। তবে এ দেশে সব বিষয়েই আইন ছিল। যেমন করে এতোদিন পাবলিক পরীক্ষায় নকলের বিরুদ্ধেও আইন ছিল, কার্যকর ছিল না।

www.pathagar.com

নোটবইয়ের ব্যাপারটি নিয়ে আমরা ভাবছি। যেহেতু এখন পর্যন্ত আইনে নোটবই নিষিদ্ধ, তাই নতুন কোনো সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত নকলের মতো নোটবইয়ের বিরুদ্ধেও আন্দোলন শুরু করব।

প্রশ্ন : আমাকে সময় দেয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

আ.ন.ম এহছানুল হক মিলন: আপনাকেও ধন্যবাদ।

***এরপর পি.এস: সোহেলকে বললেন, 'সোহেল, ঢালী ভাই যেসব প্রশ্নগুলো করেছে, এগুলো কম্পোজ করে আমাকে দিও। প্রশ্নগুলোর ভেতরে অনেক প্রশ্ন এবং উত্তর রয়েছে— যা আমার দরকার হবে।'*

পুনশ্চ: সকাল দশটায় সফরসঙ্গী হলেও একে একে তিনটি জনসভা শেষ করে আ.ন.ম এহছানুল হক মিলন আমাকে ছাড়েন রাত প্রায় সাড়ে এগারোটায়, মিলনের বাসা গুলশান একনম্বরে। তিনি আমার বাসা ফরিদাবাদে পৌঁছে দিতে ড্রাইভারকে বলেন। আমি আপত্তি করি। আমার আপত্তি টিকে বেইলি রোড পর্যন্ত। বেইলি রোড নেমে মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন গাড়ি থেকে নেমে আসি, তখন তিনি আমাকে বলেন আমার উত্তর ছাপেন আর নাই ছাপেন প্রশ্নগুলো ছাপবেন।

www.pathagar.com

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান সন্তোষজনক নয়

—প্রফেসর ড. এম আসাদুজ্জামান

প্রফেসর ড. এম আসাদুজ্জামান বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এ গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার আগে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডীন হিসেবে পরপর চারবার নির্বাচিত হন। শিক্ষায় অনবদ্য অবদানের জন্য তিনি এ বছর জিয়া স্বর্ণপদক ও অতীশ দীপঙ্কর স্বর্ণপদকে ভূষিত হয়েছেন। সিনিয়র ফুলব্রাইট স্কলার এবং কলম্বো প্ল্যান স্কলার এ শিক্ষাবিদের রয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল কর্মময় জীবন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অস্ট্রেলিয়ায় পড়াশোনা শেষ করে তিনি যোগ দেন নটরডেম কলেজে। সেখানে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি যোগ দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগে। উক্ত বিভাগের চেয়ারম্যান পদে ১৯৯৪-৯৭ সালে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। সফল কর্মজীবনে বিভিন্ন সময়ে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য, ইন্সটিটিউট অব হেল্থ ইকোনমিক্স এর কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য, জাতীয় শিক্ষা কমিশন, ২০০৩-এর সদস্যপদ, উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি, ব্যবসায় প্রশাসন ইন্সটিটিউটের বোর্ড অব গভর্নরস্ এর সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের বোর্ড অব গভর্নরস্ এর সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ইন্সটিটিউটের বোর্ড অব গভর্নরস্ এর সদস্য, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-এর বোর্ড অব গভর্নরস্ এর সদস্য ছাড়াও ৩০টি প্রফেশনাল বডির সদস্য হিসেবে দায়িত্বে পালন করেছেন। তার গবেষণার সংখ্যা ৪৬টি। নরসিংদীতে জন্মগ্রহণকারী এ শিক্ষাবিদ পেশাগত কাজে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক, পোল্যান্ড, ভারত, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, সিংগাপুর, থাইল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়াসহ আরো অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেন। পাঞ্জেরী শিক্ষা সংবাদ এর দায়িত্ব থাকাকালীন সময় ড. এম আসাদুজ্জামান এর একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি পত্রিকার প্রধান প্রতিবেদন হিসেবে। একান্ত কথোপকথনে তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে আমাদের বর্তমান ও অতীত শিক্ষাব্যবস্থার নানা ত্রুটি ও নানা সম্ভাবনার কথা। আমার সাথে কথোপকথনে অংশগ্রহণ করেন লেখক-সাংবাদিক ফিরোজ আশরাফ।

ফিরোজ আশরাফ : আমরা জানি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পদ। এ পদে দায়িত্বপালন করতে পেরে আপনার কেমন

www.pathagar.com

লাগছে?

ড. এম. আসাদুজ্জামান : আমার খুব ভালো লাগছে। আমি মহান আল্লাহ্‌র কাছে কৃতজ্ঞ যে তিনি আমাকে এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আমার কর্মজীবনে লিখে রেখেছিলেন। পাশাপাশি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। তিনি আমাকে এ সুযোগ দিয়েছেন।

হুমায়ূন কবীর ঢালী : এ দায়িত্ব পাবার জন্য আপনার কতটা মানসিক প্রস্তুত ছিল?

ড. আসাদুজ্জামান : কোনোরকম মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। আমার কোনো ইন্টারভিউ নেয়া হয়নি। আগেভাগে কোনো ইশারাইঙ্গিতও পাইনি। কোনোরকম চেষ্টা-তদবিরও করিনি। আমার কোনো বায়োডাটাও চাওয়া হয়নি। যতদূর জানতাম জনা দশেক সিনিয়র শিক্ষাবিদ এ পদের জন্য নানারকম তদবির করে আসছিলেন। একদিন রাতের বেলা প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে পাওয়া টেলিফোনে জানলাম আমাকে মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান করা হয়েছে। সকালে জয়েন করতে হবে। তাদেরকে বাদ দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে এ দায়িত্ব দিয়েছেন তার জন্য আমি তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।

ফিরোজ আশরাফ : আমরা জানি যে পদ যত বেশি গুরুত্বপূর্ণ সে পদে আসীন হয়ে কাজ করাটা তত বেশি কঠিন। নানারকম চাপের মধ্যে থাকতে হয়, নানা লোক ও গোষ্ঠীর মনরক্ষা করে চলতে হয়। স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা অনেকটা সীমিত হয়ে আসে। আমি বলতে চাচ্ছি আপনার এ পদে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর আপনাকে এ রকম কোনো সমস্যায় পড়তে হয়েছে কি-না?

ড. আসাদুজ্জামান : না, আমাকে এ রকম কোনো সমস্যায় পড়তে হয়নি। আমি মনে করছি কিছু-কিছু চাপ মানুষ নিজে সৃষ্টি করে। তারা এমন কিছু কাজ করে যাতে অন্যরা তাদের ওপর সুযোগ নেবার চেষ্টা করে। সে রকম কোন চাপ আমার ওপর সৃষ্টি হবে আমি এমনটা মনে করি না। সুতরাং সমস্যারও কোনো কারণ দেখছি না। আমি মনে করছি স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ আমার এখানে পর্যাপ্ত আছে। আমি মূলত একজন শিক্ষক। সারাজীবন শিক্ষকতা করে এসেছি। আর আমার বর্তমান দায়িত্ব শিক্ষক-শিক্ষার্থীদেরকে নিয়েই। এর আগেও আমি শিক্ষক সমিতির চেয়ারম্যান ছিলাম। আমি শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সমস্যা কোথায় তা জানি। তাই আমি মনে করি এ অবস্থানে থেকে আমি আমার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারব।

হু.ক. ঢালী : বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে আপনার স্বাধীন মত প্রকাশে কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না?

ড. আসাদুজ্জামান : মোটেই না। আমার স্বাধীনতার ওপর এখানে কেউ কোনো হস্তক্ষেপ করে না। তেমনি সিদ্ধান্ত গ্রহণেও বায়াস্‌ড হতে হচ্ছে না।

www.pathagar.com

স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের চমৎকার একটি জায়গা এটা। মঞ্জুরি কমিশনের সম্মানিত সদস্যরাও আমার সাথে সহযোগিতা করছেন। এখানকার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সহযোগিতা করছেন। ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে একটি অনকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পেরেছি বলে আমি মনে করি।

ফিরোজ আশরাফ : আপনি এখানে আসার পর উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নে কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন?

ড. আসাদুজ্জামান : এখানে আসার পর যে কাজগুলো হাতে নিয়েছি তা হলো বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজমান অর্থনৈতিক অব্যবস্থার বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং এ লক্ষ্যে ১৩ দফা নির্দেশাবলি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়েছি। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগের ব্যাপারে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি ইউনিফর্মড রিক্রুটমেন্ট পলিসি প্রণয়ন করেছি। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অর্থব্যবস্থা ও নিয়োগের অভিন্ন নীতিমালা গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ ছাড়া পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার গুণগত মান উন্নয়নে Accriditation Council গঠন করা হয়েছে। এ কাউন্সিলের সুপারিশমালাও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

ফিরোজ আশরাফ : আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় মাঝে মাঝেই পরিবর্তন আনা হচ্ছে। সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঘোষণা করেছে এসএসসিতে ৩৬ নম্বর ছেড়ে দেয়া হবে শিক্ষকদের হাতে। ছাত্র-ছাত্রীদের নানারকম সোশ্যাল, কালচারাল, মোর্যাল পারফরমেন্স দেখে শিক্ষকরা এ নম্বর দেবেন। এ সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

ড. আসাদুজ্জামান : শিক্ষকরা জাতির বিবেক। 'দে আর ন্যাশন বিল্ডার্স।' তাই তাদের কাছে দায়িত্ব দেয়াটা দোষের কিছু নয়। একজন শিক্ষক একজন ছাত্রের জন্য ফ্রেন্ড, ফিলসফার ও গাইড। ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ক্রিয়েটিভিটি তৈরি করাটা শিক্ষকদের দায়িত্ব।

বৈষয়িক নানা দিক যেমন পার্থিব ঐশ্বর্য, লোভ, প্রাপ্তি, বিত্তানুসন্ধান ইত্যাদি থেকে আমাদের শিক্ষকদেরকে মুক্ত থাকতে হবে। শিক্ষকতা একটি মহান ব্রত। 'ব্রত' হিসেবে যতদিন আমাদের শিক্ষকরা এ পেশাকে মেনে নিতে না পারবে ততোদিন জাতি হিসেবে আমরা উপরে উঠতে পারব না। আমাদের শিক্ষকদের মানসিক দীনতা কমাতে হবে। যেখানে হতাশা, নৈরাশ্য বিরাজ করে সেখানে সৃজনশীলতার বিকাশ সম্ভব নয়।

হ.ক. ঢালী : সৃজনশীলতা সম্পর্কেই তাহলে বলি, আপনার মতে আমাদের দেশের শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কতোটুকু সৃজনশীলতা তৈরি করতে পারছে বলে আপনি মনে করেন?

ড. আসাদুজ্জামান : যেটা পারছে সেটা মোটেই সন্তোষজনক নয়, একটা দৃষ্টান্ত দিয়েই তাহলে বলি। ক্লাস থ্রির একজন ছাত্র। বাবা অঢেল পয়সাঅলা।

www.pathagar.com

প্রতি সাবজেক্টের জন্য তিনজন করে টিচার রাখলেও তার আয়ব্যয়ের হিসাব টলবে না। তো কী হলো, বিত্তানুসন্ধানেই সব সময় বাবা-মা দুজনকে ব্যস্ত থাকতে হয়। এই সন্তানের বিদ্যাশিক্ষার দায়িত্ব প্রাইভেট টিউটরদের ওপর ছেড়ে দিয়ে তারা নিশ্চিন্তে বিত্তানুসন্ধান করে চলছেন। সকালে এই সন্তানকে এক টিউটর এসে গরুর রচনা লেখার 'হোম টাস্ক' দিয়ে চলে গেলেন। উদ্দেশ্য গরুর রচনা লিখতে গিয়ে তার চোখ খুলবে। জ্ঞানের প্রসার হবে। ছাত্রের কল্পনাশক্তি বৃদ্ধি পাবে। কারণ, গরুর রচনা লিখতে গেলে তাকে একটি গরু কল্পনা করতে হবে। কিন্তু বাস্তবে যা ঘটলো তা অন্যরকম। প্রতিনিয়ত শিক্ষকের চাপে সন্তানের গরু কল্পনা করার সময় নেই। বিকেলে আরেক টিউটর এসে সুন্দরভাবে একটা গরুর রচনা লিখে দিয়ে গেলেন। পরদিন আগের শিক্ষক এসে দেখল ছাত্রের খাতায় চমৎকার গরুর রচনা লেখা। খুশি হয়ে তিনি ছাত্রকে 'এক্সেলেন্ট' দিয়ে চলে গেলেন। তো হলো কী। বাস্তবিকপক্ষে ঐ ছাত্রের প্রকৃত বিদ্যা অর্জন কতোটুকু হলো। তার সৃজনশীলতা কতোটুকু বিকশিত হলো। এগুলো আমাদের ভাবতে হবে। আমরা নিজেরাই আমাদের সন্তানদের সর্বনাশ করছি। তারা বেড়ে উঠছে একটি অসৃজনশীল পরিবেশে।

হ.ক. চাষী : শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণ, প্রায়োগিক ও উন্নতবিশ্বের সাথে সামঞ্জস্যকরণ নিশ্চিত করার জন্য মাঝে মাঝেই আমাদের দেশে শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। সে কমিশন তার রিপোর্টও পেশ করে। কিন্তু সে রিপোর্ট সব সময় আলোর মুখ দেখে না। আবার কখনো-কখনো দেখলেও তার প্রয়োগ হয় না। তাহলে এই যে কমিশন গঠন, সময়ক্ষেপণ, অর্থনাশ ইত্যকার ব্যাপারগুলো আপনি কোন চোখে দেখেন?

ড. আসাদুজ্জামান : আসলে শিক্ষা কমিশন গঠন করার প্রয়োজনীয়তা আছে। শিক্ষাব্যবস্থায় চলমান অনগ্রসরতা, অসংগতি ইত্যাদি নিরসনেই এ কমিশনগুলো গঠন করা হয়। কমিশন রিপোর্টও তৈরি করে কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গিয়ে দেখা যায় নানা সমস্যা, যেটা আগে ভাবা হয়নি। স্বাধীন জাতি হিসেবে আমাদের বয়স বেশি নয়। আমাদেরকে নানা ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়েই এগুতে হবে। নানান ভুল আর অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়েই একদিন আমরা পরিপূর্ণ একটা ব্যবস্থা পেয়ে যাবো। তা ছাড়া আমাদের সম্পদ সীমিত। এই সীমিত সম্পদের ভেতর দিয়েই আমাদেরকে এগুতে হয়।

ফিরোজ আশরাফ : আমি পুরনো একটি প্রসঙ্গে ফিরে যেতে চাচ্ছি। কিছুক্ষণ আগে যেটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম।

ড. আসাদুজ্জামান : কোন ব্যাপারটা?

ফিরোজ আশরাফ : আমি বলতে চাচ্ছিলাম, মাধ্যমিক পর্যায়ের পরীক্ষায় শিক্ষকদের হাতে যদি এতোগুলো নম্বর চলে যায় তাহলে ব্যাপক দুর্নীতির একটা

www.pathagar.com

ক্ষেত্র কি তৈরি হয়ে যাবে না?

ড. আসাদুজ্জামান : সমস্যা যেখানে আছে, সমাধানও সেখানে আছে। অবশ্যই ক্লোজলি মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে। সবার আগে প্রয়োজন মূল্যবোধ। এটা ঠিক করলে সব ঠিক। এটা হচ্ছে বাড়ির প্রধান দরজা। এ দরজায় পাহারা নিশ্চিত করতে হবে। তাহলে ভেতরের ঘরগুলো নিয়ে চিন্তা করার কোনো কারণ থাকবে না। সামগ্রিক সমাজব্যবস্থা থেকেই মূল্যবোধ উঠে গেছে। আমরা এখন অন্যের ভালো কাজকে বিবেচিত করি না। মূল্যায়ন করি না। জাতি হিসেবে আমরা বিভাজিত। আমাদের রাজনীতিকদের মধ্যে নীতি নেই, আদর্শ নেই। এসব নানা কারণেই আমাদের মধ্যে মূল্যবোধ তৈরি হচ্ছে না। আমাদের উন্নয়নে সুস্থ সমন্বিত রাজনৈতিক সংস্কৃতি অত্যাবশ্যকীয়।

হ.ক. ঢালী : এবার অন্য প্রসঙ্গে আসি। শিক্ষা বাণিজ্যিকীকরণের একটা প্রবণতা আমাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এটা নিয়ে আপনি চিন্তিত কি-না?

ড. আসাদুজ্জামান : চিন্তার কি আছে? আমি মনে করি যে কোনো দেশের উন্নয়নের জন্য প্রাইভেট সেকটরকে উৎসাহিত করা উচিৎ। আমাদের দেশের প্রাইভেট সেকটর অবহেলিত ছিল। সরকার এ কারণে শিক্ষাকে বেসরকারিকরণ করতে চেয়েছে। এক্ষেত্রে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যদি অর্থের পেছনে না ছুটে মানের দিকে নজর দেয় তাহলে শিক্ষা বানিজ্যিকীকরণ দোষের কিছু নয়। এখন মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগ। যেক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা যত বেশি থাকবে সেক্ষেত্রে তত কোয়ালিটি বেরিয়ে আসবে। একসময় সিটিসেল কোম্পানি একচেটিয়া মোবাইল ফোনের ব্যবসা করে এসেছে। তখন একটা মোবাইল কিনতে এক-দেড় লাখ টাকা খরচ হতো। নেটওয়ার্ক ছিল খুব লিমিটেড। এখন প্রতিযোগি কোম্পানি এসেছে। এখন একটা সিটিসেল কোম্পানির মোবাইল কিনতে কত টাকা লাগে? আবার বিআরটিসির কথা ভাবুন। বিআরটিসিতে কেউ চড়তো না। সব গাড়ি অচল হয়ে কমলাপুরের ডিপোয় পড়ে থাকতো। এটা ছিল সরকারের বড় একটি লোকসানি খাত। বেসরকারি উদ্যোগে ছেড়ে দেবার পর বিআরটিসিতে কি এখন মানুষ চড়ছে না? বেসরকারি সংস্থায় পয়সা বেশি যাচ্ছে এটা ঠিক। কিন্তু সেবার মানতো বেড়েছে। উন্নত সেবা পেতে হলে পয়সা খরচ করতে হবে। বিশ্বব্যাংক বলেছে সরকারি খাতে রক্তপাত হচ্ছে। সেজন্য আদমজীকে বিরাষ্ট্রীয়করণ করা হয়েছে।

ফিরোজ আশরাফ : আপনার এ সেবা ও পয়সার সূত্র ধরে আমি আরেকটু এগোই। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে আমরা জানি অনেক টাকা খরচ করতে হয়। কিন্তু তারপরও অভিযোগ উঠেছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার গুণগত মান নিয়ে। এটা আপনি কীভাবে দেখবেন? আপনাদের কাছে এ ধরনের কোনো অভিযোগ এসেছে কি-না?

www.pathagar.com

ড. আসাদুজ্জামান : হ্যাঁ, এ ধরনের অভিযোগ আমাদের কাছেও এসেছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান সন্তোষজনক নয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মানের দিকে না ছুটে অর্থের দিকে ছুটছে। আমাদের কানে এ-রকম কথাও এসেছে কলেজ থেকে তারা বিবিএ স্টুডেন্ট ভাগিয়ে নিয়ে যায়। তারা যে ধরনের রেজাল্ট চায় বিশ্ববিদ্যালয় তা দিতে প্রতিশ্রুত থাকে। আমি এমনও শুনেছি টাকা দিলে একদিন ক্লাস না করেও একজন ছাত্র সার্টিফিকেট পেতে পারে। এইচএসসি পাশ করার আগেও নাকি ইদানীং কোন কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ভর্তি করে নিচ্ছে। এটা মোটেই কোনো শুভ লক্ষণ নয়। এসব উদ্দেশ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেয়া হয়নি। মঞ্জুরি কমিশনের কাছে তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ গরিব ও মেধাবী ছাত্রকে বিনামূল্যে পড়াবে। বাস্তবে কি তা তারা করছে? দু-একটা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বেশিরভাগই করছে না। মঞ্জুরি কমিশনকে দেয়া শর্তও তারা ঠিকমতো পালন করছে না।

হু.ক. ঢালী : যে যে শর্ত দেওয়া হয়েছে, সেগুলো কি কি?

ড. আসাদুজ্জামান : শর্ত হচ্ছে তাদের ব্যাংক এ্যাকাউন্টে ৫ কোটি টাকা ফিক্সড ডিপজিট থাকতে হবে। সেটা তারা রাখে না। রাখলেও নানা কায়দা করে উঠিয়ে নেয়। পাঁচ বছরের মধ্যে নিজস্ব জায়গায় নিজস্ব ক্যামপাসে স্থানান্তরিত হওয়ার কথা, তা হচ্ছে না।

ফিরোজ আশরাফ : এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কি ভূমিকা নিচ্ছে?

ড. আসাদুজ্জামান : এ ব্যাপারে বিশ্ববিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কিছু ভূমিকা নিয়েছে। আমরা আরো ক্লোজলি মনিটর করার ব্যবস্থা নিয়েছি। মঞ্জুরি কমিশন তাদের শর্ত মেনে চলতে বাধ্য করার ব্যবস্থা নিয়েছে। আমরা এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ, পঠনপাঠন, সিলেবাস, ভৌত-অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা, লাইব্রেরি ফ্যাসিলিটিজ বাড়ানো ইত্যাদি ব্যাপারে আরো ক্লোজলি মনিটর করছি। সরকারও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম সম্বন্ধে খুব আগ্রহী এবং সচেতন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতির পর্যালোচনা ও মূল্যায়নপূর্বক বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সেগুলোর সমাধানকল্পে সুপারিশ প্রদানে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করেছেন।

ফিরোজ আশরাফ : এ কমিটিতে কারা কারা আছেন?

ড. আসাদুজ্জামান : এ কমিটির সভাপতি করা হয়েছে আমাকে। সদস্য হিসেবে আছেন বিচারপতি আব্দুর রউফ, নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. এ হাফিজ জি.এ ছিদ্দিকী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব জনাব মোঃ এরশাদুল হক, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য প্রফেসর কে এম মহসিন, আইনজীবী ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা

www.pathagar.com

বিভাগের অধ্যাপক ড. ওয়াকিল আহমেদ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য প্রফেসর আমিনুল ইসলাম ও যায় যায় দিন সম্পাদক শফিক রেহমান। এ কমিটি আগামী তিন মাসের মধ্যে সুপারিশ প্রদান করবে।

ফিরোজ আশরাফ : আমরা জেনেছি যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে যুক্ত। এতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন উঠবে বলে আপনার মনে হয় কি?

ড. আসাদুজ্জামান : আমরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্কুলার জারি করেছি। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত থাকলে ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনুমতি নিতে হবে এবং তা মঞ্জুরি কমিশনকে জানাতে হবে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুলসংখ্যক শিক্ষক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন।

হু.ক. ঢালী : এটা কেন করছেন বলে আপনার মনে হয়?

ড. আসাদুজ্জামান : এটা করছেন কারণ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বেতন স্কেল অনেক বেশি। বাড়তি অর্থ উপার্জনই মূল কারণ।

ফিরোজ আশরাফ : এতে কি স্যার আপনার মনে হয় না শিক্ষকদের এ জাতীয় প্রবণতার ফলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মান কমে আসতে পারে?

ড. আসাদুজ্জামান : অবশ্যই মনে হয়। আর সে কারণেই আমরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছি।

হু.ক. ঢালী : আমরা শুনেছি সরকার দুই মাসের জন্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল নিয়োগ বন্ধ রেখেছে। কেন?

ড. আসাদুজ্জামান : আমরা আগেই বলেছি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম বিরাজ করছে। এগুলো নিরসনে বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে এবং নিয়োগের ব্যাপারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের জন্য এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্য এ পদক্ষেপ নিয়েছে।

ফিরোজ আশরাফ : আপনার মতে এ পদক্ষেপ কতটা যুক্তিযুক্ত?

ড. আসাদুজ্জামান : আমরা ইতোপূর্বে ১ জুনের পরে মাস্টার রোলে নিয়োগ বন্ধ রাখার জন্য বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগে অনিয়ম, অব্যবস্থা এবং অস্বচ্ছতা দূর করার ব্যাপারে সরকার সচেষ্ট। কাজেই সরকারের পদক্ষেপ যুক্তিযুক্ত।

হু.ক. ঢালী : ১৯৭৩ সালের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অর্ডিন্যান্স পরিবর্তনের কথা শোনা যাচ্ছে। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

ড. আসাদুজ্জামান : সমাজ পরিবর্তিত হচ্ছে। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা

www.pathagar.com

পরিবর্তিত হচ্ছে। তৎকালীন অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের অনুকূলে ১৯৭৩ সালের অর্ডিন্যান্স হয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের Academic Freedom অর্জন করা। তদুপরি Management of University Affairs নিশ্চিত করা। কিন্তু আজ আমরা দেখতে পাই ৭৩-এর অর্ডিন্যান্স যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রেই অপব্যবহার হচ্ছে। বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং বিশ্বায়নের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদেরকে চলতে হবে। কাজেই অব্যবস্থার খাতগুলো চিহ্নিত করে তা দূরীভূত করে এগিয়ে চলাটাই এখন সময়ের দাবি। সে প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন ও শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়ন অপরিহার্য। ১৯৭৩ সালের অর্ডিন্যান্স কিছু বিষয় পরিবর্তনের দাবি রাখে। এ বিষয়ে দেশের বুদ্ধিজীবী, সিভিল সোসাইটি এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক সমিতির সাথে আলোচনা করে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হবে।

ফিরোজ আশরাফ : বর্তমান শিক্ষার যে ধারা আমাদের দেশে প্রচলিত হয়ে উঠেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, আমাদের দেশে সার্টিফিকেটধারীর সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়ছে না। এটা আপনি কীভাবে দেখেন?

ড. আসাদুজ্জামান : এটা তো এখন খুবই সত্য কথা। দেশে ডিগ্রিধারীর সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু শিক্ষা বাড়ছে না। এজন্য অভিভাবক, শিক্ষক, ছাত্র, রাজনীতিক সবাই দায়ি। সবার কাছে আমার অনুরোধ আপনারা যা কিছুই করুন না কেন, শিক্ষাকে ব্যাহত করে কিছু করবেন না। শিক্ষাকে রাজনীতির বাইরে রাখতে হবে।

হু.ক. ঢালী : আপনি কি মনে করেন আমাদের বর্তমান শিক্ষাক্ষেত্রে অব্যবস্থার জন্য খানিকটা শিক্ষকরাও দায়ি?

ড. আসাদুজ্জামান : অবশ্যই মনে করি। আজকে শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরতার জন্য শিক্ষকরাই বেশি দায়ি। কারণ, অভিযোগ আছে তারা যথাসময়ে ক্লাস নেয় না, কোচিং নিয়ে ব্যস্ত থাকে, কেউ-কেউ নোট-গাইড লেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকে, সময়মতো পরীক্ষার খাতা দেখে না। শিক্ষকরা নিজেরা টেক্সট বই পড়ে না। নোটসর্বস্ব বিদ্যা বিতরণ করে। গবেষণার কাজ করে না। নতুনত্বের সন্ধান করে না। ছাত্রছাত্রীদেরকে আন্দোলিত (Motivate) করে না। এটা করা উচিৎ। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ভালো থাকা অপরিহার্য। বর্তমানে তা নেই। ছাত্রছাত্রীদেরকে লেখাপড়ায় আকৃষ্ট করার সেই প্রণোদনা নেই। শিক্ষকদের একটা পজিটিভ কমিটমেন্ট থাকতে হবে। সুশিক্ষা বিস্তারের অঙ্গীকার থাকতে হবে। আজ আমাদের প্রয়োজন আলোকিত মানুষ, অগ্রসর মানুষ, প্রয়োজন সুশিক্ষিত সুনাগরিক। এ লক্ষ্য অর্জনে সুশিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

ফিরোজ আশরাফ : শিক্ষাক্ষেত্রে সামাজিক ঋণদান প্রথা চালুর ব্যাপারে কি

www.pathagar.com

আমরা ভাবতে পারি না?

ড. আসাদুজ্জামান : আমি তো মনে করি এটা এখন ভাবার সময় এসেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এ বছর ৯৪ কোটি টাকা বাজেট। এক বাবার দুই ছেলে। এক ছেলে পড়ে নর্থ সাউথে, আরেক ছেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। নর্থ সাউথে যে পড়ে তার পেছনে টিউশন ফি বাবদ বাবার ব্যয় মাসে দশ হাজার টাকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পড়ে তার পেছনে টিউশন ফি বাবদ ব্যয় মাসে দশ টাকা। বাকি টাকা কোত্থেকে আসে? এটা দেয় সরকার। এটা ছাত্রকে ভাবতে হবে। মনে রাখতে হবে। অবশ্য এখন যে সিস্টেম চালু আছে তাতে এই ভাবনাটা ছাত্রের মাথায় আসার ব্যবস্থা নেই। এই ব্যবস্থাটা পালটাতে হবে। ছাত্রকে মনে করিয়ে দিতে হবে যে তোমার দেশের সরকার তোমার পড়াশোনার জন্য লক্ষ্য লক্ষ টাকা ভর্তুকি দিচ্ছে। এ টাকা দেশের সাধারণ মানুষের টাকা। তাদের সম্পর্কে তোমার কিছু কর্তব্য আছে। তোমার বাবা যেমন তোমার পেছনে টাকা খরচ করে তোমাকে লেখাপড়া শেখায় এবং বিনিময়ে তোমার কাছ থেকে আশা করে, তেমনি তারাও তোমার কাছে কিছু আশা করে।

হু.ক. ঢালী : আমি বলতে চাচ্ছিলাম শিক্ষকদের এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জবাবদিহিতা কীভাবে আনা যায়?

ড. আসাদুজ্জামান : আমি একটা ঘটনার কথা বলি। আমি তখন আমেরিকায়। আমার রুমে এক নাইজেরিয়ান শিক্ষক বসতেন। একদিন দেখি তিনি মন খারাপ করে ঘরে বসে আছেন। আমি বললাম, কি ব্যাপার তোমার মন খারাপ কেন? নাইজেরিয়ান বললেন, আমি খুব হতাশ বোধ করছি। আমি বললাম, কেন? জবাবে নাইজেরিয়ান বললেন, আমার এক ছাত্র এসে আমাকে বলল আমার ক্লাস করে তার কোনো লাভ হয়নি। সে আমার ক্লাসে কিছুই শিখতে পারেনি। বলেই নাইজেরিয়ান শিক্ষক দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। আমি সে শিক্ষককে সান্ত্বনা দিলাম এই বলে যে, এতে তোমার হতাশ হয়ে পড়ার কিছু নেই। শিক্ষাটা 'গিভ অ্যান্ড টেক' এর ব্যাপার। এমনও হতে পারে তুমি দিয়েছো ঠিকই কিন্তু সে নিতে পারেনি। যাহোক, ঘটনাটা এ কারণে বললাম যে ওসব দেশে ছাত্ররা কত সচেতন! তারা শিক্ষককে দোষারোপ করে বসে। আমাদের দেশে এটা ভাবা যায় না। আমি নাইজেরিয়ানকে বললাম, আমার দেশে তো শিক্ষক ক্লাস না নিলে ছাত্ররা খুশি হয়। নাইজেরিয়ান বললেন, তোমার দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রের বেতন কত?

আমি হিসেব করে বললাম, ২৫ সেন্ট। নাইজেরিয়ান হেসে বললেন, সেই জন্যেই খুশি হয়। এখানে মাসে বেতন দুই হাজার ডলার।

যাহোক, যে প্রসঙ্গে আমি এটা বলতে চাচ্ছি তা হলো আমাদের দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা বিনামূল্যে পড়াশোনা করে। বিনামূল্যে পড়াশোনা করে বলেই তারা এর মর্ম বুঝতে পারে না। আমার মনে হয় মাসে দশ হাজার

www.pathagar.com

টাকা বেতন দিয়ে পড়তে হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো সন্ত্রাসীর অস্তিত্ব থাকতো না! শিক্ষক ক্লাস না নিলে ছাত্ররা খুশি হতো না!

ফিরোজ আশরাফ : আমাদের দেশের পরীক্ষা পদ্ধতি, মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? কিছুদিন পরপর দেখা যায় নতুন নতুন মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়?

ড. আসাদুজ্জামান : আমাদের মূল্যায়ন পদ্ধতি ত্রুটিযুক্ত। শিক্ষার্থীর প্রকৃত যোগ্যতা এতে বেরিয়ে আসে না। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এখন চলছে ফটোস্ট্যাট সংস্কৃতির যুগ। ছাত্রছাত্রীরা টেক্সট বুক পড়ে না। ফটোস্ট্যাট কপি পড়ে। পৃথিবী এখন অনেক এগিয়ে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিত্যনতুন শাখা বেরিয়ে আসছে। আর আমাদের দেশে চলছে ফটোস্ট্যাট সংস্কৃতি। এ কারণেই সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরি হচ্ছে না। সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটছে না। আমাদের দেশে মূল্যায়ন পদ্ধতি ত্রুটিযুক্ত বলেই ছাত্রছাত্রীরা এ সুযোগ পাচ্ছে। পরীক্ষা পদ্ধতি আরো সায়েন্টিফিক করা উচিৎ। Text Book পড়ার সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে হবে।

ফিরোজ আশরাফ : এসএসসি লেভেল পর্যন্ত পাবলিক পরীক্ষা সিস্টেম তুলে দিলে কেমন হয়? কলেজে ভর্তির জন্য যদি ভর্তি পরীক্ষা দিতে হয় তাহলে এসএসসিতে পাবলিক পরীক্ষার প্রয়োজন কেন?

ড. আসাদুজ্জামান : সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো যদি বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পারতো তাহলে সেটা করা যেত। কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্নীতিগ্রস্থ। টাকা খেয়ে প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানগুলো তখন সার্টিফিকেট দেবে। এসএসসি শিক্ষা পদ্ধতির একটি ধাপ। এ ধাপে একটা পরীক্ষা থাকা বাঞ্ছনীয়।

হু.ক. ঢালী : আমাদের দেশে বর্তমানে তিন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে। বাংলা মিডিয়াম শিক্ষা, ইংলিশ মিডিয়াম শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষা। মাদ্রাসা শিক্ষায়ও আবার ভাগ আছে। এই যে একটা এলোমেলো অবস্থা—এ থেকে কি উত্তরণের পথ নেই? আমরা কি একটি সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থার কথা ভাবতে পারি না?

ড. আসাদুজ্জামান : আসলে শিক্ষার মাধ্যম যাই হোক, তা যেন আধুনিক হয়। ছাত্রকে আপটুডেট হতে হবে। চলমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে তাকে এগিয়ে যেতে হবে। মাধ্যমটা এখানে বড় ফ্যাক্টর নয়। একজন জাপানি ছাত্রকে পিএইচডি পর্যন্ত ডিগ্রি নিতে একটা অক্ষর ইংরেজি না পড়লেও চলে। তারা কি তাদের নিজেদের ভাষায় পড়ছে না? তারা কি পিছিয়ে আছে?

হু.ক. ঢালী : কিন্তু একটা ব্যবধান তৈরি হয়ে যাচ্ছে না?

ড. আসাদুজ্জামান : এটা মানসিকতা পরিবর্তনের কারণে হচ্ছে। তবে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে আমাদের ছেলেমেয়েরা আমাদের সমাজব্যবস্থা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আমাদের শিশুদেরকে বাংলাদেশের স্টাডিজ, কালচার, রিলিজিয়ন, ন্যাশনাল হিরো ইত্যাদি থেকে দূরে রাখা ঠিক না। এতে এদের মধ্যে দেশপ্রেম,

www.pathagar.com

দেশাত্ববোধ তৈরি হবে না। সে ভুলে যাবে যে সে বাংলাদেশী, তার একটি ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি আছে। এ ব্যাপারগুলো লক্ষ রাখা দরকার। সত্যি বলতে আমরা তো এখনও ভালো বাংলাই জানি না। আগে নিজের ভাষাটা জানা দরকার। তা না হলে আমরা কোন বিদেশী ভাষাই ভালো করে শিখতে পারব না।

ফিরোজ আশরাফ : যেভাবে দেশে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের সংখ্যা বাড়ছে তাতে মনে হয় একসময় বাংলা কেউ পড়বে না। আপনি বাংলাভাষার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত কি-না।

ড. আসাদুজ্জামান : না আমি মোটেই চিন্তিত নই। ইংরেজি ভাষার প্রতি দুর্বলতা একটা প্রবণতা ছাড়া আর কিছু নয়। তবে বাংলার ওপর আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। নিজেদের ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের জন্য আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি না। অথচ বাংলা কী সমৃদ্ধ ভাষা! নিজেদের ভাষায় কথা বলতে আমরা গরীবি লক্ষণ মনে করি। আমাদের এ হীনমন্যতা ত্যাগ করতে হবে। ইংরেজি ভালো জানতে হলে আগে বাংলাটাকে ভালো করে জানতে হবে। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে এ প্লাস পাওয়া মানেই ভালো ইংরেজি জানা নয়। ইংরেজি আন্তর্জাতিক ভাষা। কাজেই ইংরেজি ভাষাও ভালো করে জানতে হবে।

হু.ক. ঢালী : আমাদের স্কুলগুলোতে ভাষা শিক্ষার ওপর কম গুরুত্ব দেয়া হয়। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

ড. আসাদুজ্জামান : ভাষার গুণগত ব্যবহারের জন্য আমরা কিছুই করি না। আমরা মায়ের মুখে বাংলা শিখেই মনে করি বাংলা শিখে গিয়েছি। আসলে তা নয়। ভাষার শিকড় অনেক গভীরে। সে শিকড় অনুসন্ধান করার মানসিকতা আমাদের থাকতে হবে। স্কুলগুলোতে ল্যাংগুয়েজ ডেভেলপমেন্ট প্রোপারলি না হলে সে ছাত্র কিছুই শিখতে পারবে না।

ফিরোজ আশরাফ : প্রত্যেকটা দেশেরই মনে হয় নিজস্ব কিছু পরিকল্পনা থাকা উচিৎ। যেমন তার দেশের জন্য কতজন ডাক্তার প্রয়োজন, কতজন ইঞ্জিনিয়ার প্রয়োজন, কতজন উকিল প্রয়োজন, কতজন ম্যাজিস্ট্রেট প্রয়োজন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সে হিসেব করেই ছাত্রছাত্রী ভর্তি করবে। কিন্তু এটা কি আমাদের দেশে আছে?

ড. আসাদুজ্জামান : নেই। এটা ম্যান পাওয়ার প্ল্যানিং। আমাদের দেশে কোনো ম্যান পাওয়ার প্ল্যানিং নেই। থাকা উচিৎ।

হু.ক. ঢালী : শিক্ষাক্ষেত্রে বরাদ্দ সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি? দেখা যাচ্ছে গত বাজেটের তুলনায় এবার টাকার পরিমাণ কম।

ড. আসাদুজ্জামান : যেটা আছে সেটার যথার্থ ব্যবহার হচ্ছে কি? সমন্বয় এবং পরিকল্পনা না থাকলে শিক্ষা বাজেট বাড়ালেও লাভ হবে না। একজন ভালো শিক্ষক গ্রামে যেতে চায় না। শহরে থাকতে চায়। ফলে মেধাহীন শিক্ষক গ্রামে

www.pathagar.com

পড়ে থাকে। তবে ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। যাহোক, এই যে সমন্বয়হীনতা এটা দূর করতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে বরাদ্দ যাই হোক সেটার পরিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

ফিরোজ আশরাফ : বর্তমান প্রেক্ষাপটে ছাত্রশিক্ষক সম্পর্ক সম্পর্কে কিছু বলুন। দেখা যাচ্ছে আগের দিনের সেই মধুর ছাত্রশিক্ষক সম্পর্ক আজ আর নেই। এখন শিক্ষক পরীক্ষার হলে নকল ধরলে ছাত্র সেই শিক্ষককে গুলি করে।

ড. আসাদুজ্জামান : শিক্ষক হচ্ছে মডেল। শিক্ষকের অসঙ্গতি দেখে ছাত্ররা শিক্ষকের সাথে অসংগত আচরণ করা শেখে। একজন শিক্ষককে সম্মান আদায় করতে হবে। নয়তো নকল ধরলে গুলি খাওয়ার ঘটনা ঘটতেই পারে। এজন্য আমি মনে করি শিক্ষককেই মূল্যবোধ ধরে রাখতে হবে এবং তা তার ছাত্রের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে।

হু.ক. ঢালী : এবার পিএসসির বিসিএস সংক্রান্ত একটা প্রসঙ্গে আলোচনা করি। সম্প্রতি পিএসসি ঘোষণা দিয়েছে বিসিএস পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হলে একজন ছাত্রকে বাংলা-ইংরেজি উভয় ভাষায় এসএসসি এইচএসসি উভয় পর্যায়ে ৪৫ ভাগ নম্বর থাকতে হবে। এ সম্পর্কে আপনার প্রতিক্রিয়া কি?

ড. আসাদুজ্জামান : নম্বর পাওয়া না পাওয়ার সাথে মেধার খুব বেশি সম্পর্ক নেই। আগের নম্বরটা থাকলে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত থাকবে। ভাষাজ্ঞান যাচাই ও বৃদ্ধির জন্য বিকল্প ব্যবস্থাও গ্রহণ করা সম্ভব।

ফিরোজ আশরাফ : আমাদেরকে আপনার মূল্যবান সময় দেবার জন্যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

ড. আসাদুজ্জামান : তোমাদেরকেও ধন্যবাদ। এগিয়ে যাও।

www.pathagar.com

জাতীয় শিক্ষা কমিশন ২০০৩ এর আলোকে প্রফেসর মোঃ মনিরুজ্জামান মিঞা-র মুখোমুখি

প্রশ্ন : প্রত্যেকে চায় নিজস্ব চিন্তাধারা নিজস্ব কাঠামোর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হোক। সর্বশেষ শিক্ষা কমিশনে আপনারা নতুন কিছু সুপারিশ করেছেন; অথচ তা বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষা কাঠামো পরিবর্তনের কথা কিছু না বলে বরং অপরিবর্তিত রাখার কথা বলেছেন। কিন্তু কেন? এটা কি শুধু বিতর্ক এড়ানোর জন্য না অন্য কিছু?

অধ্যাপক মনিরুজ্জামান : শিক্ষা কাঠামোর আমূল পরিবর্তন একদিনে সম্ভব নয়। আর আমাদের মতো দরিদ্র দেশের পক্ষে তা আরো কঠিন। কারণ, এর সাথে অবকাঠামোগত এবং প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষক নিয়োগ, প্রশিক্ষণসহ নানারকম ব্যয়ের প্রশ্ন জড়িত। তাই শিক্ষা কাঠামো অপরিবর্তিত রেখেই আমরা আমাদের সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের কথা বলেছি। শিক্ষা কাঠামো অপরিবর্তিত রাখার পেছনে তাই রাজনৈতিক বা অন্যকোনো বিতর্ক এড়ানোর কারণ নাই।

প্রশ্ন: সর্বশেষ রিপোর্টে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইংরেজি ও ধর্মের জন্য কোনো লিখিত বই বা লিখিত পরীক্ষা না রাখার কথা বলা হয়েছে। অনেকের মতে শহরাঞ্চলে এই ধারণা বাস্তবায়ন সম্ভব হলেও গ্রামাঞ্চলে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়—এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি?

অধ্যাপক মনিরুজ্জামান : শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে এই সুপারিশটা করা হয়েছে, কারণ আমরা চাই না অল্পবয়সী কোমলমতি যেসব শিশু শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আসছে, শুরুতেই তাদের মাথায় বইপুস্তকের বোঝা চাপিয়ে দিতে। বরং খেলাধুলা, হাসি, আনন্দ, বিনোদনের মাধ্যমে শিক্ষার মূল বিষয়টা তাদের মাথায় ঢুকিয়ে দিতে চাই। এজন্য প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইংরেজি বা ধর্মের মতো অপরিচিত বিষয়ের কোনো বই বা লিখিত পরীক্ষা রাখার ব্যবস্থা করা হয়নি। তবে এ ব্যাপারে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তারা গ্রামাঞ্চলেও প্রস্তুতি সুপারিশ বাস্তবায়ন করবেন। আবার সমগ্র বিষয়টা পর্যবেক্ষণ করার জন্য একটা মনিটরিং কমিটি থাকবে। গ্রামাঞ্চলে যাতে এটা বাস্তবায়ন করা যায় সে বিষয়ে তারা উদ্যোগ নেবেন।

প্রশ্ন: আপনারা সর্বশেষ রিপোর্টে ২৫ ভাগ নম্বর স্কুলভিত্তিক মূল্যায়নের কথা বলেছেন। এটা কি শিক্ষকদের দুর্নীতির সুযোগ বাড়াবে না, কিংবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্ষমতাবানদের প্রভাব পরিলক্ষিত হবে না?

অধ্যাপক মনিরুজ্জামান : বিষয়টা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে একজন শিক্ষক ও তার প্রতিষ্ঠানের উপর। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই পদ্ধতি প্রচলিত আছে। এর ফলে

www.pathagar.com

একজন ছাত্রকে তার শিক্ষাটাকে পরিপূর্ণভাবেই শিখে পরবর্তী ক্লাসে উত্তীর্ণ হতে হবে। কারণ, একজন ছাত্র যদি ক্লাসে ভালো পড়াশোনা না করে তবে তার ফল ভালো হবে না। আর শিক্ষকরাও শেখানোর জন্য দায়বদ্ধ থাকবে। শিক্ষককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে ক্লাসে ছাত্রদের তাই শেখাতে হবে। প্রথমদিকে কোথাও কোথাও হয়তো এর অপব্যবহার হতে পারে। তবে আস্তে-আস্তে অবস্থার পরিবর্তন হবে। শিক্ষক সৎ হলে ক্ষমতাবানদের প্রভাব মোকাবিলা করা সম্ভব, তখন দুর্নীতিও তেমন হবে না। আর বিষয়টাকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দেওয়াও হবে না। বোর্ড গৃহীত পরীক্ষার সাথে শিক্ষকদের দেওয়া নম্বরের তুলনা করা হবে। স্কুলের শিক্ষকদের প্রদত্ত নম্বর কতটা যথার্থ তা গাণিতিক পদ্ধতিতে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা হবে বিষয়টা ঠিক আছে কি না। সম্পূর্ণ বিষয়টা বোর্ডই নিজস্ব ব্যবস্থায় পর্যবেক্ষণ করবে।

প্রশ্ন: আপনারা সর্বশেষ রিপোর্টে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে (নবম শ্রেণী পর্যন্ত) কোনো শিক্ষার্থীকে অকৃতকার্য না করার সুপারিশ করেছেন। এতে করে কি শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে না?

অধ্যাপক মনিরুজ্জামান : পরীক্ষা গ্রহণ মূল্যায়নের জন্য, পাশ বা ফেল মূল্যায়নের জন্য নয়। পরীক্ষার মাধ্যমে বিচার করা হবে একজন শিক্ষার্থী শ্রেণীতে কতটা শিখল। যদি তার শিক্ষাটা যথোপযুক্ত না হয় তবে স্কুলের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকদের অধীনে তাকে পুনরায় পাঠদান করে তার অর্জনের পরিধিটা বাড়াতে হবে। এই পদ্ধতি স্কুল পর্যায়ে চালু করার মূল উদ্দেশ্য হলো সর্বত্র শিক্ষার প্রসার ঘটানো। ফলাফল মূল্যায়নে যদি পাশ-ফেলের বিষয়টা থাকে তাহলে পরীক্ষা ও লেখাপড়া সম্পর্কে অনেকে সমস্যা মনে করে দূরে সরে যেতে পারে। এমনকি গ্রামাঞ্চলের অনেক অভিভাবকও বিরক্ত হয়ে সন্তানকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিতে পারেন। পরীক্ষায় অকৃতকার্য না করার মাধ্যমে এটা রোধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এতে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে না। কারণ, যারা ভালো তারা এমনিতেই পরীক্ষায় ভালো করবে কিন্তু যারা খারাপ তারা কোন পর্যায়ে আছে তা জানা যাবে এবং বাড়তি শিক্ষা দিয়ে এর মাধ্যমে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সাহায্যে তা পূরণ করা যাবে।

প্রশ্ন: পূর্বে আমাদের দেশে এসএসসি পর্যন্ত একমুখী শিক্ষা ছিল। আপনাদের সর্বশেষ রিপোর্টে আপনারা নতুন কোনো ধ্যানধারণায় না গিয়ে পুরনো পদ্ধতিতে ফিরে আসার সুপারিশ করেছেন, কেন?

অধ্যাপক মনিরুজ্জামান : বর্তমান সময়টা স্পেশালাইজেশনের যুগ। সবকিছুতে চাই স্পেশালিটি। কিন্তু মূলভিত্তি যদি সঠিকভাবে গড়ে না উঠে তাহলে তা অর্জন করা সম্ভব হবে না। অংক, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল এগুলো হলো একজন ছাত্রের মূলভিত্তি। স্পেশালিস্টের কথা বলে যদি নবম শ্রেণীতে বিভাজন

www.pathagar.com

টানা হয় তবে বিজ্ঞান, মানবিক, বাণিজ্য কারোই শিক্ষাটা সঠিকভাবে সম্পূর্ণ হয় না। এজন্য আমরা মূলভিত্তিটাকে ঠিক রাখার জন্য ন্যূনতম এসএসসি পর্যন্ত সকলের জন্য ভাষা, অংক, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল পড়ার অর্থাৎ, একমুখী শিক্ষার কথা বলেছি। বিশেষজ্ঞের জন্য কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় রয়েছে যেখানে গিয়ে নিতে পারবে।

প্রশ্ন: অনেকের মতে একমুখী শিক্ষা বলতে তিনটি বিভাগ এক করার কথা বলা হলেও কার্যত করা হয়েছে দুটি; আর যেসব বিষয় পড়ানোর জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে তা যথার্থ হয়নি—এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি?

অধ্যাপক মনিরুজ্জামান : নবম-দশম শ্রেণীতে তিনটি বিভাগ তুলে দিয়ে আমরা সবার জন্য একই শিক্ষার কথা বলেছি। এখানে এখন বিজ্ঞান, বাণিজ্য, মানবিক আলাদা নেই। একজনের পক্ষে বেশি বিষয় তো পড়া সম্ভব নয়। তাই সময় বিবেচনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যেসব বিষয় ও মূলভিত্তিমূলক যেসব বিষয় তা পড়ার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। মূলভিত্তি হিসাবে বাংলা, ইংরেজি, গণিত, ধর্মের স্থান অপরিবর্তনীয়। বাকি বিষয় হিসাবে বিজ্ঞানের জ্ঞানের জন্য আমরা জড় ও জীববিজ্ঞান এনেছি। নিজের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও দেশ সম্পর্কে জানার জন্য ইতিহাস ও ভূগোল এনেছি। আর বর্তমান সময় হিসাবে কম্পিউটার বিজ্ঞানকে এনেছি। কারণ, কম্পিউটারের জ্ঞান ছাড়া বর্তমানে চলা অসম্ভব। এখানে শুধু বাণিজ্য বিভাগের কোনো বিষয় রাখা হয়নি। কারণ, ১০০০ নম্বরের যে সীমাবদ্ধতা তা উল্লিখিত নয়টি বিষয়ে বণ্টন করা হয়েছে। তবে ধর্মকে ১০০ নম্বর না করে ৫০ নম্বর করলে হয়তো বাণিজ্য বা অন্য কোনো নামে ৫০ নম্বরের একটা বিষয় আনা যেত কিন্তু ধর্মের নম্বর কমিয়ে নতুন বিতর্ককে এড়ানোর জন্য আমরা এটা করিনি।

প্রশ্ন: সাধারণ শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা ও ইংরেজি শিক্ষার সমন্বয় সাধনে আপনারা যে সুপারিশ করেছেন তা কতটা যুক্তিসংগত ও বাস্তবায়নযোগ্য বলে মনে করেন?

অধ্যাপক মনিরুজ্জামান : একটি দেশে শিক্ষা পদ্ধতি বিভিন্নরকম না হয়ে একটিই হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের সামাজিক অবস্থান বিবেচনায় শিক্ষাক্ষেত্রে আজ তিনটি পদ্ধতি প্রচলিত। এই অবস্থায় কোনো মাধ্যমকে পুরোপুরি তুলে দেওয়া সম্ভব নয়। বড়জোর সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এজন্য আমরা কিছু মৌলিক বিষয় তিন মাধ্যমের জন্য প্রচলন করার সুপারিশ করেছি। ইংরেজি মাধ্যমে অনেক মৌলিক বিষয় পড়ানো হয়। পাশাপাশি বাংলা ও বাংলাদেশ পরিচিতি বিষয়টা পড়ানোর কথা বলেছি। আর মাদ্রাসায় বাংলা, ইংরেজি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, পরিবেশ বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় পড়ানোর কথা বলেছি। এটা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা হলে তিনটি মাধ্যমকে এক না করেও একই ধরনের শিক্ষা নিজস্ব মাধ্যমে দেওয়া সম্ভব হবে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন: বিসিএস-এ সাধারণ শিক্ষা নামে একটা ক্যাডার থাকার পরও মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য আলাদা একটা ক্যাডার সৃষ্টির প্রয়োজন কি?

অধ্যাপক মনিরুজ্জামান : বিসিএস-এর শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়টা দেখা হয় শিক্ষা ক্যাডারের মাধ্যমে। মাদ্রাসা শিক্ষা বর্তমানে একটা প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাব্যবস্থা আর সাধারণ শিক্ষা থেকে তার রয়েছে নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য ও ভিন্নতা। যা সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের মাধ্যমে পূরণ সম্ভব হচ্ছিল না বলে মনে করেন আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষা বিষয়ক কমিটি। এজন্য শিক্ষা ক্যাডার সার্ভিসে মাদ্রাসার জন্য আলাদা একটা ক্যাডার সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। বিষয়টা এখনও সুপারিশ পর্যায়ে আছে, প্রয়োজন না থাকলে বাদ দেওয়া হবে; কিংবা বাস্তবায়ন করতে হলে বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে পরবর্তীতে কিছু পরিবর্তন করে নতুনভাবে বাস্তবায়ন করা যাবে।

প্রশ্ন: অভিযোগ উঠেছে যে উপাচার্য নিয়োগ করার জন্য আপনারা যে সুপারিশ করেছেন তা সুষ্ঠু উপাচার্য নির্বাচন পরিপন্থী। এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি?

অধ্যাপক মনিরুজ্জামান : সমাজ পরিবর্তনের জন্য যখন নতুন কোনো ধারণার কথা বলা হয়, তখন নানা দিক থেকে তার দুর্বলতা খুঁজে বের করা হয়। এতে একটা লাভ হয় দুর্বলতাগুলো দূর হয়ে ভালো দিকটা প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পর উপাচার্য নিয়োগ করার জন্য যে নিয়ম-নীতির কথা বলা হয়েছিল তা মন্দ ছিল না। কিন্তু তারপরও আইনের ফাঁক গলে নিয়মবহির্ভূতভাবে উপাচার্য নিয়োগ হতে দেখা গেছে। আমরা চাই এটা বন্ধ করতে। সিনেট সদস্যরা উপাচার্য নির্বাচনের জন্য তিনজনের প্যানেল নির্বাচন করছেন কিন্তু এই নির্বাচন যাতে সর্বাঙ্গীন সুন্দর হয় তার জন্য আমরা একটা সার্চ কমিটি গঠন করার কথা বলেছি। উপাচার্য নিয়োগের জন্য এই কমিটি চ্যান্সেলরের কাছে উপাচার্য নির্বাচন করার সুপারিশ করবে। এতে উপাচার্য পদটি নিরপেক্ষ ও সর্বজন গ্রহণযোগ্য হিসাবে বিবেচিত হবে।

প্রশ্ন: কমিশনের এই রিপোর্টে আপনারা কৃষি, চিকিৎসা, প্রকৌশলের জন্য এককভিত্তিক নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন না করার কথা বলেছেন। এটা কি স্পেশালিস্টের এই যুগে উলটো পথে চলা হবে না?

অধ্যাপক মনিরুজ্জামান : জ্ঞানের বিস্তৃত রাজ্য নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়। তাই একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে যত বেশি বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান বিজ্ঞান ও বিষয়ের সমাবেশ ঘটানো যাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান তত বৃদ্ধি পাবে। নিত্যনতুন বিষয়ে গবেষণা, আলাপ-আলোচনা, সেমিনার হবে এবং জ্ঞানের শাখা-প্রশাখা সমাজে তত বিস্তার লাভ করবে। উন্নত বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে দেখা যায় একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনে একাধিক অনুষদ খুলে জ্ঞান অর্জন প্রক্রিয়া আরো সহজ করে তোলার চেষ্টা করা হয়। আর একক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ব্যয় বেশি হয় যা

www.pathagar.com

বহু বিষয়ভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কম। তাই জ্ঞান অর্জন প্রক্রিয়াকে বিস্তৃত করা ও তুলনামূলক ব্যয় কমানোর জন্য এককভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন না করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

প্রশ্ন: আপনারা শিক্ষক নিয়োগের জন্য যে সুপারিশ করেছেন তা অনেকটা ধোঁয়াশা পূর্ণ ও রাজনৈতিক মদদপুষ্ট— মন্তব্য করুন।

অধ্যাপক মনিরুজ্জামান : শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য সরকারি কর্মকমিশনের মতো আমরা একটি নিরপেক্ষ কমিশন গঠনের সুপারিশ করেছি। কমিশন বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের নির্বাচন করে তার একটা দীর্ঘ প্যানেল তৈরি করবে। এই নির্বাচিত শিক্ষকদের প্যানেল থেকে জেলা শিক্ষা অফিসার সরকারি স্কুলের জন্য শিক্ষক নিয়োগ দেবেন। তবে যতদিন এই কমিশন গঠিত না হচ্ছে ততদিন তাদের কাজ চালিয়ে নেবার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে একটি কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটি ৮ সদস্য বিশিষ্ট হবে; যারা স্ব-স্ব পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি। সরকারি কমিশন যতটা নিরপেক্ষভাবে তার কাজ করে থাকে আমরা আশা করছি ততটা নিরপেক্ষভাবে শিক্ষক নিয়োগ কমিশনও তাদের দায়িত্ব পালন করবে।

প্রশ্ন : এ পর্যন্ত গঠিত কমিশনে যত সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে তার মাত্র ১৮% পুরোপুরি বাস্তবায়ন ও অর্ধেক সুপারিশ বাস্তবায়ন হয়েছে ৯%। আপনাদের রিপোর্ট প্রদান করতে করতে সরকারের মেয়াদের অর্ধেক শেষ হয়ে গেছে। আপনার কি মনে হয় বাকি সময়ে আপনারা আপনাদের সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করে যেতে পারবেন? নাকি শুধু সুপারিশ প্রদান করার জন্যই সুপারিশ প্রদান করলেন?

অধ্যাপক মনিরুজ্জামান : এই অবস্থা পরিবর্তনের জন্য আমরা স্থায়ী কমিশন গঠন করার কথা বলেছি। এতে কোনো সরকারই কমিশনের কোনো সুপারিশকে বাদ দিতে পারবে না। বরং এক সরকার বাস্তবায়ন না করতে পারলে পরের সরকার তা বাস্তবায়ন করবে। আর আমাদের কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে আমার বক্তব্য হলো— এই সরকারের এখনও অর্ধেক সময় বাকি। তাই ইচ্ছা করলে সরকার অনেক সুপারিশ বাস্তবায়ন করে যেতে পারবে। এজন্য প্রধানমন্ত্রীকে রিপোর্ট প্রদান করার সময় তখনই বাস্তবায়ন করার জন্য তিনি একটা শেল গঠন করার কথা বলেন। আমরা আশা করছি নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর আমাদের সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। তবে দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন সম্ভব না হলে অন্তত কাজ শুরু হবে।

প্রশ্ন : আপনি যে স্থায়ী শিক্ষা কমিশনের কথা বললেন, এর রূপরেখা কেমন হবে এবং এখন যেমন রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কমিশন গঠন হচ্ছে তখন কি রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত করে কমিশন থেকে পছন্দমতো সুপারিশ প্রদান করা

www.pathagar.com

হবে না?

অধ্যাপক মনিরুজ্জামান : স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠনের জন্য আমরা সাধারণ একটা সুপারিশ করেছি। সরকার যদি স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠন করতে চায় তবে প্রয়োজন মতো তার রূপরেখা নির্ধারণ করে নেবে। প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে তা দাঁড় করানো যাবে। তবে শিক্ষা বিষয়ক সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা পাবার জন্য স্থায়ী কমিশন গঠন প্রয়োজন। কারণ প্রায় প্রতি ৭/৮ বছর পরপর শিক্ষার ধ্যান-ধারণা পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তন ব্যাপক বা সূক্ষ্ম উভয়ভাবে হতে পারে। যদি শিক্ষার জন্য স্থায়ী কমিশন থাকে তবে দেশবিদেশের শিক্ষাব্যবস্থার উপর নজর রেখে গবেষণা করে গ্রহণযোগ্য সুপারিশগুলো আমাদের জন্য প্রদান করবেন। আর রাজনৈতিক প্রভাবের যে কথা বললেন তা কিছুটা হলেও ব্যাপক মাত্রায় কি হয়? এ ছাড়া কমিশন কোনো সুপারিশ করলে তা যদি এক সরকার বাস্তবায়ন না করে তো পরের সরকার বাস্তবায়ন করবে। অর্থাৎ, পুরোপুরিভাবে কোনো সুপারিশ বাদ দেওয়ার সুযোগ থাকছে না।

www.pathagar.com

জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষানুযায়ী ও শিক্ষাবিদের সাথে কথা হয়েছে। তার আলোকে— আরো সংলাপ

শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন শুধু ক্ষমতাসীন সরকারের একক দৃষ্টিভঙ্গিতে হওয়া উচিত নয়

অধ্যাপক এ. কে. আজাদ চৌধুরী

প্রশ্ন : সম্প্রতি জাতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে। এর পূর্বে অনেকবার জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল; কিন্তু পূর্বের সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন না করেই আর একটি নতুন রিপোর্ট প্রকাশ করা হলো। এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি?

আজাদ চৌধুরী : জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য শিক্ষা কমিশন গঠন করে প্রত্যেক সরকারই একটি নীতিমালা গ্রহণ করে; কিন্তু পূর্ববর্তী সরকার এ বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করলে তা যাচাই-বাছাই করে দেয়ার প্রয়োজনও মনে করে না। এটা ঠিক নয়। শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন শুধু ক্ষমতাসীন সরকারের একক দৃষ্টিভঙ্গিতে হওয়া উচিত নয়। সবাই মিলে নিরপেক্ষ কমিশনের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে একটি গ্রহণযোগ্য শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা উচিত বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন : কমিশনের রিপোর্টে এসএসসি পর্যায়ে বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগ না রাখার সুপারিশ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আপনি কি মনে করেন?

আ. চৌ.: আমার মনে হয় এটা করা খুব একটা যুক্তিসংগত হবে না। Specialization-টা এসএসসি পর্যায় থেকে না করলে পরবর্তীতে Higher Study করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রচণ্ড চাপের মুখে পড়তে হবে।

প্রশ্ন: সাধারণ শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা ও ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা— এ তিনটির মধ্যে সমন্বয় বিধানে কমিশন সুপারিশ করেছে। আপনার মতে এই তিন মাধ্যম একত্রীকরণে কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে?

আ. চৌ. : বিভিন্ন স্রোতধারার সমন্বয় বিধানের জন্য Curricula update করতে হবে এবং তার সমন্বয় সাধন করা একান্ত প্রয়োজন। সাধারণ শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা ও ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা—এর জন্য General Syllabus থাকতে হবে এবং Common বিষয়গুলো অভিন্ন Syllabus-এ পড়ানো উচিত বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন: এসএসসি পর্যায়ে ২৫ ভাগ নম্বর স্কুলভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য বরাদ্দ থাকবে অর্থাৎ, শতকরা ২৫ ভাগ নম্বর থাকবে নিজ স্কুল শিক্ষকের হাতে। আপনার

www.pathagar.com

মতে এটা কি শিক্ষকদের দুর্নীতির সুযোগ বাড়াবে না?

আ. চৌ. : শিক্ষকদের উপর আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে এবং স্কুলভিত্তিক মেধা মূল্যায়নের জন্য অনেক পয়েন্ট থাকতে হবে যার ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসে উপস্থিতি, সদাচরণ, নিয়মানুবর্তিতা, শ্রেণীকক্ষে পরীক্ষার ফলাফল প্রভৃতি বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করেই স্কুলভিত্তিক ২৫% নম্বর প্রদান করতে হবে। সর্বোপরি এর জন্য কার্যকর Supervision এর ব্যবস্থা থাকতে হবে। তাহলে দুর্নীতি হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে।

প্রশ্ন : সর্বশেষ রিপোর্টে কৃষি, চিকিৎসা, প্রকৌশলির মতো একক বিষয়ভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা না করার জন্য বলা হয়েছে। এ বিষয়ে আপনি কি মনে করেন?

আ. চৌ. : এটা গ্রহণযোগ্য। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিষয়ভিত্তিক আলাদা ফ্যাকাল্টি সৃষ্টি করা যেতে পারে; কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে একক বিষয়ভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না এবং Mono discipline university এর ধ্যান-ধারণার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়।

প্রশ্ন : রিপোর্টে উপাচার্য নিয়োগসহ ১৯৭৩ সালের আইনের বিভিন্ন দিক পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। বর্তমান সময়ে এর কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে কি?

আ. চৌ. : Higher education-কে যত বেশি গণতান্ত্রিক করা যায় ততই ভালো। ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইনে উপাচার্য নিয়োগের যে বিধান রয়েছে তা যথাযথ ও গণতান্ত্রিক। সে অনুযায়ী প্রথমত, সিনেট কর্তৃক উপাচার্য Panel elected হবে তারপর Appointment। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথমে উপাচার্য সরকার/চ্যান্সেলর কর্তৃক নিয়োগ পান, পরে সিনেট ডেকে নির্বাচন করে বৈধতা দেন। এ প্রক্রিয়া ১৯৭৩ সালের স্বায়ত্তশাসনের ধারণার পরিপন্থী। তাই আইনের সংশোধন নয়, আইনের যথাযথ প্রয়োগটাই বর্তমান সময়ের দাবি।

শ্রেণী শিক্ষকের হাতে নম্বর বণ্টনের নীতিমালা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন

প্রফেসর ড. সাইফুল ইসলাম ফারুকী

উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রশ্ন : সম্প্রতি প্রণীত জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে মাধ্যমিক পর্যায়ে (এসএসসি) মানবিক, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগ না রাখার সুপারিশ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি?

সা. ই. : জাতিকে জানার জন্য এবং আরও কিছু সাধারণ বিষয়ে জ্ঞানের জন্য একটা লেবেল পর্যন্ত প্রত্যেকের একই ধরনের শিক্ষা গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে সেটা এসএসসি পর্যন্ত হতে হবে এমনটি বলা যাবে না। বরং অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত এ ধরনের শিক্ষার যে সুযোগ রয়েছে সেটাই যথেষ্ট এবং ভোকেশনাল

www.pathagar.com

শিক্ষায় আরও সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে।

প্রশ্ন: এসএসসি পর্যায়ে ২৫% নম্বর স্কুলভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য বরাদ্দ থাকবে শিক্ষকের হাতে। এতে কি দুর্নীতির সুযোগ বাড়াবে না?

সা. ই. : কিছু নম্বর শ্রেণী শিক্ষকের হাতে থাকার প্রয়োজনীয়তা আছে এবং বিদেশেও এমনটি প্রচলিত রয়েছে। এক্ষেত্রে দুর্নীতির যে বিষয়টি আশঙ্কা করা হচ্ছে সেটি ঠিক নয়। তবে এখানে শ্রেণী শিক্ষকের হাতে নম্বর বণ্টনের নীতিমালা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

প্রশ্ন : নতুন কমিশনের রিপোর্টে শিক্ষকদের সম্মানজনক বেতন কাঠামোর কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে শিক্ষা বাজেটের ৮৮% রাজস্ব খাতে ১০-১২% উন্নয়নখাতে বরাদ্দ। এটা সামঞ্জস্যপূর্ণ কি?

সা. ই. : বর্তমানে শিক্ষকদের জন্য যে বেতন ভাতা বরাদ্দ রয়েছে সেটা অবশ্যই সম্মানজনক বেতন ভাতা হতে পারে না। আসলে শিক্ষাখাতে মোট বরাদ্দ যেখানে অপ্রতুল সেখানে রাজস্ব বরাদ্দ ও উন্নয়ন বরাদ্দের অসামঞ্জস্যতার বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক। আমি মনে করি শিক্ষাখাতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ বাড়ানো হলে আনুপাতিক হারে উন্নয়ন বরাদ্দ বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে এবং রাজস্ব বরাদ্দ ও উন্নয়ন বরাদ্দের মধ্যে সামঞ্জ্যসতা ফিরে আসবে।

শিক্ষকদের জন্য সম্মানজনক ও গ্রহণযোগ্য বেতন কাঠামো থাকা যুক্তিযুক্ত

প্রফেসর ড. মোসলেহ উদ্দীন আহমদ
উপাচার্য
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

প্রশ্ন: সম্প্রতি প্রণীত জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে মাধ্যমিক পর্যায়ে (এসএসসি) মানবিক, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগ না রাখার সুপারিশ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি?

মো. আ. : যেহেতু এসএসসি প্রথম পাবলিক পরীক্ষা; তাই আমার মতে এই সুপারিশ ঠিকই আছে। মাধ্যমিক লেভেল পর্যন্ত একই শিক্ষা গ্রহণ করার ফলে শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের পরিধি বাড়বে।

প্রশ্ন: এসএসসি পর্যায়ে ২৫% নম্বর স্কুলভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য বরাদ্দ থাকবে শিক্ষকের হাতে। এটা কি দুর্নীতির সুযোগ বাড়াবে না?

মো. আ. : ২৫ ভাগ নম্বর স্কুলের শিক্ষকের হাতে থাকলে স্কুলের শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের প্রতি দায়বদ্ধতা নিশ্চিত হবে। শিক্ষার্থীদের মাঝে শ্রদ্ধাবোধ, শৃঙ্খলাবোধ বৃদ্ধি পাবে। মূল্যবোধ তৈরি হবে।

প্রশ্ন: নতুন কমিশনের রিপোর্টে শিক্ষকদের সম্মানজনক বেতন কাঠামোর কথা বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি?

www.pathagar.com

মো. আ. : শিক্ষকদের জন্য সম্মানজনক ও গ্রহণযোগ্য বেতন কাঠামো থাকা যুক্তিযুক্ত। শিক্ষাবাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সরকারি ও বেসরকারি স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের বেতন বৈষম্য দূর করা দরকার।

এসএসসি পর্যায়ে বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগ না রাখার সুপারিশ করেছি

প্রফেসর ড. আব্দুল কাদির ভূঁইয়া

উপাচার্য, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

ও সদস্য, শিক্ষা কমিশন ২০০৩

প্রশ্ন: সম্প্রতি প্রণীত জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে মাধ্যমিক পর্যায়ে (এসএসসি) মানবিক, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগ না রাখার সুপারিশ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি?

আ. কা. : আমরা কমিটির সবাই আলাপ আলোচনার মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে এসএসসি পর্যায়ে বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগ না রাখার সুপারিশ করেছি। আমরা মনে করেছি এটা সঠিক। তবে ভবিষ্যতে পরিবর্তন পরিবর্ধন তো হতেই পারে।

প্রশ্ন: সাধারণ শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা ও ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা—এ তিনটির মধ্যে সমন্বয় বিধানের জন্য কমিশন সুপারিশ করেছে। আপনার মতে এই তিন মাধ্যম একত্রীকরণে কি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে?

আ. কা. : সাধারণ শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা ও ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা—এ তিনটির মধ্যে সমন্বয় বিধানে আমরা মনে করি অভিন্ন সিলেবাস করা যেতে পারে এবং তা গ্রহণ করলে বাস্তবায়নও ঘটাতে হবে।

প্রশ্ন: এসএসসি পর্যায়ে ২৫% নম্বর স্কুলভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য বরাদ্দ থাকবে শিক্ষকের হাতে। এটা কি দুর্নীতির সুযোগ বাড়াবে না?

আ. কা. : যেহেতু এসএসসি পর্যায়ে ২৫ ভাগ নম্বর স্কুলভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য বরাদ্দ থাকবে অর্থাৎ, শিক্ষকদের হাতে এ নম্বর থাকবে; সেক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে তা ব্যতিক্রম নয়। তবু শিক্ষকদের উপর বিশ্বাস তো রাখতেই হবে। অবশ্য এক্ষেত্রে সব সময় সতর্কও থাকতে হবে।

প্রশ্ন: কমিশনের রিপোর্টে কৃষি বিষয়ক নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন না করতে বলা হয়েছে। আপনার মন্তব্য কি?

আ. কা. : কমিশনের রিপোর্টে কৃষি বিষয়ক নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন না করতে বলা হয়েছে কারণ যা আছে তা সুষ্ঠুভাবে চলুক এবং ওখানকার লব্ধ জ্ঞান কৃষক ভাইদের মাঝে সম্প্রসারণের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়া হোক।

www.pathagar.com

মেধা মূল্যায়নে বোর্ডগুলোর কোনো ভূমিকা থাকার প্রয়োজন নেই

অধ্যাপক মো: আশরাফ আলী
পরিচালক, শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টকে আমি ভাল-মন্দ দুই দিক থেকেই বিচার করব। এই রিপোর্টে যেসব সুপারিশ করা হয়েছে তার মধ্যে স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের সুপারিশগুলো ভালো হয়েছে; তবে উচ্চশিক্ষা পর্যায়ের জন্য গৃহীত সুপারিশগুলো যথাযথ হয়নি বলে মনে করছি। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ায় আগ্রহী করে তোলার জন্য প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা, এসএসসি পর্যন্ত এক সিলেবাসে পড়াশোনা করা, স্কুলের নিজের হাতে ২৫ ভাগ নম্বর রাখা, ফলাফল পদ্ধতির মূল্যায়নভিত্তিক সিদ্ধান্ত যথেষ্ট ভালো হয়েছে। কারণ, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষা খুব বেশি শেখা যায় না, তাই একমুখী শিক্ষা এসএসসি পর্যন্ত রাখা উচিত। আর ২৫ নম্বর স্কুলের হাতে রাখা যথার্থ, কারণ এক ছাত্রকে ১০ বছর ধরে এক প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষকই ভালো চেনে যে, সে কেমন ছাত্র। তাই প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষকদের মূল্যায়নের গুরুত্ব অনেক। মেধা মূল্যায়নে বোর্ডগুলোর কোনো ভূমিকা থাকার প্রয়োজন নেই। কারণ, বোর্ডগুলোর মাধ্যমেই দুর্নীতি প্রবেশ করে। হয়তো প্রথমে সমস্যা হবে তবে পরে ঠিক হয়ে যাবে। রিপোর্টের নেতিবাচক দিক হিসেবে আমি বলব, মাদ্রাসা শিক্ষায় অতি উৎসাহ দান। মাদ্রাসার জন্য একটা বোর্ড রয়েছে তাই বাড়তি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন নেই। এই রিপোর্ট শিক্ষক নিয়োগের জন্য যে কমিটির কথা বলেছে তা দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে গঠিত হয়ে দলীয় লোকে নিয়োগের মাধ্যম হবে। এ ছাড়া ভিসি নিয়োগ কিংবা ১৯৭৩ সালের আইন বিষয়ে খুব ভালো কোনো সুপারিশ উপস্থাপন করতে পারেনি কমিশন।

সবার জন্য একই ধারার বিজ্ঞানভিত্তিক, সেক্যুলার শিক্ষা চালু করতে হবে

খালেকুজ্জামান
আহবায়ক, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল

প্রশ্ন: সম্প্রতি প্রণীত জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে এসএসসি পর্যায়ে বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগ না রাখার সুপারিশ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি?

খা. জামান : আমাদের দেশের প্রগতিশীল সকল ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষানুরাগী মানুষের দাবি হলো একটা নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত একই ধারার

www.pathagar.com

শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা। কিন্তু জাতীয় শিক্ষা কমিশন মাধ্যমিক স্তরে মানবিক, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমান বিভাজন তুলে দেওয়ার যে সুপারিশ করেছে তা ওই দাবির সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। আমাদের গোটা শিক্ষাব্যবস্থায় সাধারণ, মাদ্রাসা, ইংরেজি মাধ্যম, কারিগরি এ চারটা ধারা বিদ্যমান। এদের একটার সাথে আরেকটার বৈষম্য ব্যাপকভাবে বিরাজ করছে। আবার একই ধারার মাঝেও নানা বিভাজন ও বৈষম্য আছে। যেমন- সাধারণ শিক্ষায় গ্রাম-শহরের স্কুল কলেজের মধ্যে বেশ ফারাক। আবার এদের সাথে ক্যাডেট কলেজের বৈষম্য বিরাট। ফলে এইসব বৈষম্য-বিভাজন দূর না করে কমিশনের দেওয়া উক্ত সুপারিশ একটা কথার কথা মাত্র।

প্রশ্ন : সাধারণ শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা ও ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা—এই তিনটির মধ্যে সমন্বয় বিধানে কমিশন সুপারিশ করেছে। আপনার মতে এই তিন মাধ্যম একত্রীকরণে কি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে?

খা. জামান : আমরা মনে করি সাধারণ শিক্ষা, মাদ্রাসা ও ইংরেজি মাধ্যম—এই তিন ধারার মধ্যে সমন্বয় সাধনের যে কথা বলা হয়েছে, তা একটা জগাখিচুড়ি গোঁজামিলের শামিল হবে, যা কোনো ইতিবাচক ফল সৃষ্টি করবে না। আসলে পরস্পর বিপরীতমুখী ওই তিন ধারা যা সমাজ মননকে খণ্ডিত করতে, শ্রেণী বৈষম্য বাড়াতে, শিক্ষার অসামঞ্জস্য তৈরি করতে ও মান নামাতে সহায়তা করছে; তার অবসান ঘটিয়ে সবার জন্য একই ধারার বিজ্ঞানভিত্তিক, সেক্যুলার শিক্ষা চালু করতে হবে।

প্রশ্ন : এসএসসি পর্যায়ে ২৫ ভাগ নম্বর স্কুলভিত্তিক মূল্যায়নের কথা বলেছে এবং সুপারিশ করেছে মিঞা কমিশন। এতে কি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের দুর্নীতি ও রাজনৈতিক নেতাদের প্রভাব পরিলক্ষিত হবে না?

খা. জামান : প্রচলিত শিক্ষা কাঠামোয় পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন শিক্ষা প্রশাসনের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও জবাবদিহিতা ছাড়া এ ধরনের সুপারিশ বাস্তবায়নের ফল হিতে বিপরীত হতে বাধ্য।

প্রশ্ন : কমিশনের রিপোর্টে কৃষি, চিকিৎসা, প্রকৌশলের মতো একক বিষয়ভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা না করার সুপারিশ করা হয়েছে। আপনার মন্তব্য কি?

উত্তর : বিশ্ববিদ্যালয় কথাটার মানেই হলো বিশ্ববিদ্যার আলয়, অর্থাৎ, এখানে গোটা মানবজাতির অর্জিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখার চর্চা হবে এবং নতুন নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করা হবে। এর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিশ্ববীক্ষা তৈরি হবে এবং বিভিন্ন বিষয়ের আদান-প্রদান ও সৃষ্টি-নির্মাণের সুযোগ ঘটবে। কেউ কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের ছাত্র হলেও অন্য বিষয় সম্পর্কেও ধারণা লাভ করতে পারে। এভাবে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে একটা সমন্বিত ধারণা লাভ করে। খুপরিবদ্ধ শিক্ষার কু-প্রভাব থেকে মুক্ত থাকে। তাই একক বিষয়ভিত্তিক কোনো

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বলা যায় না। কিন্তু কমিশন এ ধরনের নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা না করতে বললেও বিদ্যমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত দেয় নি এবং তারা যে ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় চান সে ধরনের নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের প্রতি সুপারিশও করেনি। ফলে তাদের ওই বক্তব্যের কোনো কার্যকারিতা নেই।

কমিশনের সুপারিশগুলোকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে করা হয়েছে বলে মনে হয়

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথমেই পাঠকের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া বোধহয় ভালো হবে যে, আমি শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট ভালো করে পড়িনি, তবে পত্রিকায় যতটুকু পড়েছি তাতে কমিশনের রিপোর্টকে খুব একটা সুদূরপ্রসারী মনে হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ভালো কিছু সুপারিশ করলেও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যথার্থ চিন্তাভাবনা ও দিকনির্দেশনার ছাপ দেখা যায়নি। কোনো সদূরপ্রসারী চিন্তা ছাড়াই নবম শ্রেণী থেকে বিভাজন তুলে দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। এখানে বাণিজ্য বিভাগের কোনো বিষয় রাখা হয়নি। এ ছাড়া হঠকারী সিদ্ধান্ত দিয়ে কম্পিউটার বিষয়টা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অথচ কমিশন একবার চিন্তা করল না যে, যেখানে দরিদ্র কৃষকের ছেলে সামর্থের সীমাবদ্ধতার জন্য লেখাপড়া করতে পারছে না সেখানে কম্পিউটার কি তা সে জানেও না। যার ফলস্বরূপ এসএসসি পর্যায়ে ফল বিপর্যয়ের সম্ভাবনা থাকে। এ ছাড়া উচ্চশিক্ষা পর্যায়ের জন্য গৃহীত সিদ্ধান্ত চিন্তাভাবনা করে করা হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন মূলভিত্তি ১৯৭৩ সালের আইন ও উপাচার্য নিয়োগসংক্রান্ত বিষয়ে পরিবর্তনের জন্য সুপারিশ রাখা হয়েছে। কমিশনের সুপারিশগুলোকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে করা হয়েছে বলে মনে হয়। এ ছাড়া পুরো রিপোর্টে মাদ্রাসা ব্যবস্থার জয়গান গাওয়া হয়েছে যা একটু বাড়াবাড়ি মনে হয়েছে। তারপরও কিছু-কিছু ভালো সুপারিশ করেছে কমিশন, যা বাস্তবায়িত হলে আমাদের শিক্ষার মান অনেক উন্নত হবে।

কৃষি শিক্ষায় উচ্চশিক্ষার সুযোগ বাড়াতে হবে

কৃষিবিদ জাবেদ ইকবাল

সভাপতি

এগ্রিকালচারিস্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ

প্রশ্ন : সম্প্রতি প্রণীত জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে মাধ্যমিক পর্যায়ে (এসএসসি) মানবিক, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগ না রাখার সুপারিশ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে

www.pathagar.com

আপনার মন্তব্য কি?

ডা. ই. : খুবই বাস্তব ও যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত। কারণ, সর্বপ্রথম ষাটের দশকে মাধ্যমিক পর্যায়ে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এদেশে বিজ্ঞান শিক্ষাকে ঔপনিবেশিক নীতিতে সীমিত ও কুক্ষিগত করার জন্য। এ পদ্ধতিতে দেশে সিংহভাগ শিক্ষা মানবিক ও বাণিজ্য গ্রুপে পড়াশোনা করে সারা জীবনের জন্য বিজ্ঞান শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হতো বা এখনো হচ্ছে। এ ছাড়া এসএসসি সার্টিফিকেট গ্রামীণ বাংলাদেশের একটি টার্মিনাল সার্টিফিকেট, দেশের প্রায় অর্ধেক শিক্ষার্থী এ পর্যায়েই ঝরে যায়। যারা ঝরে যায় তারা কেবল মৌলিক শিক্ষার একটি অংশ শিখে তা কাজে লাগানোর সুযোগ না পেয়ে সামাজিকভাবে অযোগ্য হয়ে যায়। এমতাবস্থায় এদেশের জন্য যদি কোনো গ্রুপ না করে সবাই সমান কোর্স নিয়ে পাশ করে তবে এতে তাদের শিক্ষার ব্যবহার ও উপযোগিতা অনেক বেড়ে যাবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য কমে যাবে। শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়বে।

প্রশ্ন: এসএসসি পর্যায়ে ২৫% নম্বর স্কুলভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য বরাদ্দ থাকবে শিক্ষকের হাতে। এটা কি দুর্নীতির সুযোগ বাড়াবে না?

ডা. ই. : বিষয়টি ভালো হলে দুর্নীতির আশঙ্কা করে তা বাস্তবায়ন থেকে বিরত থাকাই যুক্তিযুক্ত । এদেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুর্নীতি বন্ধ করা যাচ্ছে না। তাই বলে কি উন্নয়ন কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে? কথা হচ্ছে এই ২৫% নম্বর কিভাবে দেওয়া হবে? আমার মতে এই ২৫% নম্বরের মধ্যে অন্তত ১০% নম্বর মাসিকভাবে নির্ধারিত ছাত্র হাজিরা খাতে, ১৫% নম্বর অঘোষিত তারিখে নেওয়া পরীক্ষা থেকে দিতে হবে, যা সাথে সাথে বোর্ডে পাঠিয়ে দিতে হবে। বর্তমানে অধিকাংশ এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এ ব্যবস্থা চালু করে সুফল পাওয়া যাচ্ছে।

প্রশ্ন: কমিশনের রিপোর্টে কৃষি বিষয়ক নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন না করতে বলা হয়েছে। আপনার মন্তব্য কি?

ডা. ই. : এটি একটি অবাস্তব ও অবান্তর পরামর্শ। এদেশের ৮৫ ভাগ মানুষের কর্মসংস্থান, অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয় এখনো কৃষিখাতের উপর নির্ভরশীল। এদেশের ৯০% জমিতে কৃষিকাজ হয়। অথচ ১৬ কোটি মানুষের জন্য মাত্র ৩টি অসম্পূর্ণ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (যার একটিমাত্র শুরু হয়েছে, একটি আন্ডার গ্রাজুয়েট ছাত্র নাই)। বর্তমানে দেশের ডিগ্রি ক্লাসে ২ লক্ষাধিক শিক্ষার্থী ভর্তি হচ্ছে, এক্ষেত্রে কৃষি শিক্ষায় ভর্তি হওয়ার সুযোগ আছে মাত্র হাজার দেড়েক শিক্ষার্থীর। কৃষি শিক্ষায় উচ্চশিক্ষার সুযোগ বাড়াতে হবে। দেশের অর্থনীতিতে কৃষির ভূমিকার তুলনায় এটা খুবই নগণ্য। আমার জানামতে এ কমিশনে শিক্ষা বিষয়ক কোনো উপযুক্ত কৃষিবিদ প্রতিনিধি ছিল না বলে কৃষি শিক্ষার প্রকৃত চাহিদা এ রিপোর্টে প্রতিফলিত হয় নি। এদেশের কৃষি বিষয়ক শিক্ষার জন্য কমপক্ষে প্রতিবছর মোট শিক্ষার্থীর ১০% তথা ২০ হাজার শিক্ষার্থীর ভর্তি হওয়ার সুযোগ থাকা একান্ত আবশ্যক।

www.pathagar.com

শিক্ষার প্রসারে এনজিও কার্যক্রম

স্বাধীনতার চৌত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হলেও এখন পর্যন্ত সবার জন্য একটি যুগপোযোগী আধুনিক সর্বজন স্বীকৃত শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যায়নি। বরং শিক্ষা সুবিধা প্রদানের হার ক্রমান্বয়ে কমে যাচ্ছে। মানুষের সামর্থের সাথে পাল্লা দিয়ে শিক্ষার হার কমতে থাকার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলোকে সম্পূরক ভূমিকার স্বীকৃতি দিয়ে শিক্ষা উন্নয়নে অংশ নেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। যার জন্য বিভিন্ন এনজিও শিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নিয়ে আস্তে আস্তে পরিবর্তন আনতে শুরু করেছে। যেসব অঞ্চলে সরকারি শিক্ষা কার্যক্রমের এখনো যাত্রা শুরু হয়নি, সেখানে এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলো ছড়িয়ে দিয়েছে শিক্ষার আলো। যার জন্য শিক্ষার হার বর্তমানে হয়েছে দ্বিগুণ। তাই শিক্ষা প্রসারে সরকারের পাশাপাশি এনজিওগুলোর ভূমিকা ছোট করে দেখার কোনো সুযোগ নেই।

মাঠ পর্যায়ে এনজিওর কার্যক্রম জানতে এনজিওগুলোর মাঠ কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা এবং তাদের কাজের গতি প্রকৃতি স্বচক্ষে দেখে আসাসহ শিক্ষা বিকাশে তাদের সেমিনার, ওয়ার্কশপে যোগদান করে যে ধারণা জন্মেছে তার কিছুটা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এই প্রতিবেদনে। এ প্রতিবেদন তৈরিতে সাংবাদিক শরিফুল ইসলামের সহযোগিতা ছিলো প্রশংসনীয়।

বিপর্যস্ত আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা

৭১'এ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর রাষ্ট্রের সংগঠন থেকে শুরু করে অবকাঠামোগত সামগ্রিক অবস্থা দ্রুত ঠিকঠাক করার চেষ্টা থাকলেও শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নতির গতি ছিল মন্থর। অর্থাৎ সামাজিক অবস্থার দ্রুত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে না পারার কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো গত অবস্থা ছিল ভঙ্গুর। এই অবস্থার ভিতর শিক্ষা কার্যক্রমকে জোড়াতালি দিয়ে চালিয়ে নেওয়া হলেও তাতে শিক্ষার সামগ্রিক অবস্থার খুব একটা উন্নতি হয়নি। এছাড়া শিক্ষার কাঠামোগত সঠিক রূপরেখা না থাকার ফলে সর্বস্তরের জনগণের কাছে শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়নি। তাই সরকার শিক্ষার উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য এ শিক্ষায় এনজিও কার্যক্রমকে উৎসাহিত করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করার সুযোগ দেয়।

শিক্ষায় এনজিওর পথচলা

সহজভাবে বলতে গেলে সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নয় এমন যে কোনো সংস্থাই এনজিও। তবে বিগত তিন দশকে এনজিওর যে রূপ রেখা তৈরি হয়েছে তাতে

www.pathagar.com

বলা যায় এনজিও হচ্ছে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত অমুনাফাভিত্তিক এক ধরনের বিশেষ স্বেচ্ছাসেবী সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

স্বাধীনতার আগে থেকে এদেশে এনজিও কার্যক্রম শুরু হলেও স্বাধীনতার পর মূলত এনজিওর কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। বর্তমানে বাংলাদেশ ১৮৯৬টি এনজিও আছে যার ১৭১১টি দেশি ও ১৮৫টি বিদেশী। তবে এই সংখ্যা শুধু নিবন্ধনকৃত এনজিওর। এর বাইরে আরো ২৫০০০ এর মতো এনজিও আছে, যার মধ্যে শুধু শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে যুক্ত এরকম এনজিওর সংখ্যা কম নয়।

তবে উল্লেখযোগ্য এনজিও হাতে গোনা। এই প্রতিবেদনে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি এনজিওর শিক্ষা কার্যক্রম আলোচনা করা হলো।

ব্র্যাক

ব্র্যাক বাংলাদেশের সবচে বড়ও পুরনো এনজিও প্রতিষ্ঠান। ১৯৭২ সালের যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠনের জন্য এই প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পর থেকে ব্র্যাক পিছিয়ে পড়া বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নয়ন সাধন করার জন্য বিভিন্ন রকম কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। দেশের শিক্ষার মান একের পর এক নেমে যাবার কারণে ব্র্যাক এই ক্ষেত্রেও বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। বর্তমানে শিক্ষার প্রচার প্রসারে সরকারি কার্যক্রমের পর ব্র্যাকের রয়েছে ব্যাপক কর্মসূচি। ব্র্যাকের শিক্ষা কর্মসূচিগুলো হলো—

অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা : যেসব বাচ্চাদের বয়স ৮-১০ বছর তাদেরকে ১-৩ গ্রেডের বছর মেয়াদি একটা শিক্ষা দেওয়া হয়, যা বাংলাদেশ সরকারের প্রবর্তিত পঞ্চম শ্রেণীর সমমান হিসেবে ধরা হয়। এখানে যেসব শিক্ষক নিয়োগ করা হয় তাদের সর্বনিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা এস.এস.সি পাশ হতে হয় এবং তাদের ১১৪ কর্মদিবস প্রশিক্ষণ দিয়ে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

বয়স্ক শিশুদের জন্য মূলভিত্তিমূলক শিক্ষা : ১১-১৪ বয়সি যেসব কিশোর কিশোরী পূর্বে শিক্ষার সুবিধা পায়নি তাদেরকে ১-৫ গ্রেডের একটি শিক্ষা দেওয়া হয়, ৪ বছরে এতে করে সুযোগ বঞ্চিত শিশুদের মাঝে শিক্ষা গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শিক্ষা সহায়তা প্রকল্প : ব্র্যাকে শিক্ষা কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য শিক্ষা নিয়ে যেসব প্রতিষ্ঠান কাজ করে তাদেরকে শিক্ষা বিষয়ক নানা কার্যক্রম সহায়তা দিয়ে থাকে। ১৯৯১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ব্র্যাক NORAD এর সহায়তায় ৫৪৭৫টি স্কুলের ভিতর ৫১৪ এনজিও প্রতিষ্ঠানের ১৫০০টি স্কুলের কার্যক্রমে সহায়তা করছে।

প্রি-প্রাইমারি স্কুল : শিশুদের স্কুলে যেতে উৎসাহ দেওয়ার লক্ষ্যে ব্র্যাক

www.pathagar.com

সর্বপ্রথম শিক্ষা ক্ষেত্রে এই কার্যক্রম তৈরি করে। ১ বছর ব্যপি কার্যক্রমে সপ্তাহে ৬ দিন ২ ঘণ্টা করে বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করা হয়। প্রতিটি গ্রুপে ২৫-৩০ টি শিশু থাকে যেখানে ৬০% মেয়ে থাকতে হয়। এখানে খেলাধুলা, গল্প করার মাধ্যমে শিশুকে স্কুলে আসতে উৎসাহিত করা হয়।

কমিউনিটি স্কুল : ব্র্যাক শিক্ষার প্রসার করার জন্য কমিউনিটি স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এখানে প্রি-প্রাইমারি পর্যায় থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। বর্তমানে ৪৯ ঃ ৫১ অনুপাতে ৪৪টি স্কুলে ৬৬৮৭ জন ছেলে মেয়ে পড়াশোনা করছে।

শিক্ষা উপকরণ : ব্র্যাক তার শিক্ষা কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা উপকরণ নিজে তৈরি করে কমিউনিটির মাঝে বিতরণ করে; যার ফলে কমিউনিটির জনসাধারণ অনেক বিষয়ে উপকৃত হয়।

কিশোর কিশোরী শিক্ষা : ব্র্যাক কিশোর কিশোরীদের তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে থাকে যাতে তারা নিজেরা নিজেদের উন্নয়ন করতে পারে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ : শিক্ষকরা যাতে শিক্ষা প্রদান বিষয়টা ভালভাবে দিতে পারে এজন্য ব্র্যাক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এত করে শিক্ষকদের মান বৃদ্ধি পায় এবং আরো ভালভাবে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতে সমর্থ হয়।

ভ্রাম্যমান লাইব্রেরী : ২০০৩ সালে ব্র্যাক ১২৩টি ভ্রাম্যমান লাইব্রেরী পরিচালনা করে। এখান থেকে ৪৬৪০ জন সদস্যের মাঝে ৪৬৯২৪ বই পড়ার জন্য প্রদান করা হয়। ভ্রাম্যমান লাইব্রেরীর কারণে সবার মাঝে পাঠ্যভ্যাস তৈরি হচ্ছে।

উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান : ব্র্যাক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জনসাধারণের উচ্চশিক্ষার সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে। বর্তমানে এখানে ১৫০০ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। আস্তে আস্তে এর সুযোগ সুবিধা সকল স্তরের জনসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

ভকেশনাল ট্রেনিং : ব্র্যাক ২০০৩ সালের অক্টোবর থেকে শিশু শ্রমিকদের জন্য ভকেশনাল ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করেছে। এখানে ১৩-১৭ বছর বয়সি শিশুরা ৫৩টি কোর্সের ভিতর থেকে যে কোনো কোর্সে ভকেশনাল ট্রেনিং নিয়ে নিজের কাজের ক্ষেত্র উন্নতি সাধন করতে পারবে।

এক নজরে ব্র্যাক

* কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে ৬টি বিভাগের ৬৪টি জেলার ৪৫৬টি থানায়
* মোট কর্মী পুরুষ ২৪০১৭ ও মহিলা ৪৪৫৪২ জন
* শিক্ষার সাথে সম্পর্কযুক্ত কর্মী পুরুষ ৩৫০৮ ও মহিলা ৩৭৬৪২ জন

www.pathagar.com

* শিক্ষা কেন্দ্র প্রি-প্রাইমারি ৭৫০০। প্রাইমারি ২৪৬৭০। ঝরে পড়া কিশোরদের ৯৩৩০ ও অন্যান্য ১৫২৭টি
* শিক্ষার্থী প্রি-প্রাইমারি ছেলে ৮৫৫৯৪ মেয়ে ১টি ১০৭৩ জন আর শিক্ষক শিক্ষার্থী অনুপাত ১ ঃ ১৫
* প্রাইমারি শিক্ষার্থী ২৭৭২৬৮ ও মেয়ে ৫২২৮২৯ জন। আর শিক্ষক শিক্ষার্থী অনুপাত ১ ঃ ১৩
* ঝরে পড়া শিশু কিশোরদের জন্য ব্যবস্থা রয়েছে। ছেলে ৮৭৭৮০ ও মেয়ে ১৯২৮৯৭ জন আর শিক্ষক শিক্ষার্থী অনুপাত ১ ঃ ৩০।
* অন্যান্য পর্যায়ে ছেলে /পুরুষ ১৯৪৮৪২ ও মেয়ে/মহিলা ১৭৩৮০৮ জন
* শিক্ষা বাজেট (জানু-ডিসে ২০০৩) ১৬২৫০০০০০০
* অর্থায়ন সংস্থা : NORAD, CIDA, UNICEF, BEP

প্রশিকা

তিনটি অক্ষরের সমন্বয়ে প্রশিক্ষা শব্দটির মধ্যে নিহিত রয়েছে প্রশিকা প্রতিষ্ঠানের মূলমন্ত্রের প্রথম অংশ। প্র মানে প্রশিক্ষণ, শি মানে শিক্ষা আর কা মানে কাজ। অর্থাৎ প্রশিক্ষণ নেওয়া জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া এবং সবশেষে জনসাধারণের জন্য কাজ করা প্রতিষ্ঠানের মূল কাজ। সেই লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি ১৯৭৬ সালে গঠন করার সময়ই শিক্ষা বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কার্যক্রম হিসেবে গ্রহণ করে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রশিকা যেসব শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে তা হলো :

· **বয়স্ক স্বাক্ষরতা কর্মসূচি** : বয়স্কদের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য প্রথম পর্যায়ে ৬ মাসের কোর্স করানো হয়। এই কোর্স শুধুমাত্র যারা প্রশিকার সুবিধাভোগি তারাই করতে পারবে। এখানে সাধারণ অক্ষর জ্ঞান, যোগ বিয়োগ, গুণ ভাগ শেখানো হয়। প্রতি দিন ২ ঘণ্টা হিসেবে সপ্তাহে ৬ দিনে এখানে এই কোর্স করানো হয়। প্রথম তিন মাসে তৃতীয় শ্রেণীর সমান জ্ঞান দেওয়া হয় আর পরের তিন মাসে পঞ্চম শ্রেণীর সমান জ্ঞান দেওয়া হয়। যাদের বয়স ১৬-২৫ শুধু তারা এখানে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা করতে পারবেন।

পাঠচক্র কার্যক্রম : এই পর্যায়ে যারা ইতোপূর্বে বয়স্ক শিক্ষা পেয়েছে। তারা যেন শিক্ষা বিষয়টা ভুলে না যায়, তাই পাঠচক্র নামে পরবর্তী কার্যক্রমের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এখানে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন বিষয়ে বই থাকে। পাঠক পড়াশোনা করার মাধ্যমে এখান থেকে এই সব বিষয়ে জানতে পারে। এছাড়া এখানে স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার জন্য বই রাখা হয়।

www.pathagar.com

প্রশিকার সদস্যসহ বাইরের সদস্যরাও এখানে পড়াশোনা করতে পারে। বর্তমানে ১৮৮টি প্রশিকা কেন্দ্রের ৮৩৪১ পাঠচক্র ও এই লাইব্রেরী আছে।

অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা : ৮-১১ বছরের যেসব শিশু লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত তাদেরকে এই পর্যায়ে লেখাপড়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়। তারা আগে প্রশিকার নিজস্ব কারিকুলাম তৈরি করে ৯ মাসের একটা শিক্ষা বর্ষ পরিচালনা করা হয়। এক শিক্ষার্থী ৩ বছরের ৩৬ মাসে ৪টি শিক্ষা বর্ষ সম্পন্ন করার পর তাকে পঞ্চম শ্রেণীর সমমান শিক্ষা প্রাপ্ত বলে ধরা হবে। ফলে পরবর্তীতে কেউ আরো পড়তে চাইলে যে কোনো স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবে। এই কার্যক্রমে একজন শিক্ষকের অধীনে ৩০-৩৫ জনের মতো শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে।

শিশুকে বিদ্যালয়গামী করতে উৎসাহিত করার কার্যক্রম : গ্রামাঞ্চলে অনেক পিতামাতাই সন্তানের লেখাপড়ার ব্যাপারে সচেতন নয়। যার ফলে প্রশিকার প্রতিনিধিগণ বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে সন্তানের বাবা মাকে বুঝানোর চেষ্টা করে থাকে, কেন শিশুর জন্য লেখাপড়া করা জরুরী। লেখাপড়া চলাকালীন কি সুবিধা পাবে লেখাপড়ার খরচ কে দেবে, সে বিষয়েও বোঝানোর চেষ্টা চলে। এতে করে অনেক নিরুৎসাহিত বাবামায়েরা উৎসাহিত হন এবং সন্তানকে স্কুলে দেন।

এক নজরে প্রশিকা

* প্রশিকার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে ৬টি বিভাগের ৫৬টি জেলার ২৮৩টি থানায়
* কর্মী সংখ্যা পুরুষ ৫৯৪৭ মহিলা ৯৪১৪ জন
* শিক্ষার সাথে যুক্ত কর্মী পুরুষ ৩২৬ ও মহিলা ৫৯২৬ জন
* শিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা বয়স্ক শিক্ষা ৭৫০০ ও প্রাথমিক স্কুল ৫০০
* শিক্ষার্থীর সংখ্যা বয়স্ক শিক্ষা ১৮৭৫০০ জন ও প্রাথমিক পর্যায়ে ১৮০০০
* শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর অনুপাত প্রাথমিক শিক্ষা ১ঃ ৩০ বয়স্ক শিক্ষা ১ঃ ২০
* অর্থায়ন সংস্থা : EU, DFIF, NOVIB, PKSBF, SIDA, CIDA

মূল্যায়ন : শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে প্রশিকা যুক্ত হওয়ার পর থেকে শিক্ষা কার্যক্রমের যথেষ্ট সম্প্রসারণ হচ্ছে। গ্রামগঞ্জের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ছে শিক্ষার আলো। বয়স্ক শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে যেমন বাবা-মাকে শিক্ষার আলোয় নিয়ে আসছে তেমনি শিশুদেরকে স্কুলে পাঠানোর কথা বলে তাদের শিক্ষার উন্নয়ন করছে। এছাড়া ঝরে পড়া যেসব বাচ্চা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত তাদেরকে স্বল্প সময়ে বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা দিচ্ছে। এছাড়া যারা কর্মজীবি তাদের জন্য পাঠচক্রের ব্যবস্থা করে তাদের মাঝে পাঠভ্যাস তৈরি করে সচেতনতা বৃদ্ধি করছে।

www.pathagar.com

শিরিন আকতার

সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার, শিক্ষা বিভাগ, প্রশিকা

প্রশ্ন : এনজিওর শিক্ষা কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হলো সরকারি কার্যক্রমে সাহায্য করা। এক্ষেত্রে আপনাদের ভূমিকা কতটুকু?

শি. আ. : বয়স্কদের শিক্ষা দান, নিরক্ষরতা দূর করা, স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধি; এসব বিষয়ে আমরা সরকারকে যথাসম্ভব সাহায্য করছি। বয়স্কদের শিক্ষাদানের মাধ্যমে বয়স্ক শিক্ষা, নিরক্ষরতার হার কমাতে চেষ্টা করছি। এছাড়া স্কুল প্রতিষ্ঠা করে এবং ঝরে পড়া বাচ্চাদের স্কুলগামী করে উভয়ভাবে সরকারকে সাহায্য করছি। কিন্তু বর্তমানে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমটি ফান্ড না থাকার কারণে এই কার্যক্রমে আমরা কোনো ভূমিকা রাখতে পারছি না। তাই পূর্বে এই কার্যক্রমে আমাদের ২০,০০০ স্কুল থাকলেও বর্তমানে ৫০০ স্কুল আছে। ২০০০ সালের পর থেকে এই কার্যক্রম কোনো ফান্ড আমরা পাইনি। কেন ফান্ড পাচ্ছি না, কেন আমাদের ফান্ড আটকে রাখা হল তা কর্তৃপক্ষ ভাল বলতে পারবে।

প্রশ্ন : শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য নিজস্ব কারিকুলাম তৈরি করে সেই অনুসারে বাচ্চাদের পড়াশোনা করাচ্ছেন। তবে কি সরকারিভাবে নির্ধারিত কারিকুলাম যথোপযুক্ত নয় বলে মনে করেন?

শি. আ. : বিষয়টি আসলে এরকম নয়, বরং NCTB কারিকুলাম মূলভিত্তি হিসেবে ধরে ঝরেপড়া যে শিশুর জন্য যতটা প্রয়োজন সেই অনুসারে আমরা বিশেষজ্ঞদের দিয়ে NCTB এর কারিকুলামকে সংক্ষিপ্ত ও সামান্য পরিবর্তন করে নিয়েছি। এতে ঝরে পড়া শিশুদের যেমন সহজে শিক্ষা দেওয়া যাচ্ছে তেমনি NCTB-কেও উপেক্ষা করা হচ্ছে না।

প্রশ্ন : আপনাদের বেশ কিছু কার্যক্রম পরিচালিত হয় বিদেশী প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে। এক্ষেত্রে নিজস্ব সংস্কৃতি উপেক্ষিত হয় কি না?

শি. আ. : প্রশিকার শিক্ষা কার্যক্রমের পুরোটা বিদেশী প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে হয়ে থাকে তবে তারা এক্ষেত্রে বাধা হিসেবে কাজ করে না বরং আমাদের নিজেদের মতো করে প্রজেক্ট কিছু পরিবর্তন আনতে হয়। বিদেশী প্রতিষ্ঠানের কোনো ভূমিকা তাতে থাকে না।

প্রশ্ন : যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে সেগুলোর শিক্ষার্থীর জন্য আপনারা কি ব্যবস্থা নিয়েছেন?

শি. আ. : কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়া উদাহরণ নয়। তারপরও যদি কোনো উপযুক্ত কারণ ছাড়া মাঝ পথে বন্ধ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে সরকারকে এগিয়ে আসতে হয়। সরকার এক্ষেত্রে এগিয়ে আসেনি। তাই আমরা নিজেদের উদ্যোগে কিছু শিক্ষার্থীকে আমাদের অন্য স্কুলে বা কাছের অন্য প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করিয়ে দিয়েছি আর কিছু অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে ঝরে গেছে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : শিক্ষা ক্ষেত্রে আপনাদের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম কি?

শি. আ. : এখন পর্যন্ত আমাদের মূল কাজ প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে তবে মাঠ পর্যায়ের গবেষণা থেকে আমরা দেখতে পাচ্চি হাই স্কুল পর্যায়ে মধ্যবিত্তদের জন্য উপযুক্ত মানের বিদ্যালয়ের অভাব। বিশেষ করে সময়টা যখন ইংরেজি আর কম্পিউটারের। তাই NCTB এর ইংলিশ ভার্সনের এই ব্যবহার করে আমরা দুটো ইংরেজি মাধ্যম স্কুল খোলার পরিকল্পনা করছি যাতে নিম্নবিত্তরাও ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের সুবিধা নিতে পারে।

অপরাজেয় বাংলাদেশ

অপরাজেয় বাংলাদেশ একটি জাতীয় শিশু অধিকার সংস্থা। এটি নতুন ১৯৯৬ সালে যাত্রা শুরু করলে মূলত এই প্রতিষ্ঠান এর পথ চলা শুধু করে ১৯৭৬ সালে। তখনকার সামাজিক অবস্থার আলোকে টেরে ডেস হোশ কর্তৃক এই প্রতিষ্ঠানটি তারা যাত্রা শুরু করে। এই প্রতিষ্ঠান পাশাপাশি শিক্ষা সম্প্রসারণমূলক যেসব কাজ করে তা হলো—

(ক) আনুষ্ঠানিক শিক্ষা

এখানে যাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয় তারা মূলত সমাজের সুবিধা বঞ্চিত পথশিশু। বস্তির শিশু, শিল্প কারখানার শিশু, নির্যাতিত শিশু। তাই এদেরকে তাদের প্রয়োজন ও ধরণ অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া হয়।

স্ট্রিক স্কুল : এই পর্যায়ে যেসব পথ শিশু আছে তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়। NCTB এর কারিকুলামকে সংক্ষিপ্ত করে প্রতিটি বাচ্চাকে ৬ মাসের শিক্ষা দেওয়া হয় তৃতীয় শ্রেণী সমমান শিক্ষা এখানে বাচ্চাকে দেওয়া হয়। ঢাকার ১৬টি, চট্টগ্রামে ৪টি স্থানে পথশিশুদের শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানে বছরে প্রায় ২৫,০০০ শিশুকে শিক্ষা দেওয়া হয়।

ক্লাশ স্কুল : বস্তিতে যেসব শিশু আছে তাদের জন্য আরো একটা স্থায়ি ব্যবস্থার আলোকে শিক্ষা দেওয়া হয়। এদেরকে ১ বছর মেয়াদী শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানে তারা ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করতে পারে। ঢাকা শহরে এরকম ৪টি এলাকার বস্তিতে শিশুদের শিক্ষা দেওয়া হয়।

ড্রপ ইন সেন্টার : কোনো শিশু যদি নির্যাতনের সম্মুখীন হয়, তাকে একটা নিরাপদ স্থানে রাখার জন্য ড্রপ ইন সেন্টারে নিয়ে আসা হয়। এখানে বাচ্চাকে থাকার সুযোগ করে দেওয়ার পাশাপাশি লেখাপড়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়।

ক্লাব : এখানে বাচ্চাদের সারাদিন থাকার সুব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। যেসব ব্যবস্থা দিনে অন্য কোথাও যেতে পারে না বা থাকতে পারে না, তারা এখানে এসে

www.pathagar.com

খেলাধুলা, গল্প, টেলিভিশন দেখতে পারে। আর এইসব কার্যক্রমের মাধ্যমে একজন ভলেন্টিয়ার বা শিক্ষকের মাধ্যমে এই সব শিশুকে সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হয়।

(খ) অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা

যেসব শিশু ৬ষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষা সম্পন্ন করেছে তারা যদি আরো পড়াশোনা করতে চায়, তাদেরকে এখানে আরো পড়াশোনা করার সুযোগ করে দেওয়া হয়। এজন্য তাদেরকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করে দেওয়া এবং যাবতীয় খরচ প্রতিষ্ঠান থেকে নির্বাহ করা হয়।

(গ) কারিগরি ও ভকেশনাল ট্রেনিং

যেসব শিশু ৮ম শ্রেণীর শিক্ষা শেষ করে ভকেশনাল ট্রেনিং নিতে চায় তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া এবং কেউ যদি কম্পিউটার ট্রেনিং নিতে চায় তখন তাদেরকে কম্পিউটারের ট্রেনিং দেওয়া হয়। আবার কেউ যদি অন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ নিতে চায় তাদেরকে ইউসোপে ভর্তি করে দেওয়া হয় প্রশিক্ষণ নেবার জন্য।

এক নজরে অপরাজেয় বাংলাদেশ

* কার্যক্রম অব্যাহত আছে ৪টি বিভাগের ৫টি জেলায়
* শিক্ষার সাথে যুক্ত কর্মী পুরুষ ২২০ ও মহিলা ১৮০ জন
* শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্র ৪৪৩ ও ছাত্রী ৭৩৭ জন
* শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত ১ ঃ ৩০
* অর্থায়ন সংস্থা : NORDA, UNICEF, SHAPLA, NEER-JAPAN, HOPE FOR CHILDREN, VK, TDH-ITALY

ওয়াহিদা বানু

পরিচালক, অপরাজেয় বাংলাদেশ

প্রশ্ন : আপনাদের পরিচালিত শিক্ষা কার্যক্রম কোন বিষয়টাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়— ফরমাল না ননফরমাল?

ও. বা. : যেহেতু এই সব পথশিশু ভ্রাম্যমান। তাই এদের জন্য স্বল্প মেয়াদী কারিকুলাম প্রয়োজন। এজন্য আমরা NCTB কারিকুলামকে ভিত্তি করে এইসব শিশুদের উপযোগী করে কারিকুলাম তৈরি করি।

প্রশ্ন : Street child নিয়ে যখন কাজ করেন, তাদের পুনর্বাসনে শিক্ষার পাশাপাশি পুনর্বাসন বিষয়টাকে কতটুকু গুরুত্ব দেন?

ও. বা. : এই সব পথশিশুকে যদি প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়ার পর পুনর্বাসনের

www.pathagar.com

ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তবে এই প্রক্রিয়া কখনো বন্ধ হবে না। এজন্য কারিগরি ও ভকেশনাল থেকে যারা প্রশিক্ষণ নেয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ করে, তাদেরকে আমরা পুনর্বাসন করার ব্যবস্থা করে দেই। তার পরবর্তীতে তাদেরকে নতুন শিশুদের সামনে হাজির করে তাদেরকেও শিক্ষা গ্রহণ ও পুনর্বাসনে উৎসাহিত করি।

প্রশ্ন : এই ধরনের বিষয় নিয়ে কাজ করার আমাদের মূল কারণ হল শিশুরা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাদের যদি সঠিকভাবে গড়ে তোলা না যায় তবে সত্যিকারের উন্নয়ন নিশ্চিত হবে না। এছাড়া মফস্বল থেকে শহরে আসার যে প্রবণতা তা বন্ধ হবে না এবং জনসাধারণ সচেতন হবে না। শিক্ষা ক্ষেত্রে আপনাদের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য কি?

ও. বা. : আমরা শিক্ষা ব্যবস্থাকে পথশিশুদের সামনে আরো সহজভাবে উপস্থাপন করার জন্য টাচস্কিন কম্পিউটারের ব্যবস্থা করব। যাতে একজন শিশু সঠিকভাবে লেখাপড়া না শিখলেও শুধু প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে যে কোন বিষয় সম্পর্কে একটা পুরোপুরি ধারণা পেতে পারে।

কারিতাস বাংলাদেশ

কারিতাস অর্থ প্রেম, মানব উন্নয়নের প্রেম। প্রতিষ্ঠালগ্ন সময় থেকে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের জন্য কারিতাস কাজ করে আসছে। সমাজের মানুষের সত্যিকারের উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের পাশাপাশি কারিতাস তাই শিক্ষা উন্নয়ন কার্যক্রম নিজের সাথে যুক্ত। এখানে আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক ও বৃত্তিমূলকসহ সবরকম শিক্ষা উন্নয়ন সেবা দেওয়া হয়।

(ক) আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম

কারিতাস শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বেশকিছু আনুষ্ঠানিক শিক্ষা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ : ভাল শিক্ষা দেওয়ার প্রধান শর্ত ভাল শিক্ষক তৈরি করা। এজন্য কারিতাস সারা দেশকে ৬টি অঞ্চলে ভাগ করে একযোগে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। যাতে প্রশিক্ষণ পেয়ে শিক্ষকের শিক্ষা দেওয়ার মান বৃদ্ধি পায়।

ভাষা শিক্ষার শর্ট কোর্স : মফস্বল অঞ্চলে ভাল মানের বিষয় ভিত্তিক শিক্ষকের খুব অভাব। বিশেষ করে ইংরেজি শিক্ষকের। এজন্য কারিতাস শিক্ষকদের ইংরেজি বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কোর্সের ব্যবস্থা করে।

নীতি ও নৈতিকতা শিক্ষা : ছাত্রদের মাঝে নৈতিকতার বীজ রোপণ করার

www.pathagar.com

জন্য প্রথমে শিক্ষকদের সংশোধন করা প্রয়োজন। এজন্য শিক্ষকদের নিয়ে বাস্তবতা ও মূল্যবোধ ভিত্তিক একটি শিক্ষা কার্যক্রমের ব্যবস্থা করে কারিতাস।

শিক্ষা উপকরণ প্রদান : যেসব প্রতিষ্ঠানের শিশুরা বই কিনতে পারে না কারিতাস তাদের বই কিনে দেয়। এছাড়া বিজ্ঞানাগার, অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ, খেলাধুলার উপকরণ প্রদান করার জন্য অর্থ সাহায্য করে সাহায্য করে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাংস্কৃতির প্রতিযোগিতা : এ কার্যক্রমের আওতায় কারিতাস রচনা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা বিজ্ঞান মেলা ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে। এছাড়া শিক্ষা সফরের জন্য বিভিন্ন সময় অর্থ সাহায্য করে তাকে।

বিভিন্ন দিবস উদযাপন : কারিতাস শিক্ষা কার্যক্রমের চেতনা সবার মাঝে ছড়িয়ে দেবার জন্য শিক্ষক দিবস উদযাপন করাসহ্ শিক্ষক সম্মেলন করে থাকে।

পিছিয়ে পড়াদের মাঝে শিক্ষা সম্প্রসারণ : কারিতাস পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়, আদিবাসিসহ্ অন্যান্যদের মাঝে শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করার জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম অর্থ সাহায্যসহ্ বিভিন্নভাবে বিভিন্ন রকম সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে।

(খ) অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা

বস্তির শিশুদের শিক্ষাদান : ঢাকাসহ্ অন্যান্য বড় শহরের বস্তির শিশুদের স্কুলগামী করতে বিভিন্ন রকম কার্যক্রম গ্রহণ করার পাশাপাশি তাদেরকে সহজ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা হয়।

অবহেলিত শিশু শিক্ষা প্রকল্প : সমাজের অবহেলিত শিশু, অর্থাৎ যেসব শিশু শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত তাদের জন্য কারিতাস বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করে তাদের শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত করে।

গ্রামীণ ভূমিহীন চাষীদের বয়স্ক শিক্ষা দান : গ্রামীণ পর্যায়ে যেসব ভূমিহীন প্রান্তিক চাষী আছে তাদেরকে অনানুষ্ঠানিক বিভিন্ন রকমের শিক্ষা দিয়ে শিক্ষিত করে তোলার পাশাপাশি তাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করে তোলা হয়।

(গ) কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ

কারিতাস গরীব ও বস্তিবাসী বেকার যুবকদের কাঠ মিস্ত্রী, ইলেক্ট্রনিক্স, কারিগরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভ্রাম্যমান কারিগরি স্কুলের মাধ্যমে ৬ মাসের সংক্ষিপ্ত একটি কোর্সে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। তবে কেউ আরো উন্নত প্রশিক্ষণ নিতে চাইলে ১ বছর থেকে ৩ বছর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বেকার, দুস্থ, বস্তিবাসীদেরকে কারিতাস স্বকর্মসংস্থানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে থাকে।

মূল্যায়ন : কারিতাস ছাত্র, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য যে সব

www.pathagar.com

কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তাতে মফস্বলের শিক্ষার পরিবেশ অনেক উন্নত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কার, মেরামত করা, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়াসহ ছাত্রদের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করে থাকে। স্কুলের শিক্ষকদের শিক্ষা দেওয়ার মান এখন আগের থেকে অনেক ভালো। উপকরণ স্বল্পতায় স্কুলগুলোকে ভুগতে হয় না। চক, ডাস্টার, ব্লাকবোর্ড, চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, ফ্যান, বিজ্ঞানাগার ইত্যাদি প্রয়োজনীয় উপকরণ পর্যাপ্ত থাকার অন্য যে কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে কারিতাসের সাহায্য পাওয়া প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান ভাল। এছাড়া কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা পাওয়ায় বেকার দুস্থ যুবকরা কর্মসংস্থান করতে পারছে আগের চেয়ে বেশি।

এক নজরে কারিতাস

*** কার্যক্রম অব্যাহত আছে ৫ বিভাগের ৪০ জেলায় ৯৯টি থানায়**
*** মোট কর্মী পুরুষ ৩৩৬০ মহিলা ১৪১৯ জন**
*** মোট শিক্ষাকর্মী পুরুষ ১২২৫ মহিলা ৮৭২ জন**
*** কেন্দ্রের সংখ্যা ৩১১টি**
*** শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছেলে ১০৫৯৯ জন ও মেয়ে ১১২৭৫ জন**
*** শিক্ষক শিক্ষার্থী অনুপাত ১ ঃ ৩০**
*** অর্থায়ন সংস্থা** CORDAID, MISEREOR, CAFOD, CRSAUSA

কেয়ার বাংলাদেশ

বাংলাদেশের শিক্ষার উন্নয়নকল্পে যে ক'টি এনজিও প্রতিষ্ঠান অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে, তার মধ্যে কেয়ার অন্যতম। শিক্ষা উন্নয়নে কেয়ার ১৯৫৫ সাল থেকে কাজ শুরু করলেও বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম শুরু করে ২০০০ সাল থেকে। এই সময় তারা প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে কাজ শুরু করে এবং পরবর্তীতে ঝরে পড়া কিশোর বা সুযোগ বঞ্চিত কিশোরদের নিয়ে কাজ শুরু করে। নিচে কেয়ার বাংলাদেশের কার্যক্রম তুলে ধরা হলো-

(ক) প্রাথমিক শিক্ষা : কেয়ার ২০০০ সাল থেকে শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য কাজ শুরু করে। তারা ব্র্যাক, প্রশিকা বা ইউসেপের মতো কোর্স ডিউরেশন না দেখিয়ে শিক্ষাবর্ষ ১২ মাসে ধরে শিশুদের NCTB নির্ধারিত কারিকুলামে শিক্ষা প্রদান শুরু করে। দিনের পর দিন তাদের এই কার্যক্রমের গ্রহণযোগ্যতা যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি ছড়িয়ে পড়ছে শিক্ষার প্রসারতা।

(খ) সুযোগ বঞ্চিতদের জন্য শিক্ষা : যেসব শিশু পরিবার থেকে পর্যাপ্ত সাহায্য না পাবার কারণে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে তাদেরকে লেখাপড়ার সুযোগ করে দেয়ার জন্য কেয়ার এই কার্যক্রম হাতে নেয়। এখানে

www.pathagar.com

ছেলেদের থেকে মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণের হার বেশি।

(গ) কিশোর-কিশোরীদের শিক্ষা : কেয়ার কিশোর কিশোরীদের বয়স অনুপাতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

(ঘ) শিক্ষক প্রশিক্ষণ : শিক্ষকরা যাতে স্কুলে শিশুদের ভাল মানের শিক্ষা দিতে পারে এজন্য কেয়ার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এই প্রশিক্ষণ প্রতিমাসে এক দিনের জন্য হয়ে থাকে। এতে করে শিক্ষকদের শিক্ষা দেওয়ার মান বৃদ্ধি পায়।

অন্যান্য কার্যক্রম : কেয়ার শিশুদের লেখাপড়ার সাহায্য করার পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের বিশেষ করে মায়েদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে— কিভাবে নারী ও শিশুর উন্নয়ন করা যাবে। কিভাবে পরিবারের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে, কিভাবে উন্নত মানের কৃষি কাজ করা যাবে, কিভাবে বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করা যাবে।

মূল্যায়ন : কেয়ার শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে নিজেকে যুক্ত করায় শিশু শিক্ষার হার দিন দিন ঐ স্থানে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য শিক্ষকদের মানও উন্নত হচ্ছে। তবে এই কার্যক্রমের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে কেয়ারের অন্যান্য কার্যক্রমের ভিতর পরিবারের সামগ্রিক উন্নয়নমুলক কার্যক্রম। এতে করে পরিবারের সদস্যরা নিজেরাই নিজেদের উন্নতি ঘটাতে উদ্যোগি হয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করছে।

এক নজরে কেয়ার বাংলাদেশ

* কার্যক্রম অব্যাহত আছে ৪টি বিভাগের ৭টি জেলার ১৪টি থানায়
* শিক্ষা কার্যক্রমে নিয়োজিত পুরুষ কর্মী ৩১৩ ও মহিলা ২৩১ জন
* শিক্ষা কেন্দ্র প্রাথমিক পর্যায়ে ১৮৮ ও ঝরে পড়া শিশুদের জন্য ৪টি
* শিক্ষার্থী প্রাথমিক পর্যায়ে ছেলে ৯১৪৯ ও মেয়ে ৭৬০ জন
* শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত ১ ঃ ৪৫
* অর্থায়ন সংস্থা SDC, VSAID, DFIF, CIDA, DANIDA

ওয়ার্ল্ড ভিশন

ওয়ার্ল্ড ভিশন একটি আন্তর্জাতিক অলাভজনক মানবসেবামূলক প্রতিষ্ঠান। নানাবিধ সমাজসেবা ও মানব কল্যাণমূলক কার্যক্রমের মধ্যে শিক্ষাসেবা এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম একটি কার্যক্রম। শুরু থেকে প্রতিষ্ঠানটি এই কার্যক্রমের সাথে যুক্ত না থাকলেও পরবর্তীতে সময়ের প্রয়োজনে এটিকে যুক্ত করে। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান থেকে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় ধরনের শিক্ষা সেবা দেওয়া হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

(ক) ছাত্রদের জন্য দেওয়া শিক্ষা সাহায্য

ছাত্রদের লেখাপড়া যাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হতে পারে এজন্য সাধারণত তিন ধরনের সাহায্য করা হয়।

বেতন ও ফি প্রদান : এই ধরনের সাহায্যের মাধ্যমে যেসব শিক্ষার্থীরা তাদের নিজেদের লেখাপড়ার খরচ নির্বাহ করতে অসমর্থ, তাদেরকে সাহায্য করা হয়— তাদের ভর্তি ফি, পরীক্ষা ফি, বেতন ইত্যাদি পরিশোধ করার জন্য। যাতে শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট সময়ে বেতন ও অন্যান্য খরচাদি নির্বাহের জন্য পড়াশোনায় বাধাগ্রস্থ না হয়।

বৃত্তি প্রদান : এই ক্যাটাগরিতে এই প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করা হয়। তবে যাদেরকে বৃত্তির আওতায় আনা সম্ভব হয় না তাদেরকে এককালীন সাহায্য প্রদান করা হয়ে থাকে।

উপকরণ প্রদান : সর্বশেষ এই ক্যাটাগরিতে অসমর্থ শিক্ষার্থীদের বছরে ২ থেকে ৩ বার শিক্ষা উপকরণ দেওয়া হয়। শিক্ষা উপকরণের মধ্যে রয়েছে স্কুল ব্যাগ, খাতা, কলম, পেনসিল, রুলার, পেনসিল শার্পনার, ক্যালকুলেটর, স্কুল ড্রেস এমনকি শিক্ষার্থীর জন্য প্রয়োজনীয় ছাতা, মশারিও।

(খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেওয়া সাহায্য

ছাত্রদের পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যও নির্দিষ্ট কিছু সাহায্যের ব্যবস্থা এই প্রতিষ্ঠান থেকে রাখা হয়েছে যা শিক্ষার প্রসারে ভূমিকা পালন করে।

স্থাপনা স্থাপনে সাহায্য : ওয়ার্ল্ড ভিশন থেকে কোন স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন অথবা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আংশিক নতুনভাবে স্থাপন বা পুনঃস্থাপনে সাহায্য করা হয়। যেমন-ছাত্রদের জন্য বাড়তি ক্লাস রুম, পানি খাবার জন্য টিউবওয়েল, বাথরুম।

উপকরণ : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ প্রদানে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে সাহায্য করা হয়। যেমন চক, ডাস্টার, ব্লাকবোর্ড, ম্যাপ, গ্লোব, চার্ট, চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, ফ্যান, আলমারি, লাইট ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ।

আর্থিক সাহায্য : ওয়ার্ল্ড ভিশন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সরাসরি আর্থিক সাহায্য দিয়ে সাহায্য করে না। তবে শিক্ষা বিষয়ক কোনো সাংস্কৃতি কর্মকাণ্ড পরিচালনা, শিক্ষা ভ্রমণ, শিক্ষা বিষয়ক দিবস উদপযাপন করতে সাহায্য করে।

অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা : এই কার্যক্রমের আওতায় পাশের ছিন্নমূল শিশু, বস্তির শিশুদের নিয়ে ৩০ জনের একটা দল করে ৩ বছরের একটা কোর্স করানো হয়। এছাড়া বিভিন্ন দলের সদস্য হিসেবে যারা থাকে তাদের জন্য বিভিন্ন বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

কার্যক্রমের ভূমিকা : শিক্ষার প্রসারে ওয়ার্ল্ড ভিশন বিশেষ ভূমিকা রাখছে। সারা বাংলাদেশে ওয়ার্ল্ড ভিশনের ৩৮টি কেন্দ্র বা ADP অফিস আছে। এই ADP

www.pathagar.com

অফিসগুলোর প্রতিটির অধীনে কমপক্ষে ২ হাজার থেকে ৫ হাজার স্পন্সর শিশুসহ মোট ১,০৭০০০ স্পন্সর শিশু আছে, যাদের শিক্ষার ব্যয়ভারের প্রায় পুরোটা বহন করে ওয়ার্ল্ড ভিশন। এছাড়া এককালীন সাহায্য গ্রহিতা শিশুও আছে; যার প্রতিটিতে আরো কমপক্ষে এক হাজার করে শিশু। বাচ্চাদের শিক্ষা সাহায্য দেওয়ার পাশাপাশি প্রতিটি কেন্দ্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যও বিশেষ সাহায্য দেওয়া হয়। এছাড়া যেসব ছেলেমেয়ের লেখাপড়া শেষ হয়ে গেছে অথবা মাঝ পথে থমকে গেছে, তাদেরকে সরাসরি কারিগরি সাহায্য দিতে না পারলেও নির্বাচিত কিছু সংখ্যককে কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্য কিছু খরচ দেওয়া হয়। বয়স্ক পুরুষ মহিলাদের লেখাপড়া করানোর পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়; যাতে তারা নিজেরা স্বাবলম্বি হয়ে কাজ করতে পারে।

এক নজরে ওয়ার্ল্ড ভিশন

* কার্যক্রম অব্যাহত আছে ৫টি বিভাগের ২২টি জেলার ৩৩টি থানায়
* শিক্ষা কেন্দ্র প্রি-প্রাইমারি ৩৪০ ও বয়স্ক ৭৪২টি
* শিশু শিক্ষার্থী মোট ২,০৮০০০ জন
* স্পন্সর শিশু ১০৭০০০ জন ও নন স্পন্সর ৩১০০০ জন, প্রি-প্রাইমারিতে
* বয়স্ক শিক্ষার্থী ১৫৪৯৭ জন পুরুষ ১৩৯৫০ ও মহিলা ১৫৫০ জন
* শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত ১ঃ ৩০ জন
* বয়স্ক শিক্ষার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত ১ঃ ২৫
* অর্থায়ন সংস্থা USAID, CIDH, ODH, AUS, AID, OWN FUN.

প্লান বাংলাদেশ

শুরুতে শিশু সুযত্ন পেলে বাড়বে শিশু বুদ্ধি। বলে এই শ্লোগান নিয়ে ছোট ছোট শিশুদের আত্মিক, মানসিক ও লেখাপড়ার উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে 'প্লান বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান বয়স্কদের পরিবর্তে পঞ্চম শ্রেণী অথবা তার নিচের শ্রেণির বয়সি শিশুদের নিয়ে কাজ করে। এই প্রতিষ্ঠান Community learning program এর আওতায় Basic education ও Early childhood care and development Program নামে দুটো শিক্ষা বয়সি কার্যক্রম পরিচালনা করে।

(ক) Early childhood care and development program

এই পর্যায়ে শিশুর শারীরিক, সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা হয় বলে একে Early childhood care and development বলে। এই পর্যায়ে দুটো কার্যক্রমকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

www.pathagar.com

শিশু বিকাশ কেন্দ্র : এই কার্যক্রমের আওতায় ৩-৫ বছর বয়সি শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করে কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করা হয়। শিশুদের সৃজনশীল বিকাশের লক্ষে এখানে হাসি গানে, খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুদের প্রয়োজনীয় বিষয় শেখানো হয়ে থাকে। এখানে মুখে মুখে সাধারণ অক্ষর জ্ঞান, সাধারণ গণিত, পরিবেশ বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য জ্ঞান দেওয়া হয়।

প্রাক স্কুল কার্যক্রম : এই পর্যায়ে ৫-৬ বছরের শিশুদের স্কুল গমন উপযোগি করার জন্য কাজ করা হয়। এখানে যেসব শিশুদের নিয়ে কাজ করা হয় তাদেরকে কি ধরনের পরিবেশ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে, কি শিখতে সে বিষয়ে ধারণা দেওয়া হয়। সাধারণ বাংলা, ইংরেজি, গণিত পরিবেশ বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে শেখানো হয়।

(খ) Basic education :

এই পর্যায়ে বাড়তি কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করে বরং সরকারি স্কুলগুলোতে ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত যেসব শিশু পড়াশোনা করে তাদের মানোন্নয়নের জন্য কাজ করা হয়। এই কার্যক্রমটি দুটি পর্যায়ে বিভক্ত।

সোপান : এই পর্যায়ে ১ম ও ২য় শ্রেণীতে যেসব শিশু পড়াশোনা করে তাদেরকে Target করে কাজ করা হয়। মফস্বল অঞ্চলে সকল শিশু শিক্ষার সাধারণ মান নিয়ে পড়াশোনা করতে পারে না। তাই স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে তিন মাসের একটা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এর মাধ্যমে ১ম ও ২য় শ্রেণীর শিশুদের মান উন্নয়ন করার চেষ্টা করা হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষের আলোচনার প্রেক্ষিতে টিউটর বা সেবাদানকালীন ব্যক্তির মাধ্যমে এই কাজ করানো হয়। স্কুলের পড়াশোনার বাইরে ১-২ ঘণ্টা শিশুদের নিয়ে নানা শিশু মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে তাদের মানোন্নয়ন করানো হয়।

কার্যক্রমের গুরুত্ব : শিশুর বিকাশ সাধনের জন্য সবচে গুরুত্বপূর্ণ সময় হলো শিশুকাল। এই সময় যদি শিশুর জ্ঞানের ভিত্তিটাকে ভালভাবে গড়ে তোলা যায় তবে পরবর্তীকালে সহজে শিশুর মেধার বিকাশ ঘটে। আর এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে প্লান বাংলাদেশ তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। তারা প্রথমেই শিশুর উপর চাপ সৃষ্টি না করে শিশু বিকাশ কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুকে মানসিকভাবে এগিয়ে আসতে সাহায্য করছে। পরবর্তীতে তাকে স্কুল-উপযোগী করার জন্য Pre-school পর্যায়ে সেই জ্ঞান দিচ্ছে। এরপরও যদি শিশুর কোন ঘাটতি থাকে তা পূরণ করার জন্য ১ম ও ২য় শ্রেণীতে সোপান ও ৩য়-৫ম শ্রেণীতে ক্যাম্পের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে পুষিয়ে নিতে সাহায্য করছে। এছাড়া শিশুর সঠিক লালন পালনে পিতামাতাকে নানা ধরনের পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করছে প্ল্যান।

www.pathagar.com

ইউসেপ বাংলাদেশ

আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে চিন্তা করলে সমাজের যে শ্রেণীটি সব চাইতে অবহেলিত রূপে সামনে চলে আসে তারা হচ্ছে কর্মজীবী শিশু। বাংলাদেশে প্রায় ছয় মিলিয়ন কর্মজীবী শিশুর বসবাস, যা বিশ্বের কর্মজীবী শিশুর প্রায় ৫%। যার মধ্যে প্রায় ১.২ মিলিয়ন কর্মজীবী শিশুর বসবাস শহরাঞ্চল। শহরাঞ্চলের এই সুবিধা বঞ্চিত কর্মজীবী শিশুদের জন্য ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ইউসেপ বাংলাদেশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট এর একটি কামরায় মোট ৬০ জন শিশু নিয়ে যে পথ চলা আজ তা কর্মজীবী শিশুদের ভবিষ্যত গড়ার কারখানা হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় ১২০০০০ কর্মজীবী শিশুকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সাবলম্বি হতে সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে এই ইউসেপ।

টার্গেট গ্রুপ : ইউসেপ কি সকল শিশু নিয়ে কাজ করে? না, ইউসেপ শুধু সে সকল শিশুদের নিয়েই কাজ করে যারা ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা এবং রাজশাহী এই চারটি মেট্রোপলিটন শহরে বসবাস কর এবং যারা কর্মজীবী সুবিধা বঞ্চিত শিশু এবং যাদের বয়স ছেলে ১১ বছরের উর্ধ্বে ও মেয়ে ১০ বছরের উর্ধ্বে। মূলত গরীব পরিবার থেকেই এই সকল শিশুরা এসে থাকে যারা বিভিন্নভাবে অর্থনৈতিক শোষণের শিকার। এই সকল শিশুরা মূলত বিভিন্ন কারখানা, গৃহস্থালী কর্মে, দোকানে, টেম্পো, বাসের হেলপারের মত বিভিন্ন ঝুকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত থাকে। আর এ সকল সুবিধা বঞ্চিত কর্মজীবী শিশু যারা এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে পথ চলছে তাদের সাহায্যার্থেই ইউসেপ বাংলাদেশ।

শিক্ষাদান পদ্ধতি : ইউসেপ বাংলাদেশ প্রিপারেটরি ওয়ান থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত কর্মজীবী শিশুদেরকে শিক্ষাদান করে থাকে। কিন্তু এর জন্য আট বছর সময় ব্যয় না করে সাড়ে চার বছরেই তাদের এই কোর্স শেষ করে থাকে। তাই তারা প্রতি এক বছরে দুটি শিক্ষাবর্ষ শেষ করে এবং তারা তাদের নিজেদের উপযোগী করে সিলেবাস প্রণয়ন করে। এর সম্পর্কে ইউসেপ বাংলাদেশের বক্তব্য হল— যেহেতু তারা ১০ থেকে ১১ বছরের শিশুদের নিয়ে কাজ করে তাই তাদের শিশুরা অন্য বাচ্চাদের তুলনায় বেশি পরিপক্ক। তাই তাদেরকে অন্যান্য শিশুদের সাথে সমান তালে পরিচালনা করে কোর্স শেষ করার জন্য ৮ বছরের কোর্সকে চার বছরের মধ্যে শেষ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। সমগ্র বাংলাদেশে মোট ৪৩টি ইউসেপ বাংলাদেশের স্কুল রয়েছে। যার মধ্যে সাধারণ শিক্ষার জন্য ৩০টি এবং কারিগরি শিক্ষার জন্য রয়েছে ১৩টি সাধারণ শিক্ষার জন্য যে ৩০টি স্কুল রয়েছে সেগুলোতে প্রতিদিন তিন শিফটে ক্লাস হয়। যার প্রতিটি ২$\frac{১}{২}$ ঘণ্টা করে হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

কর্মজীবী শিশুরা তাদের সুবিধা মতো যে কোনো সময় ক্লাস বেছে নেয়।

ইউসেপ বাংলাদেশ স্কুলের সাথে যদি অন্যান্য স্কুলের তুলনা করা হয় তাহলে একটি বিষয়ে খুব স্পষ্টভাবেই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তা হচ্ছে এখানকার শিক্ষকরা শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং শিশুদের প্রতি তাদের দায়িত্ব বোধ। এখানে ফলোআপ পদ্ধিতিতে শিক্ষকগণ প্রতি মাসে কমপক্ষে বারটি শিশুর বাসায় যান এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করেন যা কিনা তাদের শিক্ষাদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। যাতে পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি নানা মুখী কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণ করতে পারে তার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। যা তাদের মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে সহায়ক। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পর্যায়ে ইউসেপ বাংলাদেশ এর শিশুদের সাফল্য লক্ষণীয়।

কারিগরি শিক্ষা দান : শুধু সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত নয়, ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ইউসেপ বাংলাদেশ অষ্টম শ্রেণী পাস করার পর তার প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকে কারিগরি শিক্ষাদান করে। এই শিক্ষাদান দুই ভাগে বিভক্ত; এক ভকেশনাল স্কুল আর প্যারাট্রেড ট্রেনিং। ভকেশনাল স্কুলে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে ছয় মাস থেকে দুই বছর মেয়াদী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং প্রারাট্রেড ট্রেনিং সেন্টারে ৬ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। যে সকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় তা মূলত মার্কেট স্টাডি করে তৈরি হয় যাতে বাজারে প্রশিক্ষণার্থীদের চাহিদা থাকে।

প্রশিক্ষণ শেষে কর্মসংস্থান : প্রশিক্ষণ শেষে যাতে ইউসেপ বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা বেকার না থাকে তার জন্য এখানে Employment & Field services (EFS) নামে একটি সেক্টর রয়েছে যা ছাত্র-ছাত্রীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়। এখানে এর জন্য কমিটি রয়েছে যারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে চলে যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা সহজে করতে পারে। এর জন্য ইউসেপ বাংলাদেশের ছাত্র-ছাত্রীরা কর্মসংস্থানের শতকরা হার ও অধিক। প্রায় ৯৫% প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী প্রশিক্ষণ শেষে কর্মসংস্থানের সুযোগ পায় প্রথম ছয় মাসের মধ্যেই।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা : ছাত্র-ছাত্রীদের কথা চিন্তা করে ভবিষ্যতে ইউসেপ বাংলাদেশ বেশ কয়েকটি কর্মসূচি হাতে নিতে যাচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অষ্টম শ্রেণীর পরিবর্তে S.S.C পর্যন্ত ভকেশনাল স্টাডি প্রবর্তন করা। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তারা এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে চলছে। এছাড়া ইউসেপ বাংলাদেশ তিনটি সাধারণ স্কুল এবং একটি ট্রেনিং সেন্টার তৈরি করছে।

ইউসেপ বাংলাদেশ তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের শুধু দেশের মধ্যেই নয় তাদের জন্য দেশের বাইরেও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিচ্ছে। এর জন্য তারা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছাত্রদেরকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করে দিচ্ছে। ২০০৩ সালে এই প্রজেক্টে ৩১ জন ছাত্রকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে পাঠানো হয়েছে।

www.pathagar.com

মূল্যায়ন : ১৯৭২ সালের প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে ইউসেপ বাংলাদেশকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। বাংলাদেশের শ্রমজীবী শিশুদের তাদের কাজের পরিধি দিন দিন বৃদ্ধিই পাচ্ছে। শুধু শ্রমজীবী শিশুদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণই নয়, সাথে সাথে তাদের পরিবার ও সমাজের উন্নয়নের জন্য সচেতনতামূলক কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন সমস্যা রোধ কল্পে এবং গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে ইউসেপ প্রশংসনীয় কাজ করে থাকে।

ইউসেপ বাংলাদেশ থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের উপর জরিপ করে জানা গেছে যে বর্তমানে প্রায় সকলে তাদের প্রশিক্ষণকে কাজে লাগিয়ে স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে এবং নিজেদেরকে স্বনির্ভরশীল করতে পেরেছে। এই কথা স্বীকার করতে হয় যে ইউসেপ বাংলাদেশ থেকে প্রশিক্ষণের পর অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী তাদের পরিবারের নতুন অর্থ উপার্জনকারী হিসেবে নিজেদেরকে তৈরি করার পাশাপাশি পরিবারের সচেতনতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন করতে পেরেছে।

এক নজরে ইউসেপ

* কাজ করে ৪টি বিভাগের ৪টি জেলায়
* মোট পুরুষ কর্মী ৫৫৩ জন শিক্ষায় ৫০৬ জন
* মোট মহিলা কর্মী ২০৬ জন শিক্ষায় ২৪০ জন
* মোট শিক্ষার্থী ছেলে ১২৬২৪ জন মেয়ে ১০৯৮৮ জন
* শিক্ষক ছাত্র অনুপাত ১ ঃ ৪৪ জন
* শিক্ষা কেন্দ্র ৩০টি।
* অর্থায়ন সংস্থা DAMID, MORAD, DRID, SDC

বিগ্রেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) আফতাব উদ্দিন আহমদ

নির্বাহী পরিচালক, ইউসেপ বাংলাদেশ

প্রশ্ন : আপনারা নিজস্ব কারিকুলাম তৈরি করে এখানে শিক্ষা দিচ্ছেন— এটা কতটা উপযুক্ত?

আ. উ. আ. : আমরা এখানে নিজস্ব একটি কারিকুলাম তৈরি করে শিক্ষা দান করছি যা NCTB কর্তৃক অনুমোদিত। NCTB কর্তৃক যে কারিকুলাম সারা দেশে অনুসরণ করে শুধু সেই কারিকুলামকে একটু সংক্ষিপ্ত করে ৬ মাসে শেষ করার উপযোগি করে এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়। তাই মানের দিক দিয়ে এটা পিছিয়ে নেই।

প্রশ্ন : এই শিক্ষা ব্যবস্থায় ৮ বছরের শিক্ষা কার্যক্রম সারে ৪ বছরে দেওয়া হয়। এতে করে শিক্ষা প্রদান বিষয়টা কতটা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়?

আ. উ. আ. : মনে রাখতে হবে এখানে যারা লেখাপড়া শিখছে তাদের বয়স ১০

www.pathagar.com

বছরের উপরে তাই তাদের বুঝার ক্ষমতা ও গ্রহণ করার ক্ষমতা অন্যদের থেকে বেশি। তাই NCTB এর মূল কারিকুলামকে সংক্ষিপ্ত করে তাদেরকে ৬ মাসের ভিতর শেখানো সম্ভব। তাই ৮ বছরের শিক্ষা কার্যক্রম সাড়ে ৪ বছরে দিলেও তা খুব একটা সমস্যার সৃষ্টি করছে না।

প্রশ্ন : আপনাদের সমস্ত কার্যক্রম শহরাঞ্চলে সীমাবদ্ধ কেন?

আ. উ. আ. : আমাদের সমস্ত শিক্ষা কার্যক্রম শহরাঞ্চলে সীমাবদ্ধ কারণ, আমাদের প্রতিষ্ঠানের মূল ভিত্তি প্রতিষ্ঠানের কর্মজীবী শিশুদের নিয়ে যা মফস্বল অঞ্চলের তুলনায় শহরে বেশি। তাই আমাদের সমস্ত কার্যক্রম দেশের প্রধান ৪টি শহরে সীমাবদ্ধ। তবে ভবিষ্যতে আমরা মফস্বল অঞ্চলের জন্যও কিছু কার্যক্রম আনবো।

প্রশ্ন : যারা ভকেশনাল ট্রেনিং নিচ্ছে তাদের পূনর্বাসনের জন্য আপনারা কতটা সহযোগিতা করে যাচ্ছেন?

আ. উ. আ. : যারা ভকেশনাল ট্রেনিং নিচ্ছে তাদের পুনর্বাসনের জন্য এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে বের হয় তাদের প্রশিক্ষণ শেষে বসে থাকতে হয় না। আমরা বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে লিয়াজো মেইনটেন করে তাদের প্রতিষ্ঠানে আমাদের ছেলে মেয়েদের চাকরির ব্যবস্থা করছি। আর এজন্য আমরা Market study করে যে বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন সেই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেই। তাই কাজ শিখে কেউই বসে থাকে না।

প্রশ্ন : শিক্ষা ক্ষেত্রে আপনাদের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য কি?

আ. উ. আ. : Market study করে দেখা যাচ্ছে আমাদের ছেলে মেয়েরা S.S.C পাশ বা সমমানের পাশ না হওয়া বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হয় এজন্য আমরা আগামীতে Vocational traning কোর্স নামে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে একটা কোর্স খুলছি।

শেষ কথা :

অবশ্যই শিক্ষার ক্ষেত্রে সিংহভাগ ভূমিকা পালন করছে সরকার। কিন্তু এমন কিছু ক্ষেত্র আছে যা শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং সেদিকে সরকারিভাবে এখন পর্যন্ত কোনো প্রদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। এই ক্ষেত্রগুলোর এক একটাতে এক একটা এনজিও তার নিজস্ব জনবল, অর্থবল ও শিক্ষাপদ্ধতি প্রয়োগ করে তাদের মাঝেও ছড়িয়ে দিচ্ছে শিক্ষার আলো। তাই পথশিশু বস্তিবাসি শিশু, নির্যাতিত শিশু, প্রতিবন্ধী শিশু, সমাজের বিচ্ছিন্ন কোনো অংশ নয় বরং ব্র্যাক, প্রশিকা, ইউসেপ, অপরাজেয় বাংলাদেশ, কারিতাসের কারণে তারা শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে যুক্ত হচ্ছে শিক্ষার মূলধারার সাথে। এছাড়া এনজিওগুলো বর্তমানে এমন সব স্থানে গিয়ে শিক্ষার

www.pathagar.com

কার্যক্রম পরিচালনা করছে যেখানে সরকারিভাবে কোনো ধরণের শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় নি। তাই দিন দিন শিক্ষার প্রসারে এনজিওর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর দলে অনেক বাবামাই সনাতন ধ্যান ধারণা বাদ দিয়ে তার সন্তানকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার জন্য এগিয়ে দিচ্ছে এনজিও পরিচালিত কার্যক্রমের দিকে।

এ কথা সত্য যে, সরকারের দায়িত্ব দেশের প্রতিটা নাগরিকের জন্য শিক্ষার সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা। শিক্ষা উপকরণ যোগান দেয়া। শিক্ষার জন্য নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা। কিন্তু আমাদের দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে, নানা মত ও পথ থাকার কারণে স্বাধীনতার পয়ত্রিশ বছর পরও সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা যায় নি। শিক্ষা ব্যবস্থায় পূর্ণতা লাভ করেনি। এতে করে শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে বড়ো রকমের গ্যাপ সৃষ্টি হচ্ছে। এই গ্যাপ পুরনে এনজিও প্রতিষ্ঠাগুলো কিছুটা হলেও সহায়ক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হচ্ছে। তাই এদিকে সরকারের নজরদারি আন্তরিক হওয়া বাঞ্চনিয়। খবরদারি রাজনৈতিক না হয়ে প্রশাসনিক ও দেশের স্বার্থ বিবেচনায় রেখে হওয়া উচিত। পাশাপাশি এটাও করা যেতে পারে যে, এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার কথা বিবেচনায় রেখে একটা নীতি প্রণয়ন করা। যাতে এনজিও প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ না হয়— সঠিকভাবে এগিয়ে যায়। অন্যদিকে এনজিও কর্তাদেরও মনে রাখতে হবে শিক্ষা কার্যক্রম যেন শুধু লোক দেখানো আর দাতা সংস্থাকে খুশী রাখতে কার্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে। কেননা, এই দেশ, দেশের সন্তানরা আমাদের— যেহেতু ভবিষ্যতও আমাদেরই।

❑

www.pathagar.com

সূচীপত্র

Mathporjay Theke Bangladesher Sikhsababostha:
Samprotik Chalchitro
by Humayun Kabir
Published by Sucheepatra
Cover Design : Niaz Chowdhury Tuli
Price : BDT. 150.00 Only. US$ 10.00
sucheepatra>dhaka>bangladesh

ISBN 984855782-2
9789848557822

www.pathagar.com